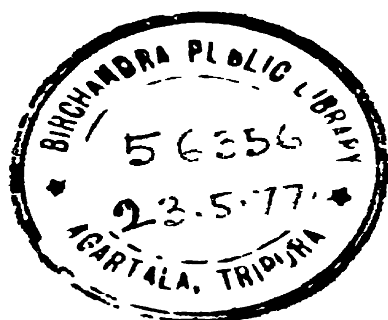


রবীন্দ্রনাথ
গৃহে ও বিশ্বে

মৈত্রেয়ী দেবী

রবীন্দ্রনাথ—গৃহে ও বিশ্বে

মৈত্রেয়ী দেবী



প্রাইমা পাবলিকেশন্‌স
৮৯, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

© Maitreyi Devi

প্রথম সংস্করণ : বৈশাখ ১৩৬৭

প্রকাশক
উপমা সেনগুপ্তা
৮৯, মহাত্মা গান্ধী রোড,
কলিকাতা-৭

মুদ্রাকর
হরিপদ সামন্ত
কে. বি. প্রিণ্টার্স
১।ঃএ, গোয়াবাগান স্ট্রীট,
কলিকাতা-৬

দাম বার টাকা

ভূমিকা

রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে কিছু খুচরো লেখা নানা পত্রপত্রিকার পাতায় ছড়ান ছিল—প্রাইমা প্রকাশন তাদের একত্র করে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করায় সেগুলি রক্ষা পেল। এর বেশির ভাগ লেখাই আমার সম্পাদিত নবজাতক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। প্রথম দিকের প্রবন্ধটিতে নানা নির্ভরযোগ্য মানুষের রচনা ও বক্তব্য থেকে রবীন্দ্রনাথের গার্হস্থ্য জীবনের ছবিটি দিতে চেয়েছি—আর তার পাশাপাশি কেমন করে তাঁর কর্মজীবন সমান্তরাল রেখায় চলেছে তারই একটি বিবরণ দিয়ে নবজাতকের ঐ রবীন্দ্রসংখ্যাটিতে তাঁর জীবন ও কর্ম সম্বন্ধে একটা খসড়া তৈরী করবার চেষ্টা করেছিলাম আজকের নবীন পাঠকদের জন্য, যারা রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানে না।

রবীন্দ্রনাথ যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন তাঁর গৃহজীবন নিয়ে প্রায় কোনো আলোচনাই হয়নি—কারণ তিনি নিজের ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে কখনই কারু সঙ্গে আলোচনা করতেন না। তাঁর নিজের মুখে তাঁর স্ত্রীর নাম উল্লেখ ক'জন লোক শুনেছে জানি না। পারিবারিক বিষয় বা শারীরিক অসুস্থতা—ইত্যাদি নিয়ে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি ছাড়া তিনি আলোচনা করতেন না। ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ উত্থাপনই করতেন না।

কিছুদিন থেকে এদেশে রবীন্দ্রচর্চার একটা প্রধান বিষয় হয়ে উঠেছে তাঁদের পারিবারিক ইতিবৃত্ত উদ্ঘাটন। যেসব খবর সঠিক কিছুই জানা নেই সেই সব খবরই কল্পনার মাল মশলা সহযোগে চটকদার গবেষকরা লিখে চলেছেন এবং কুৎসা বিক্রয় লোলুপ পত্রিকার মালিকরা উৎসাহ দিয়ে লিখিয়ে নিচ্ছেন। রাঁচির নিঃসঙ্গ পাহাড়ের উপরে যে শিশুসুলভ সাধু চরিত্র জ্যোতিরিন্দ্রনাথ যৌবন কাল থেকেই তপস্বীর জীবন কাটিয়ে গেলেন অল্প বয়সে তাঁর কোনো স্খলন পতন হয়েছিল কিনা, তাঁর স্ত্রী কেন আত্মহত্যা করলেন, কাদম্বরী দেবী মৃণালিনী দেবীকে ঈর্ষা করতেন কিনা। এইসব পরম প্রয়োজনীয় জ্ঞাতব্য তথ্য আবিষ্কারের দিকেই যে বেশি ঝোঁক পড়বে আজকালকার গবেষকদের এটা রবীন্দ্রনাথের একেবারেই জানা ছিল না—তাহলে তিনি হয়ত নিজের কলমে তাঁর পারিবারিক ও ব্যক্তিগত জীবন অনেক পূর্ণতর ভাবে সাহিত্যের প্রাঙ্গণে মুক্ত আলোতে নিয়ে আসতেন, ফল ভালই হত,

অপরিণত বুদ্ধি সীমিত দৃষ্টি গবেষকরা তাঁদের নিজ নিজ ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতার জাল দিয়ে তাঁর বিরাট সত্তাকে ধরবার চেষ্টা তাহলে হয়ত করতেন না। আমরা যাঁরা রবীন্দ্রনাথকে কাছ থেকে দেখেছি আমরা অনেকেই জানি তাঁর মনের অতলান্ত গভীরতার কথা, সূক্ষ্ম সংবেদনশীলতার কথা, এবং দৃষ্টিভঙ্গীর নব নব বৈচিত্র্যের কথা। সাধারণ মানুষের দৃষ্টি থেকে তা কতই না পৃথক ছিল। এই জগতের দৃশ্যরূপই তাঁর দৃষ্টিতে অন্যভাবে ধরা পড়ত। ছয় ঋতুর রূপসম্ভার আকাশের নূতন নূতন সমারোহ, মানুষের প্রেম ভক্তি ভালোবাসা, তার সুখ দুঃখ কাতরতা তাঁর কাছে অনেক গভীরতর অর্থবহ ছিল। আমরা যেমন দেখি তার চেয়ে অনেক বেশি করে অনেক সুন্দর করে বিশ্বলীলা তাঁর কাছে প্রকাশিত হত।

ঐ রকম একটি মানুষের জীবন ক্ষুদ্র মনের পরিমাপে অনেক দূর থেকে অনুমান করে একটা আন্দাজে থীসিস তৈরী করাই সত্যের থেকে দূরে চলে যাওয়া। সেইজন্যই তাঁর সমসাময়িকরা তাঁর সম্বন্ধে যেটুকু লিখে গেছেন তা মূল্যবান।

বর্তমান গ্রন্থের প্রবন্ধগুলি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন বিষয়ে লিখিত তাই এর মধ্যে ধারাবাহিকতা নেই—এবং হয়ত কিছু পুনরুক্তি আছে—তবু কিছু খবর রইল যা কারো কারো কাজে লাগতেও পারে।

মৈত্রেয়ী দেবী

স্নেহের ছবুরাণীকে

দিদি

সূচীপত্র

রবীন্দ্রনাথ
গৃহে ও বিশ্বে

গৃহজীবনে

জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবার বাংলাদেশের শিক্ষা সংস্কৃতির ধারাকে যে বিশেষ শক্তিতে পূর্ণ, বিশেষ আলোতে উজ্জ্বল করে তুলেছিল সমস্ত ভারতবর্ষের মধ্যে তা এনেছিল একটি নব যুগের সূচনা। অতীতের যা কিছু শ্রেষ্ঠ তার সঙ্গে বর্তমানের প্রয়োজনকে এমন প্রাণের রসায়নে মিলিত করে নূতন সভ্যতা গড়ে তোলার ক্ষমতা পৃথিবীর কোনো পুরানো জাতি দেখাতে পারে নি। নূতনের প্রবল ধাক্কায় ও প্রচণ্ড আকর্ষণে পুরাতনের সঙ্গে সঙ্গে যা কিছু চিরন্তন তাও গেছে গুঁড়িয়ে—ফলে যে নূতন এসেছে সেও একদা এবং অচিরেই পুরাতনের পর্যায়ে পড়ে ক্রমাগত ঘাতে-প্রতিঘাতে চিরদিনের মানবসত্যকে বিপর্যস্ত করে দিয়েছে। ইংরেজী শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে যুক্তিবাদের আলো এসে প্রথা সংস্কারাচ্ছন্ন স্থবির সমাজের মূলে যে প্রাণ চাঞ্চল্য এনেছিল তার সূত্র ধরে বহু অবাঞ্ছিত ভাব ও রুচিবিকার যা কিছু চিরন্তন মূল্যে মূল্যবান তাকেও নষ্ট ও বিকৃত করে দিতে উদ্যত হয়েছিল, তখন তাকে সংহত করে নূতন পরিণতির দিকে নিয়ে যেতে চেষ্টা করেছিলেন এই পরিবারের আশ্চর্য মানুষগুলি। এরা সবাই ব্যূঢ়োরোস্ক, শালপ্রাংশু মহাভুজ—কর্মে জ্ঞানে আপন আপন ক্ষেত্রে জ্যোতিষ্ক।

সামাজিক দিক থেকে এই পরিবারের ত্রুটি ছিল, তাঁরা ছিলেন পীর-আলি ব্রাহ্মণ—অর্থাৎ পরিবারের কখনো কোথাও মুসলমান সংসর্গ ঘটায় তখনকার হিন্দু সমাজে পতিত ব্রাহ্মণ। এই কারণে বিবাহাদি নানা ব্যাপারে বহু অসুবিধা ভোগ করতে হয়ে থাকলেও এক দিক থেকে সেই ত্রুটিই এই পরিবারের মধ্যে মুক্ত ' স্থার প্রবেশের পথ। যে জাতিচ্যুত, যে ব্রাত্য, সে জাতির বন্ধন মুক্ত।

ঠাকুরবাড়ির শক্তিশালী মানুষদেব কথা নানা জনে নানা স্থানে আলোচনা করেছেন, তাঁদের চরিত্র ও কর্মের বিশেষত্বের ও বৈচিত্র্যের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের বাল্যজীবনের পটভূমিকা দেখা যায়।

রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবের অব্যবহিত পূর্বে ঠাকুরবাড়ীর বৃহৎ পরিবারে আধুনিক কালের প্রধান মর্মবাণী যুক্তিবাদের প্রভাব ধর্মে শিক্ষায় শিল্পে [illegible] শক্তি সঞ্চারিত হয়ে যে সব সুসম্পূর্ণ মানব চরিত্র সৃষ্টি করেছিল রবীন্দ্রনাথ যেন তারই পূর্ণ পরিণতি রূপে আমাদের সামনে এলেন। ঊনবিংশ শতকের প্রথমে এই পরিবারের জীবনে উপ্ত যুক্তিবাদের বীজ ক্রমে শক্তি সংগ্রহ করে রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারায় ধীরে ধীরে

প্রবলতর হয়ে উঠে তাঁকে সকল প্রথা সংস্কার ও ক্ষুদ্র সত্যের গণ্ডী থেকে উদ্ধার করে বৃহত্তর সত্যের দিকে মুক্ততর ভাবের দিকে, বিশ্বের দিকে নিয়ে গিয়ে মানবজীবনের বিপুল সম্ভাবনাকে জগতের সামনে প্রকাশ করেছিল।

পিতামহ দ্বারকানাথ

একালের মানুষ দ্বারকানাথ ঠাকুর সম্বন্ধে সামান্যই খবর রাখেন—কিশোরীচাঁদ মিত্র রচিত একটি ক্ষুদ্র জীবনীগ্রন্থ ছাড়া তাঁর কোনো পূর্ণাঙ্গ জীবনী ছিল না সেটি অবলম্বনে বর্তমানে একটি লেখা হয়েছে। যদিও বহু প্রচলিত কিংবদন্তী সেই উজ্জ্বল দীপ্ত ব্যক্তিত্বের পরিচয় বহন করে মুখে মুখে ছড়ান আছে।

বিচিত্র কঃ ও অভিজ্ঞতাপূর্ণ এই জীবনখানি জানবার যোগ্য। কারণ তাঁর স্বল্পায়ু জীবনের বেশীর ভাগই সাধারণ মানুষের নানা প্রচেষ্টাকে সফল করার জন্য জাগতিক কাজেই উৎসর্গীকৃত ছিল। তৎকালীন অধিকাংশ সচ্ছল অবস্থার মানুষদের মত তা ধর্মতত্ত্বের আলোচনা ও ধর্মজীবনের ব্যক্তিগত আস্বাদ লাভের মধ্যেই নিঃশেষিত ছিল না। এদিক থেকে পুত্র দেবেন্দ্রনাথের চেয়ে দ্বারকানাথ ছিলেন আধুনিক যুগের ভাবে ভাবিত।

দ্বারকানাথ যদিও তাঁর পিতা পিতামহের মতই গোঁড়া হিন্দু ছিলেন তবু রামমোহন রায়ের সংস্পর্শে এসে কুসংস্কারাচ্ছন্নতা ও পৌত্তলিক পূজাবিধির উপাচারপরায়ণ মূঢ়তা অনুভব করেছিলেন। রামমোহন রায়ের ধর্মসংস্কারের সঙ্গে তিনি যুক্ত হয়েছিলেন—কিন্তু কুসংস্কার থেকে মুক্ত হয়ে নূতন কোনো ধর্মোন্মাদনায় বা ধর্মসম্ভোগের মধ্যে ডুবে গেলেন না। যুক্তিশাণিত বুদ্ধি ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি দিয়ে মানুষের হিতার্থে নানা কাজে নিযুক্ত হয়ে দেশসংগঠক হয়েছিলেন। তাঁর অমর বংশধরের মত তাঁরও দেবতা পথের প্রান্তে দেবালয়বাসী ছিলেন না, পথের দুধারে মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের মধ্যে তাঁর কর্মের সার্থকতা খুঁজেছিলেন।

ব্যবসা বাণিজ্যে প্রভূত উন্নতি করে তিনি যে ধনে মানে তৎকালীন শাসকদের সমকক্ষ হয়ে উঠেছিলেন শুধু তাই নয়—এমন কোনো সর্বসাধারণের কাজ ছিল না, যার সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন না। হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা, মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা, সতীদাহ নিবারণ, ভূম্যধিকারী সংস্থা, বাষ্পপোত পরিবহন, জুডিসিয়াল সার্ভিস, সাব-অর্ডিনেট এডুকেসন সার্ভিস, ফ্রী-প্রেস, ভারতীয় ও ইয়োরোপীয় সমাজের মধ্যে মৈত্রী সম্পাদন প্রভৃতি সমস্ত কাজে তাঁর সক্রিয় উৎসাহ, তাঁর বিচিত্র ও বহুমুখী উদ্যোগের প্রমাণ দিয়েছে। তিনি মনে করেছিলেন যে বাষ্পপোত চলাচলের উপর দেশ ও জাতির উন্নতি অনেকখানি নির্ভর করে। ঐ পোতই যেন জানালা—

যেখান দিয়ে আধুনিক জ্ঞানের প্রবেশ পথ। ঐ জাহাজ কোম্পানী প্রতিমাসে একটি জাহাজ বম্বে থেকে ও একটি ইংলণ্ড থেকে প্রেরণ করত। পঞ্চান্ন দিনে তাদের পর্যটন শেষ হযে গন্তব্যে পৌছত। ১৮৩৫ সালে প্রথম মেডিকেল কলেজ স্থাপিত হলে, কুসংস্কারী হিন্দু ছেলেরা মৃতদেহ স্পর্শ করতে হবে বলে ডাক্তারী পডতে অনিচ্ছুক হলে দ্বারকানাথ দু-হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেন এবং শব ব্যবচ্ছেদের সময় স্বয়ং দাঁড়িয়ে থেকে ছাত্রদের ঘৃণা জয় করে বিজ্ঞানের সাধনায় প্রবৃত্ত করান।

"জনবুল" নামে একটি ইংরেজী পত্রিকার ব্যসন ছিল অকারণ ভারতীযদের নিন্দায প্রবৃত্ত হওযা ও গালাগালি করা। দ্বারকানাথ তারই প্রত্যুত্তর দেবার উদ্দেশে "হরকরা" কাগজের বেশির ভাগ অংশ কিনে নেন ও "দর্পিত মহিষের শিংভাঙ্গবার" ব্যবস্থা করেন।

দ্বারকানাথেরই উৎসাহে এবং চেষ্টায 'ভবঘুরে আইন' (Vagrant law) প্রবর্তিত হয। যদিও অবশ্য আজও সে আইন কার্যকরী বা ফলদাযী হয়নি। বড বড় শহরেও ভিখারী ভবঘুরেরা স্বচ্ছন্দে নির্বাধায ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিন্তু অতকাল আগেই দ্বারকনাথ ভিক্ষা বৃত্তি বন্ধ করবার চেষ্টা করেছিলেন যখন ভিক্ষা চাওযা ও দেওযা উভয়ই একটি পুণ্যকর্মের অন্তর্গত ছিল। এই সব বিচিত্র কর্ম থেকে বোঝা যায যে তিনি দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য কি রকম আগ্রহী ছিলেন—তাঁর সার্বভৌম দৃষ্টি মানুষের জাগতিক মঙ্গলের জন্য সদা জাগ্রত ছিল এবং সে দিক থেকে বিচার করলে মহর্ষির পারমার্থিক চিন্তার চেযে দ্বারকানাথের সঙ্গেই রবীন্দ্রনাথের বেশী মিল—'শাস্ত্র মানে না, মানে মানুষের ভালো।'

দ্বারকানাথের মেজাজেও কবিজনোচিত চাঞ্চল্যের আমেজ ছিল। তাঁর ইযোরোপ ভ্রমণকালে তার একজন ভ্রমণসঙ্গী তাঁদের সকলের অস্থিরতার উল্লেখ করে লিখেছিলেন—'Babu changes his mind so often.' এই কথাটি ঠাকুর পরিবারে একটি প্রচলিত পরিহাস এবং রবীন্দ্রনাথ নিজেও উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত এই গুণটিকে তাঁর নিজের অবিরত মত পরিবর্তনের কারণ রূপে দর্শাতেন।

"এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে একদা কেউ নাকি রবীন্দ্রনাথকে প্রশ্ন করেছিল যে একই সঙ্গে তাঁর গুণ এবং দোষ কি। তিনি উত্তরে বলেছিলেন—inconsistancy!"

ভারতশাস্ত্রবিদ ম্যাক্সমূলার দ্বারকানাথের সঙ্গে প্যারিসে দেখা করেন। তিনি দ্বারকানাথ সম্বন্ধে যে সব কৌতুকপ্রদ গল্প সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে করেছিলেন তাতে তাঁর ব্যক্তিত্বের বিশেষ পরিচয় পাওযা যায। 'আমার বাল্য কথা ও বোম্বাই

প্রবাস' গ্রন্থে সত্যেন্দ্রনাথ লিখেছেন দ্বারকানাথ সম্বন্ধে ম্যাক্সমূলারের নিজের মুখের কথা : "তিনি (দ্বারকানাথ) অত্যন্ত সঙ্গীতপ্রিয় ছিলেন এবং ইটালীয় ও ফরাসী সঙ্গীত খুব পছন্দ করতেন। তিনি গান করতেন এবং আমি সেই গানের সঙ্গে পিয়ানো বাজাতাম।...একদিন আমি তাঁকে বললাম একটি খাঁটি ভারতীয় সঙ্গীত গাইতে, তাতে তিনি যে গানটি প্রথমে গাইলেন সেটা ঠিক ভারতীয় নয়—পারসিক গজল এবং আমিও তাতে বিশেষ কোনো মাধুর্য পেলাম না। খাঁটি ভারতীয় সঙ্গীত গাইবার জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করায় তিনি মৃদু হেসে বল্লেন, 'তুমি তা উপভোগ করতে পারবে না।' তারপর আমার অনুরোধ রক্ষার জন্য তিনি একটি গান বাজিয়ে গাইলেন। সত্য বলতে কি, আমি কিছুই উপভোগ করতে পারলাম না। আমার মনে হল গানে না আছে সুর না আছে ঝংকার না আছে সামঞ্জস্য। দ্বারকানাথকে এই কথা বলায় তিনি বল্লেন—'তোমরা সকলেই এক রকমের—যদি কোনো জিনিস তোমাদের কাছে নূতন ঠেকে তোমরা অমনি তার প্রতি বিমুখ হও। প্রথম যখন আমি ইতালীয় গীতবাদ্য শুনি তখন আমিও তাতে কোনো রস পাইনি। কিন্তু তবু ক্ষান্ত হইনি। আমি ক্রমাগত চর্চা করতে লাগলাম—যতক্ষণ না তার মধ্যে প্রবেশ করতে পারলাম।...

'তোমরা বল আমাদের ধর্ম ধর্মই নয়, আমাদের কাব্য কাব্যই নয়, আমাদের দর্শন দর্শনই নয়। ইয়োরোপ যা প্রকাশ করে আমরা চেষ্টা করি তা বুঝতে ও হৃদয়ঙ্গম করতে, কিন্তু তাই বলে ভারতবর্ষ যা প্রকাশ করে তাকে অবহেলা করি না। আমরা যেমন তোমাদের সঙ্গীত বিদ্যা কাব্য দর্শন সব আলোচনা করি তোমরাও যদি তাই করতে তাহলে বুঝতে তোমরা আমাদের বিদ্যাগুলি যে নিরর্থক ও আমাদের যে অজ্ঞ ও ভণ্ড মনে কর বাস্তবিক আমরা তা নই বরং অনেক অজ্ঞাত বিষয় তোমরা যা জান আমরা হয়ত তারও অধিক জানতে পেরেছি।

"তোমার পিতামহ দ্বারকানাথ খুব বুদ্ধিমান লোক ছিলেন। কেন জানি না তিনি ব্রাহ্মণকুলকে বিশেষ শ্রদ্ধার চক্ষে দেখতেন না এবং একদিন আমি তাঁকে যখন জিজ্ঞাসা করলাম, দেশে ফিরে গিয়ে তাঁকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে কি না, তিনি হেসে বল্লেন, 'আমি তো চিরকাল বহুতর ব্রাহ্মণ পোষণ করে আসছি, সেই আমার পক্ষে যথেষ্ট প্রায়শ্চিত্ত।' কিন্তু তিনি যে কেবল স্বদেশীয় ব্রাহ্মণদের হীন চক্ষে দেখতেন তা নয়, তিনি যাদের নামকরণ করেছিলেন 'কালো কোট পরা বিলাতী ব্রাহ্মণ'—তাদেরও সমানই হীন চক্ষে দেখতেন। যদিও তিনি ইংরেজদের অনেক বিষয়েই প্রশংসা করতেন কিন্তু পাদ্রীকুলের কোনো নিন্দাবাদ বা লজ্জাজনক ব্যবহারের কথা জানতে পারলে ভারি আমোদ বোধ করতেন। . তিনি অনেকগুলি

রাজনৈতিক ও পারমার্থিক সংবাদপত্র পড়তেন। তাঁর একখানি খাতা ছিল তার মধ্যে পাদ্রীদের নিন্দাজনক সংবাদ টুকে রাখতেন। সে এক অদ্ভুত সংগ্রহ! অনেক সময় ভাবি সে খাতাখানির কি দশা হল! তোমার ঋষিপ্রতিম পিতা (দেবেন্দ্রনাথ) কখনই সে খাতা নিয়ে রহস্য করেননি।...যখনই খৃষ্ট ধর্মের ও হিন্দু ধর্মের সত্যতা ও শ্রেষ্ঠতা নিয়ে কারু সঙ্গে তর্ক বাধতো দ্বারকানাথ তখনই সে খাতাখানি প্রমাণ স্বরূপ বের করতেন। দ্বারকানাথ প্যারিসে খুব জাঁকজমক সহকারে বাস করতেন। তখনকার রাজা লুই ফিলিপ কর্তৃক তিনি সমাদরে গৃহীত হয়েছিলেন। দ্বারকানাথ একদিন খুব সমারোহে সান্ধ্য সম্মেলনের আয়োজন করেন। তখন রাজা লুই ফিলিপ ও বহু উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণ সস্ত্রীক নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে আসেন। দ্বারকানাথ সমস্ত ঘরখানি মূল্যবান কাশ্মীরি শাল দিয়ে সজ্জিত করেছিলেন —তখন কাশ্মীরি শাল ছিল ফরাসী স্ত্রীলোকদের আকাঙ্ক্ষার বস্তু। সুতরাং কল্পনা কর যে তাদের কি অনির্বচনীয় আনন্দ হল যখন এই ভারতের রাজপুত্রটি বিদায়কালে প্রত্যেক স্ত্রীলোকের অঙ্গে এক একখানি শাল জড়িয়ে দিলেন!”

মহারাণী ভিক্টোরিয়া ও দ্বারকানাথের প্রীতিসম্পর্ক সম্বন্ধেও নানা গল্প আছে। অন্যান্য নানা উপহারের সঙ্গে স্বনামাঙ্কিত যুগল ছবি তিনি উপহার দিয়েছিলেন। আর শোনা যায় নিজের চুল জড়ানো একটি আংটিও সেই সব প্রীতি উপহারের মধ্যে ছিল।

অনুমান করা যায় দ্বারকানাথের রূপ, ঐশ্বর্য ও প্রতিভার সঙ্গে শিভাল্‌রিও যুক্ত হয়ে তাঁর মনোহারিত্ব প্রবল করেছিল। একটি গল্প আছে যে একদা ইয়োরোপে কোনো প্রণয়ে প্রতিদ্বন্দ্বী তাঁকে দ্বৈরথে আহ্বান করেন। তিনি ঘোষণা করেন যে প্রত্যেকে নিজে নিজ স্বদেশী পোশাকে ও স্বদেশী অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে আসবেন। তারপর যথাকালে সর্বাঙ্গে তৈল মর্দন করে কৌপীনবস্ত দ্বারকানাথ মোটা বাঁশের তৈল মার্জিত লাঠি নিয়ে রণক্ষেত্রে আবির্ভূত হয়ে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীকে চমৎকৃত করে দিলেন, ঐ লাঠির বাড়ি পড়লে ফিন্‌ফিনে তলোয়ার এক মুহূর্ত টিকতে পারে না, কিন্তু দ্বারকানাথ অবিচলিত—তাঁর স্বদেশীয় পোশাক ও অস্ত্র ব্যবহারের অধিকার নিশ্চয়ই আছে!

কৌতুক-উজ্জ্বল বিচিত্ররসপূর্ণ মেজাজ, অদম্য ও বহুবিধ কর্মপ্রচেষ্টা এবং গভীর মানব হিতৈষণাকে নানা কর্মের দ্বারা সত্য করে তোলার নিরন্তর প্রয়াস, এইগুলি রবীন্দ্রনাথের মধ্যে নূতনভাবে প্রকাশ পেয়েছে এবং তার সঙ্গে পিতা দেবেন্দ্রনাথের ধর্মোৎসাহ যেন কবিত্বের উপলব্ধি রূপে পুনর্জন্ম পেয়ে কর্ম ও ভাবের এক বিচিত্র সম্মেলন ঘটিয়েছে।

পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী শিক্ষিত বাঙালীর কাছে পরিচিত গ্রন্থ। এ ছাড়া রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবন-স্মৃতিতে কয়েকটি পৃষ্ঠায় সেই মহাত্মার যে ভাব-মূর্তি ফুটিয়ে তুলেছেন তার ভিতরে ভারতবর্ষের আত্মিক রূপ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। মহর্ষি তাঁর আত্মজীবনীতে কয়েকটি প্রত্যক্ষ উপলব্ধির বর্ণনা দিয়েছেন। একটি—যখন গঙ্গাতীরে দিদিমার মৃত্যু শয্যায় সংসারের অনিত্যতার প্রত্যক্ষবোধ ও গভীর গূঢ় আনন্দময় অনুভূতির সঙ্গে দৈহিক ও সাংসারিক ভোগ বিলাসের প্রতি ঔদাসীন্যের ভাব মিশল, সেই মুহূর্তেই তাঁর সাধক জীবনের প্রথম বিবর্তন ঘটল।

দ্বিতীয়—একটি উপলব্ধির মুহূর্তে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন পাহাড়ের উপরে, নিম্নগামী নির্ঝরের পাশে। সেই জলধারার নিম্নমুখী দূরাভিলাষী স্রোতধারা তাঁকে কর্মক্ষেত্রের দিকে, সংসারের দিকে, কেমন করে আকর্ষণ করল তারই একটি বর্ণনা তিনি নিজে লিখেছেন—এই বর্ণনার সঙ্গে এবং বর্ণিত অনুভূতির তীক্ষ্ণতা ও প্রত্যক্ষবোধের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সদর স্ট্রীটের বাড়িতে সূর্যোদয়ে দৃষ্ট মুহূর্তের অনুভূতির একটি নিগূঢ় সাদৃশ্য আছে। তাঁরও জীবনে ঘটল 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ'। কবিত্বের চূড়ায় উধ্বর্চারী হয়েই রইলেন না—জগতের মধ্যে বহু বিচিত্র কর্মধারায় সুখ-দুঃখের তরঙ্গে মানবজীবনের স্পর্শে স্পর্শিত হতে হতে চললেন অনন্ত সমুদ্রের অভিমুখে। পিতা-পুত্রের এই অনুভূতির সামীপ্য তাঁদের স্বরচিত জীবনী থেকে উদ্ধৃত করা গেল। 'ঋক' বা মন্ত্রগুলিকে 'দেখতে পেতেন' বলে মন্ত্র রচয়িতাদের ঋষি বলা হত। দেখতে পাওয়া অর্থ প্রত্যক্ষ অনুভূতি। চৈতন্যের মধ্যে অব্যবহিত বোধ সঞ্জাত হয়ে ওঠাই ঋষিত্বের লক্ষণ। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন—

"আবার সেই শ্রাবণ ভাদ্রমাসের মেঘ বিদ্যুতের আড়ম্বর প্রাদুর্ভূত হইল...... এই সময়ে আমি কন্দরে কন্দরে নদী প্রস্রবণের নব নব বিচিত্র শোভা দেখিয়া বেড়াইতাম। এই বর্ষাকালে এখানকার নদীর বেগে বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড প্রবাহিত হইয়া চলিয়া যায়। কেহই এর প্রমত্ত গতিকে বাধা দিতে পারে না......একদিন আশ্বিন মাসে খাদে নামিয়া একটা নদীর সেতুর উপর দাঁড়াইয়া তাহার স্রোতের অপ্রতিহত গতি ও উল্লাসময়ী ভঙ্গী দেখিতে দেখিতে বিস্ময়ে মগ্ন হইয়া গেলাম। আহা! এখানে এই নদী কেমন নির্মল ও শুভ্র, ইহার জল কেমন স্বাভাবিক পবিত্র ও শীতল, এ কেন তবে আপনার এই পবিত্রভাব পরিত্যাগ করিবার জন্য নীচে ধাবমান হইতেছে? এ নদী যতই নীচে বহিবে ততই পৃথিবীর ক্লেদ ও আবর্জনা ইহাকে মলিন ও কলুষিত করিবে। তবে কেন এ সেই দিকে প্রবল বেগেই

ছুটিতেছে ? কেবল আপনার জন্য স্থির হইয়া থাকা তাহার কি ক্ষমতা ? সেই সর্ব নিয়ন্তার সামনে পৃথিবীর কর্দমে মলিন হইয়া ও ভূমি সকলকে উর্বরা ও শস্যশালিনী করিবার জন্য উদ্ধত ভাব পরিত্যাগ করিয়া ইহাকে নিম্নগামী হইতেই হইবে। এই প্রকার ভাবিতেছি এই সময়ে হঠাৎ আমার অন্তর্যামী পুরুষের গম্ভীর আদেশবাণী শুনিলাম : 'তুমি উদ্ধতভাব পরিত্যাগ করিয়া এই নদীর মত নিম্নগামী হও। তুমি এখানে যে সত্য লাভ করিলে, যে নির্ভর ও নিষ্ঠা শিক্ষা করিলে যাও পৃথিবীতে গিয়া তাহা প্রচার কর।' আমি চমকিয়া উঠিলাম। তবে কি আমাকে এই পুণ্য-ভূমি হিমালয় হইতে ফিরিয়া যাইতে হইবে ?

"...কত কঠোরতা স্বীকার করিয়া সংসার হইতে উপরত হইয়াছি আবার সংসারে যাইয়া কি সংসারীদিগের সহিত মিলিত হইবে ?......এই ভাবনায় আমার হৃদয় শুষ্ক হইয়া গেল...রাত্রিতে আমার মুখে কোনো গান নাই...আমার শরীরের এমন সাংঘাতিক অবস্থা পূর্বে কখনো ঘটে নাই · ভয় হইল কোনো রূপ সাংঘাতিক পীড়াই বা আমার হইল।...

"কিশোরীকে ডাকিলাম এবং বলিলাম ··আমার আর সিমলাতে থাকা হইবে না—ঝাঁপান ঠিক কর। এই কথা বলিতে বলিতে দেখি যে আমার হৃৎকম্প কমিয়া যাইতেছে—তবে এই কি আমার ঔষধ হইল ?··· ঈশ্বরের আদেশ বাড়িতে ফিরিয়া যাওয়া। সে আদেশের বিরুদ্ধে কি মানুষের ইচ্ছা টিকিতে পারে ? সে আদেশের বাহিরে একটু ইচ্ছা করিতে গিয়া প্রকৃতিসুদ্ধ বিরুদ্ধে দাঁড়াইল।··· এখনও পথে ভয় আছে···স্থানে স্থানে বিদ্রোহী দলও রহিয়াছে (সিপাহী-বিদ্রোহ) কিন্তু আমি আর সে সকল ভাবনাকে মনে স্থান দিলাম না। নদী যেমন আপনার বেগমুখে প্রস্তরের বাধা মানে না আমিও তেমনি কোনো বাধা মানিলাম না"

রবীন্দ্রনাথ জীবন-স্মৃতিতে সদর স্ট্রীটের বাড়ির একটি প্রভাতের অভিজ্ঞতার যে বর্ণনা লিখেছেন তার সঙ্গে উপরোক্ত ঘটনার কিছু সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়।

"সদর স্ট্রীটের রাস্তাটা যেখানে গিয়া শেষ হইয়াছে সেইখানে বোধ করি ফ্রীস্কুলের বাগানের গাছ দেখা যায়—একদিন সকালে বারান্দায় দাঁড়াইয়া আমি সে দিকে চাহিলাম। তখন সেই গাছগুলির পল্লবান্তরাল হইতে সূর্যোদয় হইতে-ছিল। চাহিয়া থাকিতে থাকিতে হঠাৎ এক মুহূর্তের মধ্যে আমার চোখের উপর হইতে যেন একটা পর্দা সরিয়া গেল—দেখিলাম একটি অপরূপ মহিমায় বিশ্ব-সংসার সমাচ্ছন্ন—আনন্দে এবং সৌন্দর্যে সর্বত্রই তরঙ্গিত—আমার হৃদয়ে স্তরে স্তরে যে একটি বিষাদের আচ্ছাদন ছিল তাহা এক নিমেষেই ভেদ করিয়া আমার সমস্ত ভিতরটাতে বিশ্বের আলোক একবারে বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িল—সেই দিনই

"নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ" কবিতাটি নির্ঝরের মতোই যেন উৎসারিত হইয়া বহিয়া চলিল—লেখা শেষ হইয়া গেল। কিন্তু জগতের সেই আনন্দরূপের উপর তখন যবনিকা পড়িয়া গেল না—এমনি হইল, আমার কাছে তখন কেহই এবং কিছুই অপ্রিয় রহিল না।"

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ কবি হাফিজের ভক্ত ছিলেন—স্থফী কবিদের গান ভালবাসতেন—হাফিজের কাব্যরস তাঁর জীবনের মূলে রস সিঞ্চন করত।

রবীন্দ্রনাথের পিতা এবং পিতামহ যেন সমাজের চারদিকের দেওয়ালগুলি খুলে দিয়েছিলেন। বহু বিচিত্রভাব ও কল্পনার আলো এসে ঠাকুর পরিবারকে আলোকিত করেছিল।

ভ্রাতৃবৃন্দ

রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতাদের মধ্যে দার্শনিক দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এই তিন জনই ছিলেন কীর্তিমান পুরুষ। দ্বিজেন্দ্রনাথের রচনা ও জীবন সম্বন্ধে বাঙলাদেশের মানুষ অনেকখানি পরিচিত কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সঙ্গে ততটা নয়। সত্যেন্দ্রনাথ ভারতবর্ষে প্রথম আই. সি. এস. —ভারতে স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতার জন্য তাঁর অদম্য আগ্রহের কথা তাঁর স্ত্রী জ্ঞানদানন্দিনী দেবীকে লেখা চিঠিগুলি থেকে বোঝা যায়:

"এখানে (বিলাতে) জনসমাজের যাহা কিছু সৌভাগ্য যাহা কিছু উন্নতি যাহা কিছু সাধু স্থন্দর প্রশংসনীয়—স্ত্রীলোকের সৌভাগ্যই তাহার মূল। আমাদের দেশে এরূপ সৌভাগ্য কবে হইবে? যেখানে স্ত্রীলোকদের কোনো বিষয়ের কর্তৃত্ব নাই, যেখানে দেশাচার, ভর্তার আদেশ ও পরের বাক্যই তাহাদের জীবনের নিয়ম সেখান হইতে স্ত্রীসৌভাগ্য অনেক দূর। আমাদের আচারের বল অত্যন্ত অধিক, প্রত্যেকের নিজের শক্তি অতি অল্প। ইহাই আমাদের সকল তুর্দশার মূল।

" · যে দেশে স্ত্রীলোক জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত অন্তঃপুরের গণ্ডীতে বদ্ধ থাকে—যার গায়ে জামা দেওয়া দূষ্য, মুখ দেখলে পাপ বিবেচিত হয়, সে দেশে যে স্ত্রীলোকের পরিধেয় বহির্জীবনের উপযোগী হবে না তাতে সন্দেহ কি?" (সত্যেন্দ্রনাথের স্ত্রীই ভারতীয় নারীর শাড়ি পরার বর্তমান রীতির প্রচলন করেন।)···

"তুমি এখন পিঞ্জরের পাখীর মত বদ্ধ রহিয়াছ। তোমার শরীর ও মনের স্ফূর্তি ও উন্নতির এতটুকু স্থান নাই! আমি সেদিন এক চমৎকার স্বপ্ন দেখিয়াছি, যেন আমি বাড়ি ফিরিয়া গিয়াছি—তোমাদের সকলের সঙ্গে দেখা ও হাসি হইতেছে, হঠাৎ আমাদের বাড়ির ভিতরদিকের কাঠের ঝরকার দিকে নজর

পড়িল। তাহা আর আমি সহ্য করিতে পারিলাম না; আমি কাহাকে আদেশ করিলাম—কৈলাসকে বুঝি, যে ওসব ঝরকা ভাঙ্গিয়া ফেল—”

নারী মুক্তি আন্দোলনের পথিকৃৎরূপে সত্যেন্দ্রনাথ স্মরণীয়। এই প্রসঙ্গে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের দানও কম নয়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নিজের জীবন স্মৃতিতে লিখেছেন—

“এ সময়ে আমি পুরাতনপন্থী ছিলাম, তাই মেয়েদের স্বাধীনতা ব্যাপার লইয়া এই গ্রন্থে (কিঞ্চিৎ জলযোগ) একটু হাস্যরসের অবতারণা করিয়াছিলাম। এই বই লইয়া নব্যপন্থীদের দলে খুব একটা হৈ চৈ পড়িয়া গিয়াছিল। ‘বঙ্গদর্শনে’ বঙ্কিমচন্দ্র খুব ভালই বলিয়াছিলেন। এই সময়ে শ্রীযুক্ত তারকনাথ পালিত মহাশয় বিলাত হইতে দেশে ফিরেন। “কিঞ্চিৎ জলযোগ” পড়িয়া তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন—এতে দোষের কথা তো আমি কিছুই দেখিতেছি না।

“এর কিছুদিন পরে মেজদাদা বিলাত হইতে ফিরিয়া আমাদের পরিবারে যখন আমূল পরিবর্তনের বন্যা বহাইয়া দিলেন তখন আমারও মতের অনেক পরিবর্তন হইয়াছি... তখন হইতে আমি অবরোধ সমর্থক নহি, বরং ক্রমে ক্রমে একজন সেরা নব্যপন্থী হইয়া উঠিলাম। তখন স্ত্রী-স্বাধীনতার প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া আমি “কিঞ্চিৎ জলযোগ” লিখিয়াছিলাম বলিয়া অত্যন্ত দুঃখিত ও অনুতপ্ত হইয়াছিলাম।... স্ত্রী-স্বাধীনতার সম্বন্ধে শেষে আমি এত পক্ষপাতী হইয়া পড়িলাম যে, আমি যখন গঙ্গার ধারের কোনো বাগানবাড়ীতে সস্ত্রীক অবস্থান করিতেছিলাম. তখন আমার স্ত্রীকে আমি ঘোড়ায় চড়া শিখাইতাম। তারপর জোড়াসাঁকো আসিয়া দুইটি আরব ঘোড়ায়, দু'জনে পাশাপাশি চড়িয়া বাড়ি হইতে রোজ গড়ের মাঠ পর্যন্ত বেড়াইতে যাইতাম। ময়দানে দুইজনে ঘোড়া ছুট ইতাম। এইরূপে অন্তঃপুরের পর্দা তো উঠাইলামই, সেই সঙ্গে আমাব চোখের পর্দাটিও একেবারে উঠিয়া গেল। দাবোয়ানেরা অবাক হইয়া চাহিয়া থাকিত। প্রতিবেশীরা স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল। রাস্তার লোকেবা কৌতূহল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিত। আমার ভ্রূক্ষেপ নাই। আমি তখন উদ্দাম নব্যভাবের নেশায় মাতোয়ারা।”

রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্যজীবনেব উন্মেষে ভ্রাতা জ্যোতিরিন্দ্রের প্রভাবের কথা অনেক উল্লেখ করেছেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথও তাঁদেব সেই সময়কার পারিবারিক আবহাওয়ার কিছুটা পরিচয় দিয়েছেন :

“সরোজিনী প্রকাশের পর হইতেই রবিকে আমরা আমাদের দলে প্রমোসান দিয়া উঠাইয়া লইলাম। এখন হইতে সঙ্গীত ও সাহিত্য চর্চাতে আমরা তিনজন হইলাম—আমি, অক্ষয় (চৌধুরী) ও রবি...

"কোনো কল্পনা যদি কখনো তাঁহার (অক্ষয়বাবুর) মাথায় একবার ঢুকিত তবে সেটা বাহির হওয়া বড়ই মুস্কিল হইত। একবার রবি গোঁফদাড়ি পরিয়া একজন পার্শী সাজিয়া তাঁহাকে বড় ঠকাইয়াছিলেন। আমি বলিলাম—বোম্বাই হইতে একজন পার্শী ভদ্রলোক আসিয়াছেন—তোমার সঙ্গে ইংরাজী সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা করিতে চান। অক্ষয় অমনি তৎক্ষণাৎ স্বীকৃত হইলেন। রবি ছদ্মবেশী পার্শী হইয়া আসিয়া তাঁহার সঙ্গে সাহিত্য আলোচনা আরম্ভ করিয়া দিলেন। এই রবিকে তিনি কতবার দেখিয়াছেন, কণ্ঠস্বর তাঁর পরিচিত, কিন্তু ঐ যে পার্শী বলিয়া তাঁহার ধারণা হইয়াছে সে তো শীঘ্র যাইবার নয়। অক্ষয়বাবু বাইরণ শেলী প্রভৃতি আওড়াইয়া খুব গম্ভীরভাবে আলোচনা আরম্ভ করিয়া দিলেন। আমরা আর হাস্য সংবরণ করিতে পারি না। এমন সময় শ্রীযুক্ত তারকনাথ পালিত মহাশয় আসিয়া উপস্থিত—আসিয়াই তিনি "এ কে—রবি ?" বলিয়া রবির মাথায় থাপ্পড় মারিলেন, অমনি কৃত্রিম দাড়ি গোঁফ সব খসিয়া গেল" (প্রবাসী। ১৩২১, অগ্রহায়ণ কষ্টিপাথর)

রবীন্দ্রনাথের জীবনে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও তাঁর পত্নী কাদম্বরী দেবীর প্রভাব সামান্য নয়, এ সম্বন্ধে তিনি নানা স্থানে নানাভাবে লিখে গিয়েছেন। অন্যান্য অনেকেও আলোচনা করেছেন, কেহ বা কল্পিত কেহ বা অনুমানে নানা রহস্যময় কাহিনীও লিখেছেন। এঁদের রচনায় কোথাও কোথাও গ্লানিকর ইঙ্গিতও করা হয়েছে। এ সম্বন্ধে এইটুকুই বলা যায়—যাদৃশী ভাবনা যস্য—কিন্তু রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং তাঁর কৈশোরের এই কয়েক বছরের স্মৃতি দীর্ঘ জীবন ধরে সযত্নে লালন করেছেন, তাঁর থেকে প্রেরণা ও আনন্দ পেয়েছেন এবং এই আত্মিক পরিবেশটি সম্পূর্ণ তাঁর নিজেরই সৃষ্টি—সে কথাও তাঁর জানা ছিল। শেষ বয়সে কৌতুক করে বলতেন, "ভাগ্যিস নূতন বৌঠান মারা গিয়েছিলেন তাই আজও তাকে নিয়ে কবিতা লিখছি —বেঁচে থাকলে হয়ত বিষয় নিয়ে মামলা হত !" অতি পরিণত বয়সে তাঁর লেখা একটি পত্রে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের দাম্পত্যজীবনের যে ছবিটি পাওয়া যায় তাতে বোঝা যায় যে, তাঁদের যুগ্মজীবনের এমন কোনও মাধুর্য ছিল যা কবির অনুভূতিকে গভীরভাবে স্পর্শ করেছিল।

—"সেদিন হঠাৎ এক সময়ে জানিনে কেন ছেলেবেলাকার একটা ছবি খুব স্পষ্ট করে আমার মনে ভেসে উঠল। শীতকালের সকাল, বোধ হয় সাড়ে পাঁচটা। অল্প অল্প অন্ধকার আছে, চির অভ্যাসমত ভোরে উঠে বাইরে এসেছি—গায়ে খুব অল্প কাপড়, কেবল একখানা সুতোর জামা এবং ইজের। এরকম খুব গরীবের মতোই আমাদের বাল্যকাল কেটেছে। ভিতরে ভিতরে শীত করছিল। তাই একটা

কোণের ঘর, যাকে আমরা তোষাখানা বলতুম, যেখানে চাকররা থাকত সেখানেই গেলুম। অন্ধকারে জ্যোতিদার চাকর চিন্তে লোহার আঙটায় কাঠের কয়লা জ্বালিয়ে তার উপরে ঝাঁঝরি রেখে জৈদার জন্য রুটি তোস্ করছে। সেই রুটির উপর মাখন গলার লোভনীয় গন্ধে ঘর ভরা। তার সঙ্গে ছিল চিন্তের গুন্‌গুন্ গান আর সেই কাঠের আগুন থেকে বড়ো আরামের অল্প একটু তাত! আমার বয়স তখন বোধহয় নয় হবে। ছিলুম স্রোতের শেওলার মতো—সংসার প্রবাহের উপর তলায় হালকা ভাবে ভেসে বেড়াতুম। কোথাও শিকড় পৌছয়নি, যেন কারু ছিলাম না, সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত চাকরদের হাতেই থাকতে হত, কারু কাছে কিছু মাত্র আদর পাবার আশা ছিল না—জৈদা তখন বিবাহিত, তাঁর জন্য ভাববার লোক ছিল, তাঁর জন্য ভোর বেলা থেকেই রুটি তোস্ আরম্ভ, আমি ছিলুম সংসার পদ্মার বালুচরের দিকে, অনাদরের কূলে, সেখানে ফুল ছিল না; ফল ছিল না—আর জৈদা পদ্মার যে কূলে ছিলেন সেই কূল ছিল শ্যামল দূর থেকে সেখানকার কিছু গান আসত, সচল জীবনের ছবি একটু আধটু চোখে পড়ত। বুঝতে পারতুম ঐখানেই জীবনযাত্রা সত্য কিন্তু পাব হয়ে যাবার খেয়া ছিল না···ছেলেবেলা বাস্তব জগৎ থেকে দূরে ছিলুম বলেই তখন থেকে চিরদিন আমি সুদূরের পিয়াসী।

"···সেদিন আমিই ছিলুম ছায়ার মতো, আমার সংসারে বস্তু ছিল না, ঘরে ছিলনা আত্মীয়তা, বাইরে ছিলনা বন্ধুত্ব। জ্যোতিদাদা ছিলেন নিবিড় ভাবে সত্য, তাঁর সংসার ছিল নিবিড় ভাবে তাঁর নিজের। সেদিন মনে করা অসম্ভব ছিল এই যেটুকু দেখছি, যা ঘটছে এর কিছু ব্যত্যয় হোতে পারে, পূর্ণতার যে চেহারা দেখা যেত কিছুতেই ভাবা যেতে পারত না কোনোকালে তার অন্ত আছে। সেদিনকার সেই রুটি তোস সুগন্ধি সকাল বেলা যে পূর্ণজীবনের রূপক ছিল সেদিন আমার সমস্ত জীবনে তার সমতুল্য কিছুই ছিল না, কিন্তু কোথায় সেই গুন-গুন করে গান করা চিন্তে চাকর আর জৈদা তাঁর যা কিছু সমস্ত নিয়ে কোথায়? আজ সেই শীতের সকালের অনাদৃত রবি জাহাজে চলেছে বৃহৎ জগতে। সেদিনের সব চেয়ে যা সত্য তার কোনো চিহ্ন নেই; আর সবচেয়ে যা ছায়া তা আজ অদ্ভুত রকমে প্রকাণ্ড হয়ে উঠেছে!" (পথে ও পথের প্রান্তে)

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের দাম্পত্যজীবনের মাধুর্য ও সৌন্দর্যের কথা 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথ' সম্বন্ধে ১৩৩২ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের 'শান্তিনিকেতন' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে বিস্তারিত ভাবে লেখা হয়েছে—"যৌবনের গৃহধর্ম পালন জন্য বিবাহ করিয়া যৌবন শেষের পূর্বেই তিনি বিপত্নীক হন এবং যে বয়সে তিনি বিপত্নীক হন সে বয়স পর্যন্ত অনেকে বিবাহও করেন না, এই জন্য তিনি আত্মীয়-বন্ধুবান্ধব দ্বারা বার

বার অনুরুদ্ধ হইলেও আর দ্বিতীয় বার দার পরিগ্রহ করেন নাই। কেন করেন নাই, একথা একদিন আমি ধৃষ্টতা সহকারে জিজ্ঞাসাও করি—"তাঁকে ভালোবাসি" একটি ছোট্ট কথা এবং এ কথাটি বলিতেই তাঁর কষ্ট হইতেছে বুঝিয়া এই উত্তরটুকু পর আমি আর এ সম্বন্ধে অন্য কিছু তাঁকে জিজ্ঞাসা করি নাই।..."

হিন্দু মেলা

হিন্দু মেলায় কবি হিসাবে রবীন্দ্রনাথের প্রথম লোকসমক্ষে আবির্ভাব। 'হিন্দু মেলা' বাঙালীর চিত্তে প্রথম স্বাদেশিকতার উদ্বোধনের একটি রূপ।

১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে, অর্থাৎ সিপাহী বিদ্রোহের দশ বছর পর এই মেলার প্রতিষ্ঠা হয়।...এর প্রধান সহায় ছিলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। রাজনারায়ণ বসু লিখেছেন —"কুমারী মেরি কার্পেণ্টার যখন কলিকাতায় আসেন তখন দেবেন্দ্রবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিবার অভিলাষ প্রকাশ করিয়াছিলেন—সে অভিলাষের কথা শুনিয়া তিনি তাঁহার জমিদারীর নিকটস্থ—কুষ্টিয়া উপনগরে পলাইয়া যান। দেবেন্দ্রবাবু স্বভাবত ইংরেজের সঙ্গে আলাপ করিতে অনিচ্ছুক, যেহেতু ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় বিষয়ে তাঁহাদিগের সহিত তাঁহার মতের মিল হয় না।...

এ দেশে ইংরেজি শিক্ষার প্রথম প্রবর্তন কালে শিক্ষিত সম্প্রদায়ে যে উচ্ছৃঙ্খলতা দেখা দিয়াছিল তাহা অল্পদিনের মধ্যেই ব্যয়িত হইয়া আসিয়াছিল—এবং জাতির প্রচলিত সংস্কার মাত্রই যে কুসংস্কার নহে—সে সকল যে সমাজের প্রয়োজনে প্রবর্তিত হইয়াছিল এবং হয়ত প্রয়োজন শেষ হয় নাই এমন বিশ্বাসও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনে হইতেছিল—সেইজন্যই ইহাদের কেহ কেহ দেশের পুরাতন ধর্মগ্রন্থ প্রভৃতির সার সত্যের সন্ধান করিতেছিলেন। ফলে স্বদেশপ্রীতি পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইতেছিল।"

হিন্দু মেলার প্রতিষ্ঠা এই পরিবর্তিত মনোভাবের পরিচায়ক। বস্তুত হিন্দু মেলার উদ্দেশ্য বা মেনিফেষ্টোর সঙ্গে পরবর্তী কালে ১৮৮৫তে জাতীয় কংগ্রেসের মেনিফেষ্টোর অনেক সাদৃশ্য আছে। দেশের আর্থিক অবস্থার উন্নতির জন্য হিন্দু মেলার যে সক্রিয় কার্যক্রম ছিল তা আরো ব্যাপক—কেবল মাত্র কংগ্রেসের বিবৃতিতে একটি বিশেষ অগ্রগতির কথা ছিল তা হচ্ছে—"প্রত্যক্ষ ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠতার দ্বারা দেশ-প্রেমিকদের মধ্যে জাতিগত ধর্মগত বা প্রাদেশিক বৈষম্যভাব দূরীকরণ"...

হিন্দু মেলার উদ্বোধনের প্রধান প্রেরণা দেশপ্রেম। গান্ধীজীর নির্দেশের অনেক পূর্বেই মেলার সংগঠকরা ঘোষণা করেছিলেন—"দৈহিক বল প্রয়োগ না করিয়া, রাজশক্তির বিরোধিতা না করিয়া (বিদেশী রাজার), আইনের সাহায্য ভিক্ষা না করিয়া, ভারতের প্রণষ্ট গৌরব পুনরুদ্ধার করা সম্পূর্ণ আমাদিগের দ্বারা সম্ভব,

আমরা ইংলণ্ডের পণ্য ব্যবহার করিব না এই সংকল্প করিতে পারি—"Let us make use of this potent weapon (moral hostility) by resolving to non-consume the goods of England."

সে সময়টি স্বদেশপ্রেমের সময় ছিল না, শিক্ষিত লোক দেশের ভাষা ও ভাব দুই দূরে রাখতে চেষ্টিত ছিলেন কিন্তু হিন্দু মেলা প্রসঙ্গে সে কথার উল্লেখ করে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন "বাহির হইতে দেখিলে আমাদের পরিবারে অনেক বিদেশী প্রথার চলন ছিল কিন্তু আমাদের পরিবারের হৃদয়ের মধ্যে যে একটা স্বদেশাভিমান স্থির দীপ্তিতে জাগিতে ছিল, স্বদেশের প্রতি পিতৃদেবের যে আন্তরিক শ্রদ্ধা তাঁহার জীবনের সকল প্রকার বিপ্লবের মধ্যেও অক্ষুণ্ণ ছিল তাহাই আমাদের পরিবারস্থ সকলের মধ্যে একটি প্রবল স্বদেশপ্রেম সঞ্চার করিয়া রাখিয়াছিল। আমাদের বাড়ির সাহায্যে হিন্দু মেলা বলিয়া একটি মেলা সৃষ্টি হইয়াছিল•••এই মেলায় দেশের স্তবগান গীত, দেশানুরাগের কবিতা পঠিত, দেশী শিল্প ব্যায়াম প্রভৃতি প্রদর্শিত ও দেশী গুণী লোক পুরস্কৃত হইত।"

কিশোর রবীন্দ্রনাথ

সেই হিন্দু মেলায় সম্ভবত রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রকাশ্য সভায় কবিতা পাঠ। এই কবিতা প্রসঙ্গে জীবনস্মৃতিতে আছে—"তখনকার ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট রুশিয়াকেই ভয় করত কিন্তু চৌদ্দ পনেরো বছর বয়সের বালক কবির লেখনীকে ভয় করিত না। এইজন্য সেই কাব্যে বয়সোচিত উত্তেজনা প্রভূত পরিমাণে থাকা সত্ত্বেও তখনকার প্রধান সেনাপতি হইতে পুলিসের কর্তৃপক্ষ পর্যন্ত কেহ কিছুমাত্র বিচলিত হইবার লক্ষণ প্রকাশ করিল না।•••সেটা পড়িয়াছিলাম হিন্দু মেলায় দাঁড়াইয়া। শ্রোতাদের মধ্যে নবীন সেন মহাশয় উপস্থিত ছিলেন "•••

কবি নবীনচন্দ্র সেন তাঁর "আমার জীবন" গ্রন্থে এই ঘটনার উল্লেখ করেছেন : "স্মরণ হয় ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে আমি কলিকাতায় ছুটিতে থাকিবার সময় কলিকাতার উপনগরস্থ কোনো উদ্যানে "নেশানাল মেলা" দেখিতে গিয়াছিলাম—একজন সদ্যপরিচিত বন্ধু আমাকে মেলার ভিড়ে পাকড়াও করিয়া বলিলেন যে, একটি লোক আমার সঙ্গে পরিচিত হইতে চাহিতেছেন। তিনি আমার হাত ধরিয়া উদ্যানের এক কোণে এক প্রকাণ্ড বৃক্ষতলায় লইয়া গেলেন, দেখিলাম, সেখানে সাদা ঢিলা ইজার চাপকান পরিহিত একটি সুন্দর নব যুবক দাঁড়াইয়া আছেন—বয়স ১৮।১৯, শান্ত, স্থির, বৃক্ষতলায় যেন একটি স্বর্ণ মূর্তি স্থাপিত হইয়াছে। বন্ধু বলিলেন, "ইনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কনিষ্ঠ পুত্র, রবীন্দ্রনাথ"—

এই সময়ে রবীন্দ্রনাথের বয়স আঠার উনিশ নয়—চৌদ্দ বৎসর ছিল। হিন্দু মেলায় পঠিত কবিতাটির শেষাংশ এখানে উদ্ধৃত করা হল :

১৮. ভারত কঙ্কাল আর কি এখন
পাইবে হায়রে নূতন জীবন
ভারতের ভস্মে আগুন জ্বালিয়া
আর কি কখনও দিবেরে জ্যোতি !

১৯. তা যদি না হয় তবে আর কেন
হাসিবি ভারত! হাসিবিরে পুনঃ
সেদিনের কথা জাগি স্মৃতিপটে
ভাসে না নয়ন বিষাদ জলে।

২০. অমর আঁধার আসুক এখন
মরু হয়ে থাক ভারত কানন
চন্দ্র সূর্য হোক মেঘে নিমগন
প্রকৃতি শৃঙ্খলা ছিঁড়িয়া যাক্।

২১. যাক্ ভাগীরথী অগ্নিকুণ্ড হয়ে
প্রলয়ে উপাড়ি পাড়ি হিমালয়ে
ডুবাক ভারতে সাগরের জলে
ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ভাসিয়া যাক্।

২২. মুছে যাক্ মোর স্মৃতির অক্ষর
শূন্যে হোক লয় এ শূন্য অন্তর
ডুবুক আমার অমর জীবন
অনন্ত গভীর কালের জলে।

কিশোর রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত স্বরূপ কি রকম ছিল দুই চার জন সমসাময়িকের স্মৃতিকথায় তার সামান্য পরিচয় নিহিত আছে। আচার্য শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার লিখছেন—"কবির বয়স যখন আঠার বৎসর পোরে নাই তখন একদিন কলিকাতা মেডিকেল কলেজ থিয়েটারে তরুণ বয়স্কদের একটি সমিতিতে রবীন্দ্রনাথ ছোট একটি প্রবন্ধ পড়িয়াছিলেন, আর সেই সঙ্গে গোটা দুই গানও গাহিয়াছিলেন। দৈবে সেদিনকার সেই সভার সভাপতি ছিলেন স্বনামখ্যাত পণ্ডিত রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। এই সুশিক্ষিত গুণগ্রাহী সভাপতি বালক রবীন্দ্রনাথের পাঠ ও গানের শেষে তাঁহাকে সাদরে বলিয়াছিলেন যে, তিনি বালক কবির প্রতিভায় কবিগুরু বাল্মীকির প্রতিভা লক্ষ্য করিয়া আনন্দিত হইয়াছেন। জ্ঞানী

কৃষ্ণমোহন কথনো অত্যুক্তি করিতেন না। কাজেই তাঁহার মন্তব্যটুকু শুনিয়া সভার লোকেরা অত্যন্ত বিস্মিত হইয়াছিল··· গুণগ্রাহী কৃষ্ণমোহন কত অল্প আভাসে বালকের প্রতিভার অঙ্কুরের অতুল ভবিষ্যৎ বিকাশ লক্ষ্য কবিতে পারিয়াছিলেন। এইটি তাঁর প্রথম প্রকাশ্য সভায় বক্তৃতা।"

কবি দীনেশ চরণ বসু ১২৯৩ সালের বৈশাখ মাসে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। সে সম্বন্ধে তিনি দীনেশ চরণ সেনকে ঐ সালেরই ১৬ই বৈশাখ একখানা চিঠি লেখেন:

"পূর্বপত্রে লিখিয়াছিলাম বঙ্গ সাহিত্য জগতের উঠন্ত রবি রবিঠাকুরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইব। বিগত কল্য তাহাই করিয়াছিলাম। ঠাকুর বাড়ীর প্রকাণ্ড পুরীতে প্রবেশ করিয়া দোতালার সিঁড়িব মুখেই রবিঠাকুবের সহিত সাক্ষাৎ হইল। নয়ন মুগ্ধ, মন আনন্দ সাগবে ডুবিল। কোন ইংবেজী পুস্তকে অমর কবি মিল্টনের দেবমূর্তি, দেখিয়াছ কি? দেখিয়া থাকিলে সেই মূর্তিতে রবিচ্ছায়া দেখিতে পাইবে। দেহ-ছন্দ-সুদীর্ঘ, বর্ণ বিশুদ্ধ গৌর, মুখাকৃতি দীর্ঘ, নাসা, চক্ষু, ভ্রূ সমস্তই সুন্দর যেন তুলিতে আঁকা। গুচ্ছে গুচ্ছে কয়েকটি কেশতরঙ্গ স্কন্ধের উপর আসিয়া পড়িয়াছে। পরিধানে ধুতি। কেন বলিতে পারি না, রবিঠাকুরেব অপূর্ব মূর্তি দেখিয়া বোধ হইল যেন এই অঙ্গে গৈরিকবসন বেশ শোভা ধারন করিত। ঊনবিংশ শতাব্দীর (Albert) ইত্যাদি, কেশ রক্ষার ফ্যাশনের মধ্যে দীর্ঘকেশ দেখিবাব জিনিস বটে এবং যে তাহাকে রক্ষা কবে তাহাকেও সাহসী পুরুষ বলিতে হইবে। সাহিত্য সম্বন্ধে বহুক্ষণ আলাপ হইল। রবিঠাকুরের বয়স অতি অল্প, তেইশেব অধিক হইবে না। কিন্তু স্বভাব স্থির, কলেজে থাকিতে মিল্টনকে তাঁহার সহপাঠিগণ "lady' আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন, রবিঠাকুরকেও সেই আখ্যা প্রদান কবা যাইতে পাবে। স্বব অতি কোমল ও সুমিষ্ট রমণীজনোচিত। রবিঠাকুরেব গানের কথা শুনিয়াছিলাম কিন্তু গান শুনি নাই। তাহাকে একটি গান গাইতে অনুরোধ করা হইল। সাধাসাধি নাই, বনবিহঙ্গেব ন্যায় স্বাধীন উন্মুক্ত কণ্ঠে অমনি গান ধরিলেন, গানটি সিন্ধুখাম্বাজ একতালা— আমায় বোলোনা গাহিতে বোলোনা।"

বাল্যকাল

জীবনস্মৃতিতে রবীন্দ্রনাথ তাঁর বাল্যকালের স্কুল জীবনের কথা বিস্তারিত ভাবে লিখেছেন—দাদা সোমেন্দ্রনাথ, ভাগিনেয় সত্যপ্রসাদ গাঙ্গুলী ও রবীন্দ্রনাথ এই তিন বালকের ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীতে ভর্তি হওয়া, একাডেমিতে বিদ্যাচর্চার সকৌতুক বর্ণনা রয়েছে।

৮ই মার্চ ১৮৭৫ সালে রবীন্দ্রনাথের মাতৃবিয়োগ হয় তখন তাঁর বয়স ১৩ বছর ১০ মাস।

মাতৃবিয়োগের পর কাদম্বরী দেবী মাতৃহীন দেবরদেব দেখাশোনার ভার নিয়েছিলেন এই কথা রবীন্দ্র-জীবনীতে উল্লেখ আছে। তার দীর্ঘদিন পরে ১৯৪০ সালে মংপুতে বাসকালে একটি কবিতায় এই সময়কার স্মৃতির ছবি লেখা হয়েছে—কবিতাটি পরিবর্তিত রূপে পরে প্রকাশিত হয়েছে—প্রথম পাঠটি আমাদের কাছে যেমন ছিল তেমনই এখানে উদ্ধৃত হল :

ভদ্র ঘরের ছেলে, ছাঁচে ঢালা পালিশ করা সংসার
অসমান নেই কোথাও কিছু—
হঠাৎ চমক লাগে না কোনোখানে।
দিনগুলো চলে লম্বা সারে পোষা পশুর মতো
একটার পিছনে আর একটা দড়ি দিয়ে বাঁধা।
মল্লিকদের বাড়ী ঘণ্টা বাজে
অন্দর মহল থেকে দুধ আসে এক বাটি।
নিয়মনিষ্ঠ মাস্টার আসে ঠিক সময়ে
সাতটা বাজতেই।
নিয়ম ভীতু আমি পড়ি কাষ্ট´বুক রীডার
কালো মলাটটা ঢিলে
পাতাগুলো অনিচ্ছুক হাতের অনর্থক চিহ্নে
আঁকজোক কাটা।
নিজের বুদ্ধি নিয়ে রোজই শুনি একই বিচার
মন্তব্যটা স্মরণীয় হয় চড়ে চাপড়ে।
পাশের বারান্দায় বুড়ো দর্জি, চোখে চশমা
ঝুঁকে পড়ে কাপড় সেলাই করচে এক মনে,
দেখি তাকে আর ভাবি সুখে আছে নেয়ামৎ।
দেউড়ির সামনে চন্দ্রভান লম্বা দাড়ি
কাঠের কাঁকুই দিয়ে আঁচড়ে তুলছে
দুই কানে দুই ভাগে
কাছে বসে কাঁকন পরা ছোকরা দারোয়ান
কুটচে দোক্তা।

উঠোনে ঘোড়া দুটো সকাল বেলাই খেয়ে গেছে
বালতিতে বরাদ্দ দানা।
কাকগুলো ঠোক্‌রাচ্ছে ছিটিয়ে পড়া ছোলা
জনি কুকুরটা অনাবশ্যক কর্তব্য বুদ্ধিতে
সশব্দে দিচ্ছে এসে তাড়া
সূর্য উপরে উঠে যায় অর্ধেক আঙ্গিনায়
পড়ে বাঁকা ছায়া
ন'টা বাজে।
—বেঁটে কালো গোবিন্দ কাঁধে হল্‌দে রঙের ময়লা গামছা
নিয়ে যায় স্নান করাতে।
সাড়ে ন'টা বাজতেই দৈনিক অন্নের পুনরাবৃত্তি
খেতে হয় না রুচি।
নির্মম ঘণ্টা বাজে দশটায়—
মন উদাস করা হাঁক শোনা যায় দূরে
কাঁচা আমওয়ালার।
বাসনওয়ালা ঠং ঠং আওয়াজ দিয়ে চলেছে গলি বেয়ে
দূরের থেকে দূরে।

বড়ো বউদিদি পাশের বাড়িতে
ভিজে চুল এলিয়ে দিয়েছে পিঠে—
পশমের গলা বন্ধ বুনচে মাথা নিচু করে—।
ছাতের উপর কুসুম আর মনি
কড়ি নিয়ে খেলচে
কোনো তাড়া নেই।
বুড়ো ঘোড়া আমাকে টেনে নিয়ে যায় গাড়িতে
আমার দৈনিক নির্বাসনে—।
সমস্ত পথে দুর্ভাবনায় অটল সহচর
মাস্টার মহাশয়ের মঞ্চে সমাসীন
ক্ষমাহীন মূর্তি।

ফিরে আসি ইস্কুল থেকে
বিরস দিনের মরচে পড়া আলো মিলিয়ে আসে—

ইট কাঠের জটিল জঙ্গলে।
বিশ্রামহীন সহরের পাঁচ মিশোলি ঝাপসা শব্দ
স্বপ্নের সুর লাগায়—
তন্দ্রা শিথিল প্রকাণ্ড প্রাণে।
পড়বার ঘরে জ্বলে ওঠে তেলের বাতি
অনবচ্ছিন্ন শাসন বিধির তর্জনী শিখা—
পর দিনের পড়া চাই।
কঠিন গাঁট বেঁধে দেয় সন্ধ্যা
এ দিনের বেরঙ্গা অভ্যাসের সঙ্গে ওদিনের।
—পড়তে পড়তে ঢুলি, ঢুলতে ঢুলতে চমকে উঠি।
বিছানায় ঢোকার আগে একটুখানি পোড়ো অবকাশ
সেখানে শুনতে শুনতে শোনা শেষ হয় না
রাজপুত্র চলেছে তেপান্তর পার হতে।
একদিন বাজল সানাই বারোয়াঁ সুরে
শুকনো ডাঙ্গায় প্লাবন নামল
বাড়িতে এলো নতুন বউ
কচি বয়সের লাবণ্য ঢল ঢল।
কাঁচা শাম্‌লা রংএর হাতে সরু সোনার চুড়ি
মলিন দিনশ্রেণীর কালো ছাপলাগা পাঁচিল
.ভু ফাঁক হয় যেন জাদুমন্ত্রে
দেখা দিল অপূর্ব দেশের অপরূপ রাজকন্যা।
ছম ছম করতে লাগল সন্ধ্যা
কাঁপতে লাগল অদৃশ্য আলোয়
ঘুরে বেড়াই, সাহস হয় না কাছে আসতে
ওদিক থাকে অভাবনীয়, এদিকে থাকে উপেক্ষিত।
রাত হয়ে আসে।
স্বরূপ সর্দার হাঁক দিয়ে যায়
ছেঁড়া সেলাই করা দড়িতে ঝোলানো মশারি
তার ভিতরের আকাশ ভরে ওঠে গোধুলি রঙে
চেলির রাঙা অন্ধকারে—
এই স্মৃতিচিত্র বালক ও কিশোর রবীন্দ্রনাথের প্রাত্যহিক জীবনের বাস্তব ছবি

তাঁর কবি মন বাঁধা ধরা পড়াশুনো ও স্কুলের বন্দী দশায় হাঁপিয়ে উঠেছে এমন সময় এল বালিকা বধূ (জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পত্নী) বাড়িতে বালক কবির মন হল নূতনত্বের স্পর্শে অভিভূত।

কবি-পত্নী মৃণালিনী দেবী

২২শে অগ্রহায়ণ ১২৯০ সালে ও ৯ই ডিসেম্বর ১৮৮৩ তারিখ ২২ বছর ৭ মাস বয়সে বেনীমাধব রায়চৌধুরীর কন্যা ভবতারিনীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বিবাহ হয়। বিবাহের পর নাম পবিবর্তন করে মৃণালিনী নাম রাখা হয়। বেনীমাধব রায়চৌধুরী ঠাকুর বাড়ির জমিদারী সেরেস্তায় কাজ করতেন সামান্য মাইনেয়। তাঁর কন্যার বয়স তখন এগার বছর মাত্র। শোনা যায় তাঁর কথায় যশোর জেলার টান খুব বেশী ছিল বলে বিবাহের পর কিছুদিন পর্যন্ত কথাবার্তা বলেন নি। এদিকে রবীন্দ্রনাথ তখন বাঙলার তরুণ কবি, তাঁর যশ ও প্রতিভা স্বীকৃতি পেয়েছে দেশের গুণী সমাজে। তাঁর মন কবিত্বের প্রেরণায় উদ্দীপিত। এই অসম অবস্থার বিবাহ তাঁর পক্ষে রুচিক[illegible] অসম্ভব এই রকম অনুমান কেহ কেহ করেছেন। কিন্তু তিনি প্রিয় বন্ধু প্রিয়নাথ সেনকে স্বয়ং বিবাহের যে নিমন্ত্রণ পাঠিয়েছিলেন তা পড়লে মনে হয় না যে তখন কোনো ক্ষোভের, বা দুঃখের ঘটনা ঘটেছে বা অনভিপ্রেত কোনো কাজ তাঁকে করতে হচ্ছে। চিঠিখানিতে তাঁর স্বভাবসম্মত কৌতুকের ছোঁয়া রয়েছে:

"প্রিয় বাবু,

আগামী রবিবার ২৪শে অগ্রহায়ণ তারিখে শুভদিনে শুভলগ্নে আমার পরমাত্মীয় শ্রীমান রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শুভবিবাহ হইবেক আপন তদুপলক্ষে বৈকালে উক্ত দিবসে ৬নং জোড়াসাঁকোস্থ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভবনে উপস্থিত থাকি। বিবাহাদি সম্পন্ন করিয়া আমাকে এবং আত্মীয়গণকে বাধিত করিবেন।

ইতি—

অনুগত

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

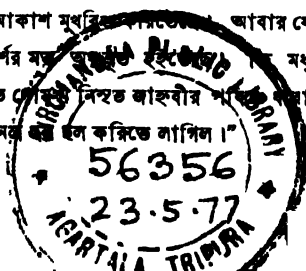
মৃণালিনী দেবী ও রবীন্দ্রনাথের বিবাহিত জীবন সম্বন্ধে ইন্দিরা দেবী লিখছেন:

"বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নানা ছবি বায়স্কোপে মত স্মৃতির পর্দায় দেখা দিয়ে সরে সরে যেতে থাকে। দেশে ফেরবার সময় জাহাজে প্রচণ্ড ঝড় ওঠে আর টেবিলের ধারে রেলিং থাকা সত্ত্বেও ঝন্‌ঝন্ করে পেয়ালা পিরিচ পড়ে যায়।

রবিকা আমাদের সঙ্গেই ফিরেছিলেন—ভাইদের মধ্যে মেজদাদা (পিতৃদেব সত্যেন্দ্রনাথ) এবং নতুন দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ (তিনি বলতেন জ্যোতিদাদা) এই দুজনের পরিবারের সঙ্গেই তাঁর বেশি ঘনিষ্ঠতা ছিল। নতুন কাকিমার মৃত্যুর পর তাঁকে কি রকম মনমরা দেখেছিলুম তা এখনও মনে পড়ে। আমরা জোড়াসাঁকোর বাড়িতে বেশি থাকতুম না। প্রায় বাইরে খোলা যায়গায় ভাড়া বাড়িতে থাকতুম। তবে যখন সেখানে মাঝে মাঝে বাস করেছি—তখন তেতালায় জ্যোতিকাকা মশায়দের ঘরেই থেকেছি মনে আছে এবং রবিকা সর্বদাই আমাদের সঙ্গী ছিলেন। তাঁর সঙ্গে মাঝে মাঝে সভা-সমিতিতে যেতুম যদিও সে বয়সে ঠিক কি বুঝতুম তা ভগবানই জানেন। আদি ব্রাহ্ম সমাজের মাসিক উপাসনায় তাঁর গানের সঙ্গে হারমোনিয়াম বাজাতুম। তাঁর গান সেকালে যাঁরা শুনেছেন তাঁরা জানেন যে তাঁর কি রকম চড়া, খোলা, দরাজ গলা ছিল।* মধ্যমে ধরা ছিল তার পক্ষে স্বাভাবিক এবং তারা সপ্তকের উঁচু সা পর্যন্ত তাঁর গলা অনায়াসে উঠত। পারিবারিক বন্ধু অক্ষয় চৌধুরী মহাশয় এবং জ্যোতিকাকা মহাশয়ের সঙ্গে পিয়ানোতে বসে একত্র গান বাঁধার কথা তো তাঁর জীবনীতে সকলেই পড়েছেন।…নূতন কাকীমা মারা যাবার পর জ্যোতিকাকা মহাশয় আমাদের কাছেই থাকতেন—তার আগে সদর স্ট্রীটের বাড়িতে সকলে একবার এক সঙ্গে ছিলুম—যাঁরা রবিকাকার জীবনীর সঙ্গে পরিচিত তাঁরাই জানেন সদর স্ট্রীটের বাড়িতে তাঁর কি রকম মনশ্চক্ষুর উন্মীলনের বর্ণনা আছে।

'বাবা বোম্বাই প্রদেশে চাকরি করবার সময়ে তাঁর আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে তাঁর কাছে গিয়ে থাকে নি হেন লোক প্রায় ছিল না সুতরাং রবিকা তো যাবেনই।

* নবীনচন্দ্র সেন রবীন্দ্রনাথের গান শুনেছিলেন সে সম্পর্কে তিনি লিখেছেন :—"আমরা যখন তাঁহাকে (রবীন্দ্রনাথকে) একটি গান গাইতে বিশেষ অনুরোধ করিয়া হারমনি ফ্লুট তাঁহার সম্মুখে দিলাম তিনি বলিলেন, তিনি কোনো যন্ত্রের সঙ্গে গাইতে ভালোবাসেন না, কারণ যন্ত্রে গলার মাধুর্য ঢাকিয়া ফেলে। তিনি একটি মাত্র পর্দা কিছুক্ষণ টিপিয়া, সুরটি মাত্র স্থির করিয়া যন্ত্র ছাড়িলেন, তাহার পর পকেট হইতে একখানি কাগজ বাহির করিয়া যে কীর্তনের গান রচনা করিয়া আনিয়াছেন উহা গাহিতে লাগিলেন… 'এস এস ফিরে এস বধু হে ফিরে এস, আমার ক্ষুধিত তৃষিত তাপিত চিত নাথ হে ফিরে এস…' একে এই সুললিত রচনা, অপূর্ব কবিত্ব, প্রেম ও ভক্তি উচ্ছ্বাস, তাহাতে রবিবাবুর কামিনী লাঞ্ছিত, বংশী বিনিন্দিত মধুর কণ্ঠ আমার বোধ হইতে লাগিল কণ্ঠ একবার গৃহ পূর্ণ করিয়া ছাদ ভিন্ন করিয়া, আকাশ মুখরি[illegible] আবার যেন শিশুর কোমল অস্ফুট কণ্ঠের মত কণ্ঠে কোমল মধুর স্পর্শের ম[illegible] হইতেছে [illegible] মধুর মুখভঙ্গী…গানের করুণ ভক্তিরস যেন তাঁহার অধর হইতে [illegible] নিসৃত জাহ্নবীর [illegible] মত প্রবাহিত হইতেছে…আমার কঠোর হৃদয়ও গলিল নেত্র [illegible] জল করিতে লাগিল।"



রত্নগিরির কাছে কারওয়ার নামে সুন্দর বন্দর থেকে তিনি বিয়ে করতে কলকাতায় আমাদের সঙ্গে চলে আসেন মনে আছে—তখন তাঁর বয়স বছর বাইশ হবে। আমার বড় পিসেমশাই সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় ঠিক তার আগেই মারা যান বলে বিয়েতে তেমন ধুমধাম হয় নি। আর কি জানি কেন সে ঘটনা আমার মনে কোনো ছাপ রেখে যায় নি। ধারাবাহিকতা রক্ষার্থে অবশ্য আগেই বলা উচিত ছিল যে মা, নতুন কাকিমা প্রভৃতি তাঁর কনে খোঁজবার দলের মধ্যে আমরাও যশোর গিয়েছিলাম—এবং নরেন্দ্রপুরে আমরা দাদামশায় অভয়াচরণ মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে উঠেছিলুম। সেই প্রথম এবং শেষ আমার মামাবাড়ি দর্শন।

"যশোর একটি পিরালী কেন্দ্র হওয়ায় বহুকাল থেকে ঠাকুর বাড়ির কনে সেখান থেকেই সংগ্রহ করা হত। এবং পুরাণো দাসীর পছন্দর উপরই নির্ভর করা হত—তারা এ পর্যন্ত কিছু মন্দ পছন্দেরও পরিচয় দেয় নি। তবে সুন্দরী মেয়ের চাহিদা যত সরবরাহ তদনুপাতে হয় না। সুতরাং দুঃখের বিষয় আমাদের সপরিবার অভিযানও আশানুরূপ সাফল্য লাভ করে নি। এই ঘটনা থেকেই বোঝা যায় যে তখনকার পারিবারিক প্রথা কি রকম অবিসম্বাদী ভাবে সকলে মেনে নিত। রবিকাকা তখনও বিশ্ববিশ্রুত কবি না হলেও, কবি, সুপুরুষ এবং ধনীর সন্তান তো ছিলেনই। কিন্তু গুরুজনে তাঁর জন্য যে কনে নির্বাচন করে দেবেন তাকে প্রসন্ন চিত্তে বিয়ে করা ছাড়া যে আর কোনো রকম ব্যবস্থা বা স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করা যেতে পারে, তার সম্ভাবনাও তাদের মনে আসত না। আর একটা কথা আমার জ্যাঠা খুড়োদের সম্বন্ধে না বলে পারি নে যে তাদের মধ্যে দু তিন জনের যে বয়সে স্ত্রীবিয়োগ হয় তাতে অনায়াসেই দ্বিতীয় দার পরিগ্রহ করতে পারতেন, মেয়েরও অভাব হত না দেশাচারেও অনুমোদন করত। কিন্তু সে কাজ তারা কেউই করেন নি। যদিও পরবর্তী বংশধরেরা অনেকেই করেছেন। আর একটা কথা এই মনে হয় যে তাদের তুলনায় স্ত্রীরা প্রায়শঃ বিদ্যাবুদ্ধি রূপে গুণে অনেক নিরেশ হলেও তাদের যোগ্য সম্মান সমাদর ও প্রীতিলাভে কখনও বঞ্চিত হন নি। এটা কম কথা নয়।...

"আমরা কলকাতায় দক্ষিণ অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন বাড়ীতে থাকা কালীন এবং যাওয়া কালীন পর্যন্ত রবিকাকা বিয়ের পরও সমভাবে সপরিবারে যাতায়াত করেছেন—তার প্রথম মেয়ে বেলা কি ধপধপে সুন্দরই না হয়েছিল। আমি তার জন্মাবধি দৈনিক জীবনী লিপিবদ্ধ করব বলে মনে করেছিলুম কিন্তু এক মাসের বেশী আর এগোয়নি। তাকে নিয়ে আমাদের পার্ক স্ট্রীটের এক বাড়িতে দিন কতক ছিলেন এবং সেখানে স্বর্ণ পিসিমার সখী সমিতির সাহায্যার্থে 'মায়ার খেলা' লেখা হয়েছিল আর এক বাড়িতে 'বিসর্জনের' প্রথম অভিনয়

হয়। ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিট্যুটের সাহায্যকল্পে এবং আর এক বাড়িতে 'মায়ার খেলা' এবং 'রাজা ও রাণী' অভিনয় হয় তখন একটি সুবিধে ছিল এত টাকা তুলবার হুজুক ওঠে নি এবং বোধ হয় সে বিষয়েও এরা অগ্রণী ছিলেন। কারণ আদি ব্রাহ্ম সমাজের সাহায্য কল্পে একবার টিকিট দিয়ে কোনো অভিনয় করবার কথা হওয়ায় মা আমাকে যোগ দিতে দেন নি জানি। তাঁর কতগুলি ঐ রকম আপত্তি ছিল এবং বি. এ. ডিগ্রী নেবার জন্য আমাকে কনভোকেশনে যেতে দিলেন না। বাবার ওখানে বম্বেতে বিলিতি নাচ দেখে রবিকাকার খারাপ লেগে ছিল জানি, বিলাত প্রবাসে তিনি কখনো বল নাচে যোগ দিয়াছিলেন কিনা বলতে পারি না।* অভিনয় কার্যের গোড়ার কথা ধরতে গেলে মানময়ী ছাড়া জোড়া-সাঁকোয় রবিকাকা ও জ্যোতিকাকামশায় সমবেত বন্ধুদের মনোরঞ্জনার্থে বিবাহের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে একটি ছোট গীতিনাটিকা 'বৈঠকখানা' বৈঠকখানায় অভিনয় করে-ছিলেন। তাতে কোনো ধনীর দুলাল অতিরিক্ত হাস্যরস এবং সম্ভবত উগ্রতর কোনো রসপানে মত্ত হয়ে ক্রোড়স্থিত ছোট ছেলে আমার দাদাকে মেজেতে ফেলে দিয়েছিলেন তা এখনও মনে আছে।

"কাকীমার প্রত্যেক ছেলে হবার সময় আমার মা জোড়াসাঁকোর বাড়ি গিয়ে থেকেছেন। পরে তাঁরা সকলে মাতৃহারা হলে ছোট দুটি ভাই-বোনকে নিয়ে গিয়ে বালিগঞ্জের বাড়িতে নিজের কাছে কতদিন রেখেছিলেন। রবিকাকা ওঁদের হোমিওপ্যাথি ভক্তির কথা সকলের কাছেই সুবিদিত। তবু শেষ পর্যন্ত একমাত্র ডাঃ ডি এন রায়ের চিকিৎসায় স্ত্রীকে ভরসা করে রেখেছিলেন বলে নাটোরের মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ আমাদের কাছে কত দুঃখ করেছেন। তিনি যখন রবিকাকার সঙ্গে শিলাইদহে বোটে গিয়ে থাকতেন, তখন কাকিমা তাঁকে নাকি কতরকম নতুন মিষ্টান্ন করে খাওয়াতেন। রাঁধতে খাওয়াতে খুব ভালোবাসতেন শুনেছি। কেউ কেউ বলে শান্তিনিকেতনের ছেলেদের জন্য রেঁধে রেঁধে আগুন-তাতে থেকেই তার অসুখটা হল।…তিনি নিজগুণে সকলের প্রিয় হয়েছিলেন।

"তিনি যাবার পর বিচিত্রার (জোড়াসাঁকোর বাইরের দিকের অপেক্ষাকৃত নূতন বাড়ি) তৈরী বাসা ভেঙ্গে গেল। ছোট বড় ঘর ভাগ করবার জন্য কবির খেয়ালে যে চলিষ্ণু কাঠের দেয়াল খাড়া করা হয়েছিল সেগুলি একেবারে সরে গিয়ে বিশ্বের জন্য কামরা ফাঁক করে দিল। গৃহনী গৃহমুচ্যতে। সেই গৃহহারা একেবারে পথবাসী না হলেও নূতন করে স্থায়ী ঘর বাঁধতে পারলেন না। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত একবার এ বাড়ি একবার ও বাড়ি করেই কাটিয়ে দিলেন। হেথা নহে হেথা নহে

* বল নাচে যোগ দেওয়ার কথা ইয়োরোপ প্রবাসীর পত্রে ও জীবনস্মৃতিতে উল্লেখ আছে।

অন্য কোনো খানে—কাউকে কাউকে বোধ হয় স্বভাব-অনাগরিক করেই ভগবান সংসারে পাঠান। তাঁর জীবনেও যেন বার বার আঘাত করে দেখিয়েছেন যে, সংসারপাতা এক বংশরক্ষা তাঁর জন্য নয়।”

রবীন্দ্রনাথ নিজের পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে এবং ব্যক্তিগত প্রসঙ্গে সর্বদাই নীরব থাকতেন যদিও সে সম্বন্ধে সাধারণ মানুষের কৌতূহল কম নয়। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্রবধূ হেমলতা ঠাকুর একটি প্রবন্ধ লিখে বোধ হয় প্রথম রবীন্দ্রনাথের পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে নানা জ্ঞাতব্য প্রকাশ করেছিলেন—তাঁর মৃত্যুর পূর্বে এই বোধ হয় তাঁর পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে প্রথম প্রকাশ্য আলোচনা। কবি এই প্রবন্ধটি পড়ে অসন্তুষ্ট হ'ন নি—খুশীই হয়েছিলেন। প্রবন্ধের কিছুটা এখানে তুলছি কারণ এসব তথ্য খুচরো পত্রিকার পত্রে অবলুপ্ত হয়ে যাবে।

সংসারী রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে হেমলতা দেবী

কবির সংসারচিত্রে যদি কেউ সুন্দর একটি সুবিন্যস্ত সাংসারিকতার রূপ দেখার আশা করেন তবে তাঁকে হয়ত নিরাশ হতে হবে···ঝাড়-লণ্ঠন ঝোলানো বৈঠকখানা বিলাতী আসবাবে সাজানো ড্রয়িংরুমে পত্নীর গা-ভরা গয়না, আলমারী-ভরা বাণারসী বোম্বাই রেশমী সাড়ী, বনিয়াদী ঘরের উপযোগী ঘরভরা রূপার বাসন, ব্যাঙ্কে জমান মোটা সংখ্যার টাকা, ঘরের দেয়াল কেটে বসানো লোহার সিন্দুকে তাড়াবাঁধা কোম্পানী কাগজের স্তূপ—এর কোনো কিছুই ছিল না কবির কোনো দিনও! তেতালায় নিজের শোবার ঘরের পাশে খোপের মত ছোট্ট একটি ঘর বানিয়ে তাতেই বসে কবি লিখতেন, পাশে সেই মাপেরই আর একটি ছোট খুবরী ঘরে ছিল বসবার ব্যবস্থা। এরা কবির নিজস্ব পরিচয় দিত লোকের কাছে।

“কৈশোরে কবি নিজের গায়ের আলোয়ান বেচে বই কিনেছেন ে না গেছে—সংসারী হয়ে নিজের সংসারটিকে নূতন আদর্শে গড়ে তুলতে চেষ্টা করেছেন দেখা গেছে। কবির কন্যারা তৎকালীন প্রচলিত ধারায় লোরেটো বেথুনে পড়ে নাই—পুত্র সেণ্টজেভিয়ার্সে ভর্তি হয় নাই · কবির সৃষ্ট ভবিষ্যৎ আদর্শ বিদ্যালয়ের গোড়াপত্তন এদের নিয়ে···।

“অসংসারী কবি-চিত্তে সংসারসাধনা ও কাব্যরচনা সহজে জোড় খায় না, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথও নিজের প্রেরণার তাগিদে গুছিয়ে সংসার করতে পারেন নি ···এখান থেকে ওখানে, ওখান থেকে সেখানে, বাসা-ভাঙ্গা কবি বাসা-ভেঙ্গেই আসছেন চিরদিন···আজও কবির বাসা বদলের বিরাম নাই, সকলেই জানে।···

···সাধারণ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের বাঁধা পথ ধরে নিজেকে ও নিজের পরিবারকে

চলতে দিতে চান নাই। কবি-পত্নী ছেলেদের দামী পোশাক পরাতে গেলে কবি বোঝাতেন বড় মানুষীর আওতায় থাকলে ছেলে মানুষ হয় না…"তোমার সন্তানরা খুব ভাল করে যাতে মানুষ হয় তারই চেষ্টা করছি।" শুনে কবি-পত্নী সুখী হতেন, গৌরব বোধ করতেন, কিন্তু মনে মনে লুকিয়ে থাকত ছেলেদের সুন্দর সুন্দর দামী পোশাক পরাবার সাধ, আশেপাশে মানুষদের কাছে প্রকাশ হয়ে পড়ত দু-এক কথায়…

"বিদ্যালয় স্থাপনের পরে ছাত্রদের মধ্যে থাকবেন বলে শান্তিনিকেতনের বর্তমান লাইব্রেরী বাড়ীর এক পাশে একটি ঘরে কবি বাস করেছেন, অনেক দিন খেয়েছেন ছাত্রদের খাওয়ার সারে বসে এক সঙ্গে একই খাদ্য।

"…বিলাস বর্জন, উপকরণ বর্জন, একমাত্র বুলি ছিল সে সময় কবির মুখে… সাজসজ্জা ও অলঙ্কার-বাহুল্যের প্রতি ধিক্কার দিতেন; বলতেন, অসভ্য দেশের মানুষরাই মুখ চিত্তির করে মুখে রং মাখে…

কবি-পত্নীর রান্নায় হাত ছিল চমৎকার।…কবির জন্য প্রায়ই তিনি ঘরে নানানতরো মিষ্টান্ন তৈরী করতেন নিজের হাতে…নূতন নূতন রান্না আবিষ্কারের কম শখ ছিল না কবিরও—বোধহয় পত্নীর রন্ধনকুশলতা এ সম্বন্ধে তাঁর শখ বাড়িয়ে দিত বেশী। রন্ধনরতা পত্নীর পাশে মোড়া নিয়ে বসে নূতন রান্নার ফরমাস করেছেন কবি, দেখা গেছে অনেকবার। শুধু ফরমাস করেই ক্ষান্ত হতেন না, নূতন প্রণালীতে পত্নীকে নূতন রান্না শিখিয়ে শখ মেটাতেন। শেষে তাঁকে রাগাবার জন্য গৌরব করে বলতেন, "দেখলে তোমাদের কাজ তোমাদেরই কেমন একটা শিখিয়ে দিলুম।" তিনি চটে গিয়েই বলতেন, "তোমাদের সঙ্গে পারবে কে? জিতেই আছ সব বিষয়ে।"

সংসারে এক উপদ্রব বাঁধাতেন কবি নিজের খাওয়ার ব্যাপার নিয়ে। থেকে থেকে খাওয়া এত কমিয়ে ফেলতেন যে, পাশের লোক চিন্তিত না হয়ে পারত না…করো চিন্তা বলো যা খুশী…কবি নিজের ইচ্ছেয় ভর করে চলেছেন…কবি যে শরীরের উপযোগী খাদ্য না খুঁজে মনের উপযোগী খাদ্য খুঁজে নিচ্ছেন একথা তখন বোঝা যেত না স্পষ্ট করে…স্বল্পাহারের বাড়াবাড়ি দেখে আমরা অনেক সময় কবি-পত্নীকে বলতাম, "বলুন না কাকিমা কাকামশায়কে বলকারক কিছু খেতে।" কবি-পত্নী বলতেন, "তোমরা চেননা, জেদ আরো বাড়বে, না খেয়ে না খেয়ে দুর্বল হয়ে সিঁড়ি উঠতে মাথা ঘুরে পড়ুন আগে তারপরে নিজেই শিখবেন—কারুর শেখানো কথা শোনবার ধাতের মানুষ নন।"

"পত্নীর মৃত্যুর পর কবি বহু বৎসর নিরামিষভোজী ছিলেন, এমন কি সময় সময় অন্ন ত্যাগ করে শুধু ছোলা ভেজান, মুগ ডাল ভেজান খেয়ে দিন কাটাতেন…

কার্যক্ষেত্রে পতিসরে যেতে হোতো, কবির শাশুড়ী···স্বহস্তে মাছের ব্যাঞ্জনাদি রান্না করে জামাতার পাতে দিলে কবি "না" বলতেন না। কন্যা নাই পাছে তিনি মনে কষ্ট পান ভেবে।···

"শান্তিনিকেতন কুঠীর দোতালায় একদিন বিকেলে চায়ের টেবিলে কবি চা খেতে বসেছেন, ঘরে ভালো মিষ্টি কাকামশায়ের জন্য তৈরী করা হোলো বলায় কবি হঠাৎ বলে ফেললেন, "ঘরের মিষ্টি আর আমার দরকার নেই।" বুঝলুম কাকীমার হাতের মিষ্টির কথা মনে পড়ে তাঁকে ব্যথা দিল। অন্তরের ব্যথা খুব চেপে রাখতেন কবি, কেমন করে সেদিন কথাটুকু মুখ কস্কে বেরিয়ে পড়েছিল।···

"কবি আদর্শের টানে নানা সময় নানা ভাবে নিজেকে বঞ্চিত ও ক্ষতিগ্রস্ত করে ফেলতে মনে কোনো দ্বিধা রাখতেন না।···কবির মুখে "ফেলো ফেলো ছাড়ো ছাড়ো," শুনে কবি-পত্নী বলতেন, ঘরকন্না ফেঁদে সন্তান-সন্ততি নিয়ে ঘর করতে গেলে এক কথায় ফকির সাজা চলে না।

"···পত্নীবিয়োগের পরে কবি পৈত্রিক সম্পত্তির অধিকারী হন—সম্পত্তি অধিকারের অল্প কয়েক বৎসর পরই সমস্ত সম্পত্তি দানপত্রে লেখাপড়া ক'রে ছেলেদের নামে দেবার জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে উঠেন—তার মধ্যে বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাও ছিল, দলিলাদি তৈরীর আদেশ পর্যন্ত চলে গিয়েছিল। জনৈক নিকটআত্মীয়, ছেলেরা এখন ছোট এখনই এরাজ করা সঙ্গত হবে না ইত্যাদি অনেক কারণ দেখিয়ে তখনকার মত কবিকে সে কাজ হতে নিরস্ত করেন। বিষয়ের বোঝা নামাবার সেই একান্ত আগ্রহ কবির আমাদের চোখে এখনও স্পষ্ট ভাসছে! নিজের সমস্ত বাংলা বইর কপি-রাইট বিক্রি করে শান্তিনিকেতন আশ্রমের একধারে একটি নারীবিভাগ গড়ে তোলার জন্য কবি সে সময়ে অত্যন্ত ব্যগ্র হয়ে ওঠেন, দেওয়ার বেগে কবি তখন অধীর।···শিক্ষাব্রতী কবি আদর্শ শিক্ষায়তন গঠনে যখন প্রবৃত্ত, কবির সমধর্মিণী তখন সহকর্মিনী হয়েছিলেন। ছাত্রদের জল খাবার তৈরীর ভার নিয়েছিলেন নিজ হাতে। স্নেহ দিয়ে গড়তে চেয়েছিলেন ছাত্রগুলিকে। বিদ্যালয় আরম্ভের একটি বৎসর শেষ না হতেই বিদ্যালয়ের জননী কবি-পত্নীর আয়ু শেষ হল···

মৃত্যুশয্যায় কবি নিজের হাতে তাঁর যে শুশ্রূষা করেছিলেন তার ছাপটি মুদ্রিত হয়ে আছে সকলের মনে আজও। প্রায় দু'মাস তিনি শয্যাশায়ী ছিলেন, ভাড়া করা নার্সদের হাতে পত্নীর শুশ্রূষার ভার তিনি একদিনের জন্যও দেননি। স্বামীর সেবা পাওয়া কত সৌভাগ্যের···পত্নীর প্রতি স্নেহ কবির প্রকাশ পেয়েছে তাঁর শেষ পর্যায় চূড়ান্ত হিসাবে—তখন ইলেকট্রিক ফ্যানের সৃষ্টি হয় নি। হাতপাখা হাতে

ধরে দিনের পর দিন রাতের পর রাত পত্নীকে কবি বাতাস দিতেন এক মুহূর্ত হাতের পাখা না ফেলে—ভাড়াটে শুশ্রূষাকারী তখন ঘরে ঘরে। কবির ঘরে তার ব্যত্যয় ঘটল প্রথম।…সন্তানস্নেহ কবির অপরিমেয়, প্রথম সন্তান কন্যাটিকে পিতা হয়েও তিনি মাতৃস্নেহে পালন করেছিলেন ধাত্রীরূপে। পত্নীর বয়স ছিল কম, কবি যেন ভরসা পেতেন না, প্রথম সন্তানের সম্যক যত্ন পাছে তিনি করতে না পারেন ভেবে…শিশুকে দুধ খাওয়ানো কাপড় পরানো, বিছানা বদলানো কবি সব করতেন নিজ হাতে—এ সবই আমাদের চোখে দেখা।…১৩০৯ সালের ৭ই অগ্রহায়ণ নভেম্বর ২৩শে, ১৯০২ রবিবার শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম স্থাপিত হবার ঠিক এগার মাস পরে মাত্র উনত্রিশ বৎসর বয়সে কবিপত্নী পরলোকগমন করেন।…কবির সংসার গেল ভেঙ্গে, সেই থেকে নিজের ভাঙ্গা সংসার টেনে নিয়ে চলে আসছেন কবি… কবির সেই ভাঙ্গা সংসার আজ বিশ্বভারতীর বিরাট পর্বে হতে চলেছে পরিসমাপ্ত।"

হেমলতা দেবীর এই প্রকাশিত প্রবন্ধ অনেকেই পড়েছেন এর পর তাঁর কাছ থেকে শোনা আমার ডায়রীতে রক্ষিত কয়েকটি কথা উদ্ধৃত করছি। অন্তরঙ্গ পারিবারিক কথা লিখতে স্বভাবতই সংকোচ হয়—হেমলতা দেবীও তাই অনেক কিছুই লেখেন নি যা লিখতে পারতেন। আমিও যা যা শুনেছি তার সবটাই লিখতে পারছি না একই কারণে। তবু গৃহজীবনে রবীন্দ্রনাথ কেমন ছিলেন তা জানতে আগ্রহী অনেকেই। সম্প্রতি রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে বড় বেশী আলোচনা হচ্ছে এবং তাঁরাই করছেন যাঁরা রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তি পরিচয় কিছুই জানেন না। নিজ নিজ মনের মাপে তাঁরা কাহিনী রচনা করেন সে জন্যই হেমলতা দেবীর কথা থেকে কিছু কিছু প্রকাশ করা বাঞ্ছনীয় মনে করি। যদিও এর মধ্যে আমার ব্যক্তিগত কথা থাকায় আমি সঙ্কুচিত তবু পারম্পর্য রক্ষার জন্য কিছুটা লিখতে হচ্ছে। হেমলতা দেবীর সঙ্গে আমার যখন এ সব কথা হচ্ছিল তখন তাঁর ছিয়াশী বছর বয়স। পুরীতে বিধবাশ্রম প্রতিষ্ঠা করে ছিলেন, সেখানেই থাকতেন। আমি মাঝে মাঝে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যেতাম। সম্ভবত সেটা ১৯৫৭ সাল—আমার খাতাতে লেখা আছে ৫ই অক্টোবর কিন্তু সালের উল্লেখ নেই। সে সময়ই অপূর্বকুমার চন্দ মহাশয় ও মুকুল দের ভ্রাতা সুহাস দে এসেছিলেন। 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ' বইটি সম্বন্ধে বড়মা খুব খুশী ছিলেন। সেই কথারই সূত্র ধরে তিনি বলতে লাগলেন "অপূর্ব এসেছিল সেও বল্লে একি কাণ্ড হয়েছে কবি যে বেঁচে উঠে কথা বলছেন। কিন্তু তোমায় এও বলি তুমি যে বই লিখেছ সেটাই বড় কথা নয়। তুমি যে তাঁকে আনন্দ দিয়েছ তার জন্যই আমি ঋণী তোমার কাছে।" এসম্বন্ধে আরো অনেক কথা সেদিন বলে-

ছিলেন কিন্তু তার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। শুধু এই সূত্র ধরে কবির কথা যা বলেছিলেন তাতে রবীন্দ্রনাথের পারিবারিক জীবনের যন্ত্রণা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। জানি এখনও এই বিষয় সমস্ত কথাই লেখা আমারও সম্ভব হবে না কিন্তু যেহেতু অনেক কথা অনেকে অনুমানে লিখছেন তখন আমি যা শুনেছি এবং অত্যন্ত বিশ্বাসযোগ্য লোকের কাছে যা শুনেছি তা লিখে রাখা দরকার। বড়মা বল্লেন, তোমার বইতে (মংপুতে রবীন্দ্রনাথ) তুমি লিখেছ কবি বিয়ে করতে যশোর যেতে রাজী হন নি তাই জোড়াসাঁকোয় বিয়ে হয়। এ কথাটা সম্পূর্ণ ঠিক নয়। বিয়ে করতে যাবেন কোথায় ? তার শ্বশুরের কি সঙ্গতি ছিল ? তিনি কি করতেন ? আমি বল্লাম "ওঁদেরই ষ্টেটে নায়েব ছিলেন !" "না তাও নয়, মাইনে পেতেন আট টাকা। কোথায় বিয়ে করতে যাবেন ? তাই মেয়ে তুলে আনা হয়েছিল। বিয়েতে কোনো ঘটাপটা নেই—শোনো নি কাকামশায় বলতেন 'আমার বিয়ে যা-তা করে হয়েছিল —তাই বলে বউ যা-তা হয়েছিল তা কখনো বলেন নি। আর বউ তো যা-তা নয় —তিনি তাঁর বাপের মত ছিলেন না তাঁর মা ছিলেন সতী সাধ্বী। কাকীমা মার মত হয়েছিলেন। শাশুড়ীকে তাই কাকামশায় খুব ভালোবাসতেন। আমার স্বামীর যখন প্রথম বিয়ে হয় (হেমলতা দেবী দ্বীপেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী) তখন খুব ঘটা হয়েছিল। খাস চাকর বকশিশ পেয়েছিল সোনার সীতাহার। তিনিই তো বাড়ির প্রথম নাতি। আর কাকামশায়ের বিয়েতে ঘটাপটা কি করে হবে ? তাঁর মা নেই তিনি কনিষ্ঠ পুত্র। বাবা কাশ্মীরে পাহাড়ে পাহাড়ে বেড়াচ্ছেন, কে ঘটা করে ? তাই ঐ রকম করে বিয়ে হয়।—"

এ কথায় আমি হেমলতা দেবীকে জিজ্ঞাসা করলাম—"এমন অসম বিবাহ কেন ঠিক হল ?" তিনি বল্লেন, "সে অনেক কথা, আসল কথা কাকীমার ভাগ্য। বার বছর বয়সে ঘোমটা ঢাকা হয়ে বিয়ের ক'নে যখন বসলেন, জানতেন না কার সঙ্গে তাঁর বিয়ে হল ! তার স্বামী কে ! পরে অবশ্য স্বামীকে খুব বশে রাখতেন। একদিন শোনো না, খুব পেট খারাপ হয়েছে বারবার যাচ্ছেন আমরা বলছি কাকীমা তুমি যাও দেখ। কাকীমা বলছেন না আমি গেলেই বাড়িয়ে তুলবেন আপনি ঠিক হবে। কাকা-মশায় শিখিয়ে পড়িয়ে মানুষ করে নিয়েছিলেন স্ত্রীকে তবু ভয় করতেন না কম তাঁকে। সেই কাকী ২৯ বছর বয়সে চলে গেলেন। শোক পেয়েছিলেন খুব কাকামশায়। আধখানা হয়ে গিয়েছিলেন। চুল ছোট ছোট করে কেটে ফেললেন, তখন মোহিত সেন গ্রন্থাবলীর এডিশন করছেন কাকা বল্লেন এই আমার শেষ কাজ এরপর আমিও যাব। শাশুড়ীকে ভালোবাসতেন, শ্বশুরের সঙ্গে কথা বলতেন না। এদিকে খাওয়া নিয়ে বাড়িতে এত নানা রকম করতেন কিন্তু শাশুড়ী দিলে সব খেতে নিতেন।

একবার শাশুড়ী থালা সাজিয়ে নিজে বসে খাওয়ালেন। মাছ মাংস খেতেন না তাও খেয়ে এলেন। (স্ত্রীর মৃত্যুর পর অনেক দিন নিরামিষাশী ছিলেন। তাঁর দীর্ঘ জীবনে মাঝেমাঝেই মাছমাংস ছেড়েছেন আবার ধরেছেন। একসময়ে পাঁচিশ বছর একটানা নিরামিষ খেয়েছিলেন এই রকম শুনেছি)।

উমাচরণের কথা তুমি লিখেছ—সেই ভৃত্য উমাচরণ বাড়ি এসে বল্লে 'বাবামশায় শাশুড়ী যা দিলেন অমনি মুখটি বুজে সব খেয়ে নিলেন।' আমরা পরে বল্লাম, "কাকামশায় আপনি নাকি শাশুড়ীর কাছে মুখটি বুজে সব খেয়ে এসেছেন?" "বলে নাকি উমাচরণ? ভারি আস্পর্দ্ধা তার, ওকি বোঝে তাঁর মেয়ে নেই, তিনি আমাকে খাইয়ে একটু শান্তি যদি পান আমি কি খাবনা বলতে পারি? যদি মনে করেন তাঁরা গরীব বলে পছন্দ হল না। তাই তিনি যা দেন সমস্ত খেয়ে নি! শাশুড়ী মারা যাবার খবর পেয়েও বেশ শোক পেয়েছিলেন। মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে করুণভাবে বলেছিলেন, 'মারা গেছেন চলে গেছেন'—সে সব আমাদের চোখের সামনে ভাসে।...

হেমলতা ঠাকুর বলে চলেছেন, "তুমি তো জান না মৈত্রেয়ী পারিবারিক শান্তি জীবনে তাঁর ছিল না। শুধু স্ত্রীর বা সন্তানদের মৃত্যু নয়—আরো অনেক লাঞ্ছনা হয়েছে তাঁর।

"বড় আদরের মেয়ে ছিল বেলা। সেই প্রথম সন্তান বেলা বল্লে,...অমুক আমার অপমান করেছে তাকে এখুনি বাড়ি থেকে দূর করে দাও, তাই কি তিনি পাবেন? (প্রতিমা দেবীর কাছে শুনেছি পরিবর্তে কাউকে কিছু না বলে তিনি নিজেই নীরবে শান্তিনিকেতনে চলে গিয়েছিলেন) তিনি তো বেলার কথা রাখতে পারলেন না। কাজেই তার স্বামীর সঙ্গে সে চলে গেল। শরৎ বল্লে কোনো সম্পর্ক রাখব না। রাখলেও না। অত আদরের মেয়ে বেলা তার মৃত্যুশয্যায় সব অপমান চেপে তিনি দেখা করতে যেতেন। শরৎ তখন টেবিলের উপর দু পা তুলে দিয়ে সিগারেট খেত। পা নামাত না পর্যন্ত—এমনি করে অপমান করত। উনি সব বুকের মধ্যে চেপে মেয়ের পাশে বসতেন, মেয়ে মুখ ফিরিয়ে থাকত। সে যে কি কষ্ট তাঁর। তারপর শমীর মৃত্যুর কথা বলি। ঐ ছেলে বড় প্রিয় ছিল। শমীর মৃত্যুর পর একদিন দেখি তার জামাকাপড় নিয়ে বসে আছেন। আমায় বল্লেন, ছোটবৌ শমীর জন্য মখমলের স্যুট করিয়েছিল আমি পরাতে দিই নি, ছেলে বাবুগিরি শিখবে। ছেলে আমার কোলে থাকতে ভালোবাসত আমি কোলে নিইনি আদুরে হয়ে যাবে। আমার কাছে শুতে ভালোবাসত আমি শুতে দিই নি আদুরে হয়ে যাবে। শক্ত করে স্বাধীন করে মানুষ করব!'

মনে আছে ছোট বেলায় আমরা শমীকে জিজ্ঞাসা করতুম, শমী কাকে সবচেয়ে ভালোবাসিস ? সে বলত, 'বলব ? কাউকে বলবে না তো ? বা আ আ আ বা আ আ আ"—আমরা বলতুম 'রাত্রে কার কাছে শুতে চাস ?' সে বলত, 'বলব ? কাউকে বলবে না ? বা আ আ আ বা আ আ আ'—তখন আমি বল্লুম তাহলে কাকামশায়কে বলি তুই আজ তাঁর কাছে শো—সে ছেলে ঝাঁপিয়ে পড়ল, "না না বলতে পারবে না কখ্খনো না।' সেই ছেলে অমন ভাবে মরে গেল—কাকা-মশায়ের সে শোক দেখা যায় না। কী কষ্ট! মুখ নীল হয়ে গিয়েছিল। শোক থামিয়ে রাখতেন কিন্তু ব্যথা লাগলে শরীর যেমন নীল হয় তেমনি মুখ নীল হয়ে গিয়েছিল। কথা বলতেন না। একদিন বলেছিলেন, 'শমীকে আমি মখমলের জামা পরতে দিই নি—সেই ছেলে ছেলের মত ছেলে ছিল। শমী যখন ছোট বলতেন, দেখো তোমরা শমী কবি হবে, ওর কপালে দুঃখ আছে দেখো না মেঘ দেখলে কেমন করে চায়! সেই ছেলে তো গেল—তারপর এ ছেলের কাণ্ড তো দেখলে! কিন্তু বাপু তোমাদের গুরুদেবের দোষও কম নয়। ছেলেকে তো চিনতেন খুব। কত সময় হাহাকার করে বলেছেন, 'নিজের ছেলেমেয়ে মানুষ করতে পারলুম না ব্রহ্মচর্যাশ্রম করে কি হবে ? লোকে আমার কাছে ছেলে দেবে কেন ? কি শিক্ষা দেব আমি ? নিজের ছেলেকে যে শিখাতে পারল না সে অন্যকে কি শেখাবে ?' আবার এত সহ্য করতেন কেন ? একি দুর্বলতা! তার হাতে সব তুলে দিয়ে বসে রইলেন। এত ক্ষমতা এত সম্পত্তি হাতে না পড়লে ওর এত বাড় হত না। তাও বলি ভেবেছিলেন দায়িত্ব ক্ষমতা হাতে পেলে কর্তব্য বুদ্ধি জাগবে মানুষ হবে। রথীর পঞ্চাশ বৎসর পূর্তির উৎসব হল ঘটা করে। প্রথম বললেন আমি যাবনা এর দরকার নেই। রাখতে পারলেন সে প্রতিজ্ঞা! তারপর রাত্রে এক প্রকাণ্ড কবিতা লিখে বসলেন ত্যাগী বলে টলে। প্রবাসীতে পাঠালেন কবিতা · মরা তো জানো রামানন্দবাবু তাঁকে কী ভালই বাসতেন, এক লাইন তাঁর যে কোনো লেখা মাথায় করে রাখতেন। রামানন্দবাবু সে কবিতা ছাপতে পারলেন না—বললেন কবিকে এত বড় ভুল আমি করতে দেব না। ওঁর ছেলে ত্যাগী নয়। সে ত্যাগ কাকে বলে জানে না…

"বড় কষ্ট ছিল তাঁর ওদের সঙ্গে থাকতে পারতেন না—আমরা তো সব জানি —সেজন্যই তোমাদের কাছে গিয়ে শান্তি পেতেন আনন্দ পেতেন তাই অমন আনন্দের উৎস ছাড়িয়ে দিয়েছিলেন। তোমার বই পড়ে শুধু নয় আমরা জানি উনি আগ্রহ ভরে অপেক্ষা করে থাকতেন তোমাদের কাছে যাবার জন্য নৈলে ওই দুর্গম পথ পার হয়ে যাওয়া সহজ নয়। ওঁর কষ্টের উপর প্রলেপ পড়েছিল। এর

ওঁর দরকার ছিল। বুদ্ধের যেমন সুজাতার পায়েসের দরকার ছিল তোমার ভক্তির তেমনি তাঁর দরকার ছিল, তুমি তাঁর শেষ ক'টি মাস সুধায় দিলে ভরে—তোমার অনেক পুণ্য হয়েছে…" আমি বল্লুম, "বড়মা আমি তো ইচ্ছে করে কিছু করি নি—যা করেছি তা তো আমার নিজেরই জন্য"—"তা হোক ইচ্ছে করে কি কিছু করা যায়? ইচ্ছে করে কি কেউ এ বই লিখতে পারে? তাঁর আনন্দটুকু ধরে রাখতে পারে?

"যদি বল ভালোবাসা, সে অনেকে তাঁকে বেসেছে! ভালোবাসার যোগ্য ছিলেন কেন বাসবে না কিন্তু তা কখনো তাঁকে বিব্রত করেছে কখনো কেউ স্বার্থ খুঁজেছে। কখনো গ্রহণ করতে তিনিও পারেন নি কিন্তু শেষ জীবনে তুমি যে তাঁর মাও হয়েছিলে। একদিন রামানন্দবাবুকে বলেছিলেন শাজাহানকে ছেলে বন্দী করেছিল …জেসমিন টাওয়ারে সেই জেলখানার নাম জেসমিন টাওয়ার—দেখছেন না এই উদীচীর সামনে জুঁই ফুলের লতা লাগিয়েছি এই আমার জেসমিন টাওয়ার। বুঝি সব, কত অন্যায় হচ্ছে কিন্তু উপায় নেই রামানন্দবাবু আমার উপায় নেই—যখন বড় কষ্ট পেয়েছেন তখন সেই জেসমিন টাওয়ার থেকে ছুটে যেতেন ডাক্তারের নিষেধও না শুনে তোমাদের কাছে। জানতে তুমি যখন শান্তিনিকেতন থেকে শেষ নিয়ে আসে দু চোখে অবিরল জল পড়েছে, কেবল কেঁদেছেন জানো কি? আমি পুযুব কাছে শুনেছি। কেন বলত?'

"জানি বড়মা, অপারেশনে তাঁর মত ছিল না"—

"আর বোলো না…তুমি কেন মৃত্যুর সময়ে পায়ের কাছে এসে বসলে না। কানে ব্রহ্মণাম করলে না?"

"আমার অদৃষ্টে ছিল না বড়মা।"

"তা হোক, তোমার অদৃষ্ট খুবই ভালো। দিনে দিনে বুঝবে এখন হয়ত বুঝছ না। তুমি যে সেই মহাপুরুষের শেষ ক'টা দিন তাঁর কষ্টের উপর শান্তির প্রলেপ দিতে পেরেছিলে এই তোমার এক জীবনের যথেষ্ট কাজ—তোমার কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা।"

কবি-পত্নী মৃণালিনী দেবীর স্বল্পায়ু জীবনের সামান্য খবর ইতস্তত ছড়ানো আছে। সম্প্রতি লিখিত রথীন্দ্রনাথের 'মাতৃস্মৃতির' মধ্যে সেই সৌভাগ্যবতী নারীর একটি কল্যাণী মূর্তি স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

…"শান্তিনিকেতনে নিজেদের বাসের জন্য পৃথক বাড়ি তখন ছিল না, আমরা থাকতুম আশ্রমের অতিথিশালার দোতালায়। রান্নাবাড়ি ছিল দূরে। মা রান্না করতে ভালোবাসতেন। তাই দোতালার বারান্দার এক কোণে তিনি উনুন পেতে

নিয়েছিলেন। ছুটির দিন নিজের হাতে বেঁধে আমাদের খাওয়াতেন। আমরা জানতুম জালের আলমারীতে যথেষ্ট লোভনীয় জিনিস সর্বদাই মজুত থাকত। সেই অক্ষয় ভাণ্ডারে সময়ে অসময়ে সহপাঠীদের নিয়ে এসে দৌরাত্ম্য করতে ত্রুটি করতুম না। বাবার ফরমাস মত নানারকমের নূতন ধরনের মিষ্টি মাকে প্রায়ই তৈরী করতে হত। সাধারণ গজার একটি নূতন সংস্করণ একবার তৈরী হল, তার নাম দেওয়া হল "পরিবন্ধ"। এটা খেতে ভালো, দেখতেও ভালো। তখনকার দিনে অনেক বাড়িতেই এটার বেশ চলন হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু একদিন বাবা যখন মাকে মানকচুর জিলিপি করতে বললেন, মা হেসে খুব আপত্তি করলেন, কিন্তু তৈরী করে দেখেন এটাও উৎরে গেল। সাধারণ জিলিপির চেয়ে খেতে আরো ভালো হল। (রথীন্দ্রনাথ লিখেছেন মানকচুর জিলিপি যতদূর মনে হয় এটা হত মানকচুর মুড়কি।) বাবার এইরকম নিত্য নূতন করমাস চলত। মাও উৎসাহের সঙ্গে সেইমত করতে চেষ্টা করতেন।

"কলকাতায় মা আত্মীয়-স্বজনের স্নেহবন্ধনেব একটি বৃহৎ পরিবেশের মধ্যে ছিলেন! তাঁকে সকলেই ভালোবাসত। জোড়াসাঁকোর বাড়ির তিনিই প্রকৃতপক্ষে কর্ত্রী ছিলে . সেইজন্য কলকাতা ছেড়ে শান্তিনিকেতনে এসে থাকা তাঁর পক্ষে আনন্দকর হয় নি। অস্থায়ী ভাবে অতিথিশালার কয়েকটা ঘরে বাস করতে হল। সেখানে গুছিয়ে সংসার পাতার কোনো উপায় ছিল না, কিন্তু তাঁর নিজের পক্ষে সেটা যতই কষ্টকর হোক, তিনি সব অসুবিধা হাসিমুখে মেনে নিয়ে ইস্কুলের কাজে বাবাকে প্রফুল্লচিত্তে সহযোগিতা করতে লাগলেন। তাঁর জন্য তাঁকে কম ত্যাগ স্বীকার করতে হয় নি। যখনই বিশেষ প্রয়োজন হয়েছে নিজের অলঙ্কার একে একে বিক্রি করে বাবাকে টাকা দিয়েছেন। শেষপর্যন্ত হাতে সামান্য কয়েক গাছা চুড়ি ও গলায় একটি চেন ছাড়া তাঁর কোনো গয়না অবশিষ্ট ছিল না, যা পেয়েছিলেন প্রচুর। বিবাহের যৌতুক ছাড়াও শাশুড়ীর পুরাণো আমলের ভারি গয়না ছিল অনেক। শান্তিনিকেতনে বিদ্যালয়ের খোরাক জোটাতে সব অন্তর্ধান হল। বাবার নিজের যা কিছু মূল্যবান সম্পত্তি ছিল তা আগেই বেচে দিয়েছিলেন। যে বিদ্যালয় তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সেটা তাঁর সাময়িক শখের জিনিস ছিল না। বহুদিন ধরে যে শিক্ষার আদর্শ তাঁর মনের মধ্যে কল্পনার আকারে ছিল তাকেই রূপ দিতে চেয়েছিলেন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে। তিনি কেবল আদর্শবাদী ছিলেন না। আদর্শকে রূপায়িত না করতে পারলে তাঁর তৃপ্তি ছিল না। তার জন্য ত্যাগ স্বীকার করা যতই তা কঠিন হোক না কেন তিনি তা যথেষ্ট মনে করতেন না। সেই ত্যাগস্বীকারে মা তাঁর অংশ স্বচ্ছন্দে গ্রহণ করেছিলেন। আমাদের আত্মীয়েরা

মাকে এইজন্য ভর্ৎসনা করতেন। বাবাকে তো তাঁরা কাণ্ডজ্ঞানহীন অবিবেচক মনে করতেন। বহুকাল পর্যন্ত বাবাকে ও মা যতদিন বেঁচেছিলেন তাঁকে বাড়ির লোকদের কাছ থেকে বিদ্রূপ ও বিরুদ্ধতা সহ্য করতে হয়েছিল। শান্তিনিকেতনে কয়েকমাস থাকার পর থেকে মায়ের শরীর খারাপ হতে লাগল। যখন নিতান্ত অসুস্থ হয়ে পড়লেন তখন তাঁকে কলকাতায় চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাবার ব্যবস্থা হল।······কলকাতায় এসে মা খুবই অসুস্থ হয়ে পড়লেন। এ্যালোপ্যাথ ডাক্তারেবা কি অসুখ কিছু বুঝতে না পারায় বাবা হোমিওপ্যাথী চিকিৎসা করাতে লাগলেন—তখনকার দিনের প্রসিদ্ধ ডাক্তার প্রতাপ মজুমদার, ডি, এন্, রায় প্রমুখ সর্বদাই বাড়িতে আসতে থাকলেন। তাঁরা সকলেই বাবাকে সমীহ করতেন, এমন কি হোমিওপ্যাথী চিকি সা-বিদ্যায় তাঁদের সমকক্ষ মনে করতেন। মায়েব চিকিৎসা সম্বন্ধে বাবার সঙ্গে পরামর্শ কবেই তার ব্যবস্থা দিতেন। এঁদের চিকিৎসা ও বাবার অক্লান্ত সেবা সত্ত্বেও মা ভালো হলেন না। আমার এখন সন্দেহ হয় তাঁর এপেণ্ডিসাইটিস হয়েছিল, তখন এ বিষয়ে বিশেষ কিছু জানা ছিল না। অপারেশনের প্রণালীও আবিষ্কৃত হয়নি ; মৃত্যুব আগের দিন বাবা আমাকে মায়ের ঘরে নিয়ে গিয়ে শয্যাপার্শ্বে তাঁর কাছে বসতে বললেন। তখন তাঁর বাক্‌রোধ হয়েছে। আমাকে দেখে চোখ দিয়ে কেবল নীরবে অশ্রুধারা বইতে লাগল—মার সঙ্গে আমার সেই শেষ দেখা।—"

ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দের রচনার মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথের দাম্পত্যজীবনের যে ছবিটি প্রকাশ পেয়েছে তাতে বোঝা যায় যে, অতি সাধারণ একটি বাঙালী বালিকাকে বিবাহ করে অসামান্য শক্তিধর প্রতিভাশালী কবি স্নেহে প্রেমে মাধুর্যে সার্থক বিবাহিত জীবনের স্বাদ সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন।

উপরোক্ত রচনাগুলি থেকে বোঝা যায় রবীন্দ্রনাথের গৃহিণীর প্রধান গুণ ছিল রন্ধনপটুতা এবং তারই সাহায্যে তিনি সংসারের মধ্যে একটি বিশেষ স্থান করে নিয়েছিলেন। কোন গভীর চিন্তাশীল দার্শনিক বা কবি-মন যে সেই সাধারণ একটি গুণেও তৃপ্ত ও সুখী হতে পারে এ কথা কিছুটা বিস্ময়কর বৈকি। রবীন্দ্রনাথের বিবাহিত জীবনের ছবি তাঁর জীবিতকালে অর্থাৎ বৃদ্ধবয়সের পূর্ব পর্যন্ত কেউ নজর করবার সুযোগ পায় নি—তাঁর নিজের গভীর নীরবতাই এর কারণ। শেষের দিকে কাছের মানুষদের সঙ্গে মাঝে মাঝে আলোচনা করেছেন—তাঁর মৃত্যুর পরে প্রকাশিত স্ত্রীর কাছে লেখা চিঠিগুলিও ঐ সমস্ত আলোচনা প্রসঙ্গ ছাপা হলে সেগুলি অবলম্বন করে ১৩৪৯ সালে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। এর মধ্যে রবীন্দ্রনাথের নিজের কথায় তাঁর দাম্পত্যজীবনের কথা কিছু আলোচনা করা হয়েছে :

"রবীন্দ্রনাথ তাঁর সহধর্মিনীর কথা কিছু বলতেন না বললেও চলে…'মংপুতে' শীর্ষক প্রবন্ধাবলীর যে অংশ বর্তমান সংখ্যায় বেরিয়েছে তাতে একজায়গায় কবি বলছেন: 'এখনকার ছেলেমেয়েদের মতো আমরা অত খুঁৎখুঁতে ছিলাম না আধুনিকভাবে আমাদের বিবাহ হয়নি তো কিছুই এসে যায়নি তাতে। একটা গভীর শ্রদ্ধার সম্পর্ক ছিল। তিনি তো চেয়েছিলেন আমার শান্তিনিকেতনের কাজে সঙ্গিনী হতে।…

"যখন তিনি চলে গেলেন তখন আমার একমুহূর্ত অবসর ছিল না। শান্তিনিকেতন স্বরু হয়েছে ঋণের পরে ঋণ বোঝার মত চেপে ধরেছে, তখন নিজের সুখ-দুঃখকে কেন্দ্র করে মনকে আবদ্ধ করবার সময়ই বা কোথায়? তবে সবচেয়ে কি কষ্ট হত জানো, যে এমন কেউ নেই যাকে সব বলা যায়—সংসারে কথার পুঞ্জ অনবরত জমে উঠতে থাকে ঠিক পরামর্শ নেবার জন্য নয়, শুধু বলার জন্যই এমন কাউকে পেতে ইচ্ছে করে যাকে সব বলা যায়, সে তো যাকে-তাকে হয় না।" (মংপুতে রবীন্দ্রনাথ)

"যাকে সব বলা যায় এমন মানুষের অভাব খুব বড় অভাব স্ত্রী স্বামীকে সব কথা বলতে পারেন, স্বামীও স্ত্রীকে সব কথা বলতে পারেন যদি দম্পতির উভয়ে পরস্পর প্রীতি ও শ্রদ্ধার পাত্র হন। এরূপ দম্পতি সংসারে খুব বিরল না হলেও বিরল। যে স্বামী স্ত্রীকে সব কথাই বলতে পারেন তিনি সৌভাগ্যবান। মৃণালিনী দেবী সম্বন্ধে আমরা অন্য কিছু জানি বা না জানি, তাঁকে রবীন্দ্রনাথের মতো মানুষ সব কথাই বলতে পারতেন এ থেকেই বুঝতে পারি বিধাতা তাকে কিরূপ মহত্ত্বের উপাদানে গড়েছিলেন। · (প্রবাসী—রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়)"

এ প্রসঙ্গে আমাদের মনে হয় এখানে 'সব' কথা অর্থে গার্হস্থ্যের সব কথাই কবির মনে ছিল অবশ্যই তাঁর আধ্যাত্মিক ও সাহিত্যিক জীবনের সব কথা নয়।

রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘজীবনের মধ্যে তার বিবাহিত জীবন মাত্র ১৯ বছর। তিনি এক যুগে জীবন আরম্ভ করে অন্য যুগে জীবন শেষ করেছেন, নানা ভাবে একথা সত্য। বিশেষত বাংলাদেশে একটি নুতন 'ভাবযুগ' তাঁরই সৃষ্টি। জীবনের প্রথম দিকে বাঙালীর মেয়ের যে রূপ ও প্রকৃতি তিনি দেখেছিলেন শেষের দিকে তার অনেকটাই পরিবর্তিত হয়েছিল সন্দেহ নেই। কিন্তু সমস্ত বহিরঙ্গ পরিবর্তনের মধ্যে তার অন্তর্নিহিত কোনও স্থির প্রভা কবির নিজের কাছে অন্তত সত্য ছিল—যে কারণে শেষের দিকে একটি হালকা মেজাজের কবিতায় সেকাল ও একালের মেয়েদের তুলনা করে তিনি একটি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দিয়ে গিয়েছেন:

"কখনো দিয়েছে দেখা হেন প্রভাশালিনী
যারা একালিনী নয় যারা চিরকালিনী
একথাটা বলে যাব মোর কনফেশানেই
তাদের মিলনে কোনো ক্ষণিকের নেশা নেই।...
...আমাদের কত ত্রুটি আসনে ও শয়নে—
ক্ষমা ছিল চিরদিন তাহাদের নয়নে—
নানারূপে ভোগ সুধা যা করেছে বরষণ
তারে শুচি করেছিল সুকুমার পরশন...
দামী যাহা মিলিয়াছে জীবনের এপারে
মরণের তীরে তারে নিয়ে যেতে কে পারে—
তবু মনে আশা রাখি মৃত্যুর রাতেও
তাঁহাদেরি প্রেম যেন নিতে পারি পাথেয়।"

তখনকার অন্তঃপুরচারিণী মেয়েদের জীবনসীমার মধ্যে কবির দৃষ্টি যে বেদনা ও আনন্দের আলোছায়ার লীলা দেখেছেন তা তাঁর কাব্যের প্রেরণা যুগিয়েছে। কবি বলতেন, 'অসামান্য কিছুর জন্য অপেক্ষা করে থাকা দুর্বলতা।' সহজে যা পাওয়া যায় তারই মধ্যে তাঁর আপন সৃজনীশক্তি অসামান্য সৃষ্টির উপাদান খুঁজে নিয়েছে। এ বিষয়ে তাঁর পিতা ও পিতামহের সঙ্গে কিছু পার্থক্য রয়েছে তাঁর। দ্বারকানাথের পত্নী বৈঠকখানা বাড়িতে রাত্রে স্বামী সম্ভাষণে আসতেন শুনেছি—ফিরে গিয়ে স্নান করতেন। তাঁকে দ্বারকানাথ তাঁর প্রগতির অংশ দিতে পারেন নি। রবীন্দ্রনাথের জননী স্বামীর আশায় পথ চেয়ে বসে থাকতেন। দেবেন্দ্রনাথ বেশির ভাগ সময় হিমালয়ে ও নানা স্থানে নিজের ধর্মবেদনা নিয়ে ঘুরে বেড়াতেন। শোনা যায় ঘরে তাঁর উৎকণ্ঠিত পত্নী—তিনি একবার এসে ফিরে যাওয়া ও আবার আসার মধ্যের সময় সবটাই জ্যোতিষীদের দিয়ে গণনা করাতে ব্যস্ত থাকতেন যে কখন স্বামী ঘরে ফিরে আসবেন তাঁর বিরহীমন সর্বদা স্বামীর চিন্তায় এত মগ্ন থাকত যে, তিনি ছেলেদের দিকে মন দিতে পারতেন না।

স্ত্রীর মৃত্যুপ্রসঙ্গে আত্মজীবনীতে মহর্ষির যে উল্লেখটুকু আছে তার মধ্যে একটি সস্নেহ স্বীকৃতি প্রকাশ পেলেও একথা সত্য যে, সহধর্মিণী তাঁর মনোজগৎ থেকে বহু দূরে ছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের অসীম মানবমূল্যবোধ তাঁর দাম্পত্যজীবনে একটি অভিনব রূপ নিয়েছে—চিঠিপত্রে লিখছেন: "তোমাকে কোনো বিষয়ে আমি ছাড়িয়ে যেতে ইচ্ছে করিনে কিন্তু জোর করে তোমাকে পীড়ন করতে আমার শঙ্কা হয়, সকলের

স্বতন্ত্র রুচি, অনুরাগ এবং অধিকারের বিষয় আছে, আমার ইচ্ছা ও অনুরাগের সঙ্গে তোমার সমস্ত প্রকৃতিকে সম্পূর্ণ মেলাবার ক্ষমতা তোমার নেই সুতরাং সে বিষয়ে কিছুমাত্র খুঁৎ খুঁৎ না করে ভালোবাসার দ্বারা যত্নের দ্বারা আমার জীবনকে মধুর করে আমাকে অনাবশ্যক দুঃখ-কষ্ট থেকে রক্ষা করতে চেষ্টা করলে সে চেষ্টা আমার পক্ষে মহামূল্য হবে।"

যে যেমনটি তাকে তেমনি রেখে, কারুর কাছে কিছু দাবি না করে তিনি আত্মিক সম্বন্ধ-স্থাপন করতে ও সুখী হতে পারতেন—এটা যে একটা আশ্চর্য ক্ষমতা, আমরা যদি জগতের কবি, শিল্পী প্রভৃতির জীবন আলোচনা করি তা হলে বুঝতে পারি। প্রতিভাদীপ্ত কবি-শিল্পী-সুরকার এঁরা প্রায় অনেকেই আত্মীয়-পরিজনকে, সংসারকে শান্তি, স্নেহ ও কর্তব্যের পূর্ণ আনুগত্য দিতে পারেন না। তাঁরা আজ ভালোবাসেন কাল ভালোবাসার পাত্রকে ছাড়িয়ে যান বহু দূর···"অলৌকিক আনন্দের ভার বিধাতা যাহারে দেয় তার বক্ষে বেদনা অপার।" সেই আনন্দের অসহ বেদনায় ব্যাকুল হয়ে, তাঁরা উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ওঠেন, কিন্তু সেই বেদনার দুঃসহতার সংবাদ তাঁদের সঙ্গীরা জানেন না, জানেন না তাঁদের মাতা পিতা ভাই বন্ধু স্বামী স্ত্রী—তাই কেউ তাঁদের সঙ্গে তাল রাখতে পারে না, তখন তারা উড়িয়ে দেন, পুড়িয়ে দেন, সংসার ছারখার করে দেন এবং সেই মত্ততার দাবানলে তাঁরা নিজের শক্তির উচ্ছলতাকেই অনুভব করেন।···এই ভাব রবীন্দ্রনাথের জীবনেও কি আসে নি কখনো? তখন তিনি তীব্রভাবে অনুভব করেছেন 'থাকিতে নারি ক্ষুদ্র কোণে আম্রবন ছায়ে সুপ্ত হয়ে লুপ্ত হয়ে গুপ্ত গৃহ বাসে।' তখন তাঁর সে বেদনার সঙ্গী কি কেউ ছিল? কিন্তু রবীন্দ্রনাথের গভীর মানবপ্রেম আত্মকেন্দ্রিক নয়, আত্মীয়-পরিজনের কাছে তাঁর দাবিও সামান্য। শিক্ষা-সংস্কৃতি-রূপগুণের পার্থক্য কিছুই তাঁর মনকে মানুষের থেকে দূরে নিয়ে যায় না। রবীন্দ্রনাথের স্ত্রী রাঁধতে পারেন বা খাওয়াতে ভালোবাসেন সেটাই পর্যাপ্ত হবার কথা নয়—কিন্তু কারু কোনো সামান্য গুণকে তিনি নিজের মনের মাধুর্যে পূরণ করে তাকে নতুন রূপে সৃষ্টি করে নিতে পারতেন—সে যা তার চেয়ে সুন্দর হয়ে পূর্ণ হয়ে উঠত তাঁর কাছে—শুধু দাম্পত্য সম্পর্ক নয়—সাধারণতঃ মানুষের সম্পর্কেই তাঁর সূক্ষ্ম সুন্দর মূল্যবোধ চার-পাশের মানুষকে তার নিজের সত্যে প্রতিষ্ঠিত দেখেই সুখী হত।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন: "মৃণালিনী দেবীর চরিত্রের মধ্যে এমন একটি কর্ত্রীশক্তি ছিল যে, রবীন্দ্রনাথ কখনো তাঁহাকে অবহেলা করিতে সাহসী হইতেন না। আবার এমন একটা নিস্পৃহ আবেগহীনতা ছিল যাহা কবিকে পীড়িত করিত।···কলিকাতার সমাজ ও সংসার হইতে দূরে নির্জনে

শিলাইদহ-বাসকে মৃণালিনী দেবী সম্পূর্ণ অন্তর দিয়া গ্রহণ করিতে পারেন নাই। এবং কলিকাতায় কবিও তাঁহার সমস্ত কবিত্বশক্তিকে কবরিত করিয়া থাকিতে অনিচ্ছুক। অবশেষে কবিকে শিলাইদহের বাস উঠাইতে হইল।" চিঠিপত্রের চিঠিগুলির মধ্যেও এই ঔদাসীন্যর পরিচয় আছে।

নানা আত্মীয়পরিজনের কাছে লিখিত মৃণালিনী দেবীর কয়েকখানি মাত্র চিঠিপত্র প্রকাশিত হয়েছে। এই চিঠিগুলিতে উপরোক্ত মন্তব্যর সমর্থন পাওয়া যায়—অর্থাৎ সামান্য ঘরোয়া চিঠির মধ্যে কর্ত্রীশক্তির প্রকাশ যথেষ্ট স্পষ্ট। এগার বছর বয়সে নিতান্ত অসম অবস্থা থেকে জ্ঞানীগুণী ও ধনী সংসারে যিনি বধূ হয়ে এসে মাত্র ১৯ বছরের মধ্যে জীবন শেষ করেছেন তাঁর পক্ষে অতখানি আত্মপ্রতিষ্ঠ হওয়া আশ্চর্যের কথা। স্বামীর সমবয়সী ভাগিনেয়কে 'সত্য' সম্বোধনে চিঠি তখনকার দিনে যথেষ্ট জোরের পরিচয়—কোনো চিঠির কোথাও 'ওঁকে জিজ্ঞাসা করব' বা 'উনি যা বলেন' জাতীয় বাঙালীর মেয়ের উপযোগী ভাব নেই—সমস্ত সংসার পরিচালনা তিনিই করেছেন—। হীনমন্যতাবোধের সম্পূর্ণ অভাব ও একান্ত আত্মপ্রতিষ্ঠ কর্ত্রীসুলভ মনোভাব লক্ষ্য করলে অনুমান করা যায় যে, তাঁর রূপে গুণে অতুলনীয় প্রতিভাউজ্জ্বল স্বামী কোনো দিন তাঁকে অনুভব করতে দেন নাই যে, তিনি কোনো দিকে ন্যূন বা তাঁর পিতা এঁদের সেরেস্তার সামান্য চাকুরে মাত্র। বর্তমানে প্রকাশিত বেলাদেবীর চিঠিপত্রে বোঝা যায় রবীন্দ্রনাথের পরিহাসপটুতাও মৃণালিনীর আয়ত্ব হয়েছি·। তিনিও স্বামীর মতই মজা করতে শিখেছিলেন।

ঠাকুরপরিবারের ভাবেও তিনি কতটা শিক্ষিত হয়েছিলেন, জড়তাশূন্য মুক্তমনা হয়েছিলেন, তার প্রমাণ 'রাজা ও রাণী' অভিনয়ে একবার তিনি নারায়ণীর পার্ট করেছিলেন—দেবদত্ত সেজেছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ—একে তো বাঙালীর বাড়ির বৌর অভিনয় করা, তারপর ভাসুরের সঙ্গে পার্ট করা—সে যুগে এই ধরনের অভাবনীয় কীর্তি ঠাকুরবাড়ির অদ্ভুতকর্মা পুরুষরা তো অনেকেই করেছেন এবং মেয়েরাও যে করতে পেরেছেন সেও তাদেরই কৃতিত্ব।

কবি রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রবল জীবনোচ্ছ্বাসকে নানা মানব সম্বন্ধ ও কর্মের সীমারেখার মধ্যদিয়ে সংহত করে প্রবাহিত করেছেন সেই কাজ এই জীবন-শিল্পীর একটি শ্রেষ্ঠ রচনা যে তিনি মহত্তম কবি হয়েও বিশ্বের মানুষ হয়েও আদর্শ পুত্র আদর্শ স্বামী আদর্শ পিতা হয়েছিলেন, তাঁর বন্ধুত্বের তুলনা ছিল না। 'স্মরণের' কবিতাগুলির মধ্যে সহসা থেমে যাওয়া দাম্পত্যজীবনের অশ্রুজল ছল ছল করছে। আর 'শিশু'র কবিতাগুলিতে মাতৃহীন ছেলে-মেয়েদের কথা মনে পড়ায়।

সংসারী রবীন্দ্রনাথের রচনা বিচিত্র গতিতে বিচিত্রভাবে পূর্ণ হয়ে উঠেছে। মানসী সোনারতরী বহু গদ্য প্রবন্ধ ছিন্নপত্র লিখে চলেছেন যখন তাঁর গার্হস্থ্য জীবন চলমান।

কাব্য ও জীবন

এই সময়ের মধ্যে অর্থাৎ ১৮৮৩ সাল থেকে স্ত্রীর মৃত্যু ১৯০২ পর্যন্ত কবি লিখেছেন নানা বিষয়ে, গদ্যে পদ্যে নাটকে। ছবি ও গান, কড়ি ও কোমল, রাজর্ষি, মুকুট—শৈশব সঙ্গীত—মানসী, মায়ার খেলা, রাজা ও রাণী, বিসর্জন, ইয়োরোপযাত্রীর ডায়েরী, গল্পগুচ্ছের অধিকাংশ গল্প, কৌতুক নাট্য, গোড়ায় গলদ—সোনারতরী, শিক্ষার হেরফের, পঞ্চভূতের ডায়রী, বিদায় অভিশাপ, চিত্রা, ছেলেভুলান ছড়া, চৈতালী, মালিনী, গান্ধারীর আবেদন, সতী, নরকবাস, লক্ষ্মীর পরীক্ষা, কণিকা, কথা, কাহিনী, কল্পনা, ক্ষণিকা, চিরকুমার সভা, নৈবেদ্য, চোখের বালি, প্রভৃতি পদ্য গদ্য কাব্য লেখা হয়েছে।

এ ছাড়া তখন তিনি পর্যায়ক্রমে ভারতী, বালক ও বঙ্গদর্শনের সম্পাদনা করেছেন এবং দেশের রাজনৈতিক চিন্তার গতিকে নূতন রূপ দিচ্ছেন। তখনকার রাজনীতির অবাস্তব চিন্তাবিলাসের মধ্যে বাস্তব পরিকল্পনা সততার সঙ্গে গ্রহণ করার জন্য পথ দেখাচ্ছেন। রবীন্দ্রনাথ কোনো দিনই দেশের আর্থিক ও রাজনৈতিক সমস্যা সম্বন্ধে উদাসীন, গজদন্ত মিনারবাসী কবি ছিলেন না, যদিও তাঁর সম্পর্কে এই অভিযোগ বিরোধী মহলে ব্যাপ্ত। তাঁর কবিতা যখন পূর্ণ বিকশিত হয় নি তখন থেকেই তাঁর গদ্য প্রবন্ধগুলি জাগ্রত প্রহরীর মত দেশের প্রত্যেক সমস্যায় পথ নির্দেশ করে চলেছে।

১৮৮৪ সালে মাত্র তেইশ বছর বয়সে লেখা 'হাতে কলমে' ন. . প্রবন্ধে তিনি তৎকালীন রাজনৈতিক আন্দোলনের দুর্বলতা লক্ষ্য করে লিখেছেন :

"তবে agitate করিতে যাইব কি ইংরাজের কাছে! আমরা পথে সঙ্কোচে ইংরাজকে পথ ছাড়িয়া দিই, অফিসে ইংরাজ প্রভুর গালাগালি সহ্য করি, ইংরাজের গৃহে গিয়া জোড় হস্তে তাহাকে মা-বাপ বলিয়া তাহার নিকট উমেদারী করি, ও তাহার খানসামা রসুল বক্সকে সেলাম খাঁ সাহেব বলিয়া, চাচা বলিয়া খুশী করি, ইংরাজ আমাদিগকে সরকারী বাগানের বেঞ্চিতে বসিতে দেখিলে ঘাড় ধরিয়া উঠাইয়া দিতে চায়, ইংরাজ তাহাদের ক্লাবে আমাদের প্রবেশ করিতে দিতে চায় না, ইংরাজ রেলগাড়িতে তাহাদের বসিবার আসন স্বতন্ত্র করিয়া লইতে চায়, gentleman শব্দে ইংরাজ ইংরাজকে বোঝে ও বাবু অর্থে মসীজীবি ভীরু দাসকে বোঝে,

ইংরাজ আমাদের প্রাণ তাঁহাদের আহার্য পশুর প্রাণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করে না, ইংরাজ আমাদের গৃহে আসিয়া আমাদের অপমান করিয়া যায়, আমরা তাহার প্রতিবিধান করিতে পারি না, সেই ইংরাজের কাছে আমরা agitate করিতে যাইব যে, তোমরা আমাদিগকে সমকক্ষ আসন দাও!······

"আর ইংরাজের সমকক্ষ হইবার জন্য ইংরাজের কাছে হাত জোড় করতে যাওয়া এই-বা কেমনতর তামাসা! সমকক্ষ আমরা নিজের প্রভাবে হইব না? আমরা নিজের জাতির গৌরব নিজে বাড়াইব না? নিজের জাতির শিক্ষাবিস্তার করিব না? নিজের জাতির অপমানের প্রতিবিধান করিব না, অসম্মান দূর করিব না?"

"···ভিক্ষালব্ধ সম্মানের তাজ না হয় মাথায় পরিলাম, কিন্তু কৌপীন ত ঘুচিল না, এইরূপ বেশ দেখিয়া কি প্রভুরা হাসে না!···"

"···নিজের সম্মান যে নিজে রাখে না, পরের এমনই কি মাথা ব্যথা তাহাকে সম্মানিত করিতে আসিবে? আমরাই বা কেন স্বজাতিকে ঘৃণা করি, স্ব-ভাষায় কথা কই না, স্ব-বস্ত্র পরিতে চাই না, ইংরাজের রুমালটা কুড়াইয়া দিতে পারিলে গোলোক-প্রাপ্তি-সুখ অনুভব করিতে থাকি! আমরা আমাদের ভাষায়, আমাদের সাহিত্যের এমন উন্নতি করিতে চেষ্টা করি না কেন, যাহাতে আমাদের ভাষা আমাদের সাহিত্য পরম শ্রদ্ধেয় হইয়া উঠে! যে স্বদেশীয়েরা, আমাদের জাতিকে, আমাদের ব্যবহারকে, আমাদের ভাষাকে, আমাদের সাহিত্যকে নিতান্ত হেয় জ্ঞান করিয়া নিজের উন্নতি-গর্বে স্ফীত হইয়া উঠেন, তাঁহারাই হয়ত সভা করিয়া জাতীয় সম্মানের জন্য ইংরাজের কাছে নাম-সহি-করা দরখাস্ত পাঠাইতেছেন, নিজে যাহাদিগকে সম্মান করিতে পারেন না, প্রত্যাশা করিতে থাকেন ইংরাজরা তাঁহাদিগকে সম্মান করিবে!···"

ঐ তেইশ বছর বয়সেই বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে যে বিতর্ক হয় তা আজও তাৎপর্যভ্রষ্ট নয়।

'বালক' পত্রিকা সম্পাদনের ভার নিলে, (১৮৮৫) বালকে 'রাজর্ষি' উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়। 'রাজর্ষি' নাটকের মূল সুর সংস্কারের বন্ধনজড়িত সাম্প্রদায়িক ধর্মের উপরে মানবধর্মের প্রকাশ। এই ভাব রবীন্দ্র-কাব্যে শেষ পর্যন্ত স্থির আছে। রবীন্দ্র-কাব্য সাহিত্যের নানা পথে বিচিত্র ভাব-সন্নিবেশে নানা মূর্তি নিলেও তাঁর কতগুলি মূল বক্তব্য প্রথম থেকেই স্পষ্ট ও ধ্রুব।

সঞ্জীবনী নামে সাপ্তাহিকে সমাজ, ধর্ম ও দেশের নানা সমস্যা নিয়ে প্রবন্ধগুলি তখনকার শিক্ষিত সমাজে আলোড়ন তোলে—হিন্দুধর্ম ও সমাজ সম্বন্ধে এবং হিন্দু বিবাহ ও স্ত্রী-স্বাধীনতা সম্বন্ধে তাঁর যুক্তিবহ সংস্কারমুক্ত চিন্তা প্রবল তর্কের ঢেউ

তুলেছিল। শাস্ত্রবাক্যের বিরুদ্ধে যুক্তিকে দাঁড় করাতে বহু নিন্দা-বিতর্কের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। বস্তুতঃ এই সময় থেকেই রবীন্দ্রনাথের মন একদিকে যেমন কাব্যের অনিমিত্ত আনন্দ সম্ভোগের আয়োজনে ব্যাপৃত, অন্যদিকে সমাজের প্রাত্যহিক জীবনের বাস্তব সমস্যা নিয়ে কম ব্যাপৃত নয়—গদ্য ও পদ্যের দুই বিস্তৃত পক্ষে দেখি ভূমি ও স্বর্গের আনন্দ বিহার।

"'কড়ি ও কোমল' কাব্যগ্রন্থে (১৮৮৬) কবির জীবনদর্শনের একটি প্রধান বক্তব্য প্রথম কবিতা 'প্রাণ'-এর জীবনস্পৃহাতে অভিব্যক্ত।

মানসীর অব্যবহিত পূর্বস্তরে কড়ি ও কোমলে আমরা তাই দেখতে পাই যে, কবির চিত্ত ভোগময় সৌন্দর্যানুভূতিতে গাঢ়ভাবে আচ্ছন্ন হয়ে একটা মূঢ় অনুসন্ধানে ব্যাকুল হয়ে, পরে ধীরে ধীরে আপন অজ্ঞাতে একটি অমৃত উৎসের নিকটবর্তী হয়ে আসছে। ধর্মকে নিয়ে তিনি আরম্ভ করেন নাই, কোনো কাব্যের থিয়োরী বা মত নিয়ে তিনি আরম্ভ করেন নাই, তিনি আরম্ভ করেছেন এই পরিদৃশ্যমান পৃথিবীর প্রতি ঐকান্তিক গাঢ় অনুরাগ নিয়ে। প্রকৃতির প্রতি এই গাঢ় অনুরাগকেই একমাত্র সম্বল করে তিনি সংসারে সৌন্দর্যের সাধনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। একেবারে স্থূলকে ক্ষুদ্রকে নিয়ে তিনি আরম্ভ করেছেন। কড়ি ও কোমলের রন্ধ্রে রন্ধ্রে হংসপাদিকার যে, "অহিনঅমহুলোলুব" উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল তারই মধ্যদিয়ে জন্ম-জন্মান্তরের অস্পষ্ট প্রতিভাসা প্রমুষ্ট ছায়া মানসীমূর্তির রাগিনী শুনতে পেয়ে সমস্ত সুখ-স্মৃতির মধ্যে কবিসম্রাট পর্যুৎসুক হয়ে উঠলেন।" (কড়ি ও কোমল—সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত)।"

'মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে, মানুষের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।' রবীন্দ্রনাথের বাল্য ও যৌবনের পরিবেশে স্পষ্ট দুটি দিক ছিল—এক তাঁর পিতার সৃষ্ট আধ্যাত্মিক ঈশ্বরাভিমুখী চেতনা আর একটি দেশ সমাজ · মানব লোকের আহ্বান।

গীতাঞ্জলি পর্যন্ত এই দুইদিকের স্পন্দন খেলা সীমা অসীমের লীলা রূপে নানা অনির্বচনীয় সঙ্গীতে উল্লসিত হয়েছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত জীবন প্রান্তে এসে যে কবি ঘোষণা করলেন—'আমি মানুষের কবি' তারই প্রথম জাগ্রত ঈষৎ উন্মীলিত পরিচয় এই করিতায় রয়েছে।

'মানসী'র বেশীর ভাগ কবিতাগুলি লেখা হয়েছে গাজীপুরে (১৮৮৭)। গাজীপুরে পত্নীকে নিয়ে জোড়াসাঁকোর বাইরে প্রথম সংসার রচনা। গাজীপুরে প্রথম সংসার রচনার একটি ছবি নৌকাডুবিতে পাওয়া যায়। এ সম্বন্ধে মানসীর ভূমিকায় লিখছেন—"বাল্যকাল থেকে পশ্চিম ভারত আমার রোমান্টিক কল্পনায়

বিষয় ছিল (ক্ষুধিত পাষাণে তারই ছবি দেখা গেছে)···বহু শতাব্দী ধরে এইখানেই ইতিহাসের বিপুল পটভূমিকায় বহু সাম্রাজ্যের উত্থান-পতন এবং নব ঐশ্বর্যের বিকাশ ও বিলয় আপন বিচিত্র বর্ণের ছবির ধারা অঙ্কিত করে চলেছে। অনেক দিন ইচ্ছা করেছি এই পশ্চিম ভারতের কোনো এক জায়গায় আশ্রয় নিয়ে ভারতবর্ষের বিরাট বিক্ষুব্ধ অতীত যুগের স্পর্শলাভ করব মনের মধ্যে।"

বাঙলাদেশের প্রকৃতি, মানুষ ও সমাজ কবির মনকে নানা ভাবে স্পর্শ করেছে কিন্তু ভারতমূর্তিও ক্রমে ক্রমে আপন অধিকার বিস্তার করেছে, এ কথায় তার আভাস পাওয়া যায়।

নানা ছন্দে গাঁথা মানসীর কবিতাগুলির মধ্যে অবশ্য 'ভারতের বিক্ষুব্ধ' অতীতকে কোথাও পাওয়া যায় না, তা কবির অন্তরে 'জগতের তরঙ্গ আঘাত' উত্থিত বিচিত্র রসাস্বাদকেই প্রকাশ করেছে :

"বাহিরে পাঠায় বিশ্ব, কত গন্ধ গান দৃশ্য
সঙ্গীহারা সৌন্দর্যের বেশে
বিরহী সে ঘুরে ঘুরে, ব্যথাভরা কত সুরে
কাঁদে হৃদয়ের দ্বারে এসে—
সেই মোহমন্ত্র গানে, কবির গভীর প্রাণে
জেগে ওঠে বিরহী ভাবনা
ছাড়ি অন্তঃপুর বাসে সলজ্জ চরণে আসে
মূর্তিমতী মনের কামনা।"

প্রসিদ্ধ কবিতা 'মানস্ সুন্দরী' সোনারতরী কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত (১২৯৯)।

কবি এই কবিতাটির রচনা কালের বর্ণনা করেছেন স্মৃতিমন্থন করে শেষ বয়সে :

"মনে পড়ে যখন বোটে বসে লিখতুম, চারিদিকে জল ব'য়ে চলেছে মৃদু কলধ্বনিতে, দূরে দেখা যায় বালির চর ধূ ধূ করছে। আমি লিখেই চলেছি, লিখেই চলেছি মানসী (মানস সুন্দরী)। যখন শুরু করেছিলুম তখন ঝাঁ-ঝাঁ করে রোদ্দুর তারপর ধীরে ধীরে ম্লান হয়ে এল আলো, আকাশ রঙীন করে অস্ত গেল সূর্য। একটি মাত্র ভৃত্য বোটে থাকত আমার নীরব সঙ্গী সে কখন নীরবে মিট্‌মিটে প্রদীপ রেখে চলে গেল। আমি লিখেই চলেছি—মানসী, আজ কোনো কাজ নয় সব ফেলে দিয়ে ছন্দবন্ধ গ্রন্থ গীত এসো তুমি প্রিয়ে।" (মংপুতে রবীন্দ্রনাথ)

সোনারতরীর কবিতাগুলি রচনা করা হয়েছে বাংলার গ্রামের নদী পথে। এ সম্বন্ধে কবি লিখেছেন :—

"পরপারে ছিল ছায়াঘন পল্লীর শ্যামশ্রী, এপারে ছিল বালুচরের পাণ্ডুবর্ণ

জনহীনতা—মাঝখানে পদ্মায় চলমান স্রোতের পটে বুলিয়ে চলেছে দ্যুলোকের শিল্পী প্রহরে প্রহরে নানা বর্ণের আলোছায়ার তুলি। অহরহ সুখ-দুঃখের বাণী নিয়ে মানুষের জীবনধারার বিচিত্র কলবর এসে পৌঁছচ্ছিল আমার হৃদয়ে। মানুষের পরিচয় খুব কাছে এসে আমার মনকে জাগিয়ে রেখেছিল। তাদের জন্য চিন্তা করেছি কর্তব্যের নানা সংকল্প বেঁধে তুলেছি⋯ সাহিত্যের পথ এবং কর্মের পথ প্রসারিত হতে আরম্ভ হল আমার জীবনে। আমার বুদ্ধি, আমার কল্পনা এবং ইচ্ছাকে উন্মুখ করে তুলেছিল এই সময়কার প্রবর্তনা।"—বিশ্বপ্রকৃতি ও মানব লোকের মধ্যে নিত্য সচল অভিজ্ঞতার প্রবর্তনা।

"তখনই সংশয় প্রকাশ করেছি এ তরী নিঃশেষে আমার ফসল তুলে নেবে কিন্তু আমাকে নেবে কি?"

ইন্দিরাদেবীর কাছে লেখা পত্রাবলীতে সেই অভিজ্ঞতা গদ্যে, আরো স্ফুট, আরো বাস্তব হয়ে আছে। 'ছিন্নপত্র' নামে প্রকাশিত সেই পত্রগুচ্ছ এই সময়কার রবীন্দ্র-মানসের আলোক সম্পাতে উজ্জ্বল কবির ভবিষ্যৎ কর্মময় জীবনের সূচীপত্র।

এ ছাড়া ভারতী, সাধনা ও বালকের পুরানো সংখ্যাগুলি যদি কেউ খুঁজে দেখেন তাহলে লক্ষ্য হবে যে অতি অল্প বয়স থেকেই দেশ-বিদেশে যে সব নূতন চিন্তা প্রকাশ পাচ্ছে তাঁর কবি মনকে তা স্পর্শে না করে পারে নি। রুশ দেশে জার-এর অধীনে ইহুদীদের দুরবস্থা সম্বন্ধে একটি গল্পের অনুবাদে সে দেশের পরিস্থিতি সম্বন্ধে তাঁর মনোযোগের নিদর্শন আছে। 'স্ত্রী মজুর', 'কর্মের উমেদার' প্রভৃতি প্রবন্ধেও কলকারখানা ও শ্রমিক সমস্যার উদ্ভবের গোড়াতেই শ্রমিক জীবনের নূতন সৃষ্ট সমস্যা সম্বন্ধে কবির চিন্তা সচেতন হয়েছে।

এই সময়ে স্বাদেশিকতার উদ্বোধন নানা লোকের মধ্যে নানা ভাবে দেখা যাচ্ছিল—ঠাকুরবাড়ির শক্তিধর পুরুষরা যখন ভারতের অতীত থেকে যা কিছু সুন্দর, যে চিন্তা যুক্তিপূর্ণ, যে আচার সদাচার তা গ্রহণ করে ও রক্ষা করে তার সঙ্গে নূতনের সম্মেলন ঘটাচ্ছিলেন তখন দেশের মধ্যে কেউ কেউ সম্পূর্ণ পিছন দিকে মুখ ফেরানই স্বাদেশিকতার লক্ষণ বলে মনে করছিলেন। এঁদের মধ্যে 'হিন্দুত্বে'র গর্ব মাত্রা ছাড়িয়ে যেত—এঁরা গোবর লেপার বৈজ্ঞানিক যুক্তি খুঁজতেন, বাল্য বিবাহের সমর্থন করতেন ইত্যাদি।

যাহা হউক, আমি যতদূর আলোচনা করিয়াছি তাহাতে দেখিতেছি আমাদের বিবাহ সামাজিক বলিয়াই সমাজের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হইয়াছে। এমন কি, এখন মনুর নিয়মও সমস্ত রক্ষিত হয় না। অতএব বর্তমান সমাজের সুবিধা ও আবশ্যক অনুসারে হিন্দু বিবাহ সমালোচনা করিবার অধিকার আছে।

যদি দেখা যায় হিন্দু বিবাহে আমাদের বর্তমান সমাজে রোগ-শোক-দারিদ্র্য বাড়িতেছে, তবে বলা যাইতে পারে মনু সমাজের কল্যাণ লক্ষ্য করিয়া বিবাহের নিয়ম নির্দেশ করিয়াছেন; অতএব সেই সমাজের কল্যাণের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া বিবাহের নিয়ম পরিবর্তন করা অন্যায় নহে। ইহাতে মনুর অবমাননা করা হয় না, প্রত্যুত তাঁহার সম্মাননা করাই হয়। কিন্তু প্রথমেই বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, রাজবিধির সহায়তায় সমাজ সংস্কার আমার মত নহে। জীবনের সকল কাজই যে লাল পাগড়ির ভয়ে করিতে হইবে, আমাদের জন্য সর্বদাই যে একটা বড়ো দেখিয়া বিজাতীয় জুজু পুষিয়া রাখিতে হইবে, আপন মঙ্গল-অমঙ্গল কোন কালেই আপনারা বুঝিয়া স্থির করিতে পারিব না, ইহা হইতেই পারে না; জুজুর হস্তে সমাজ সমর্পণ করিলে সমাজের উদ্ধার হইবে কবে।"

ঠাকুর পরিবারের মধ্যে ভারতীয় সংস্কৃতির যে রূপটি ফুটে উঠছিল তা কেবল মাত্র হিন্দু নয়। বেশভূষা, গৃহসজ্জা, সঙ্গীত সর্বত্রই মুসলিমসংস্কৃতির ছাপ ছিল—দেবেন্দ্রনাথের চিন্তাধারায় হাফিজের দান উপনিষদের পাশাপাশিই ছিল। তখনকার কৃত্রিম নব্য হিন্দুর কচ্‌কচির প্রতি বিদ্রূপ রবীন্দ্রনাথের অনেক লেখায় প্রকাশ হচ্ছিল। সে সময়ে হিন্দু-মুসলমানের শ্রেষ্ঠত্ব লড়াই ছিল না—পাদ্রীরা খ্রীষ্টান ধর্মের বড়াই করতেন; সেজন্য তাঁদের সঙ্গে নব্য হিন্দুর লড়াই চলত। এ দু'পক্ষের কোনো পক্ষই রবীন্দ্রনাথের সহানুভূতি লাভ করেনি—এ সম্বন্ধে কতগুলি বিদ্রূপাত্মক কবিতা লেখা হয়েছিল।

"তবেরে, লাগাও লাঠি—কোমরে কাপড় আঁটি।
হিন্দুধর্ম হোক রক্ষা খ্রীষ্টানি হোক মাটি—
…স্বামী ঘরে এলো যুদ্ধ সারিয়া ঘরে নেই লুচি ভাজা
আর্য নারীর এ কেমন প্রথা, সমুচিত দিব সাজা।
যাজ্ঞবল্ক্য অত্রি হারীত জলে গুলে খেলে সবে
মার ধোর করে হিন্দু ধর্ম রক্ষা করতে হবে।"

বস্তুত এ কবিতার তাৎপর্য আজও ফুরায় নি, রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সঙ্ঘ, জনসঙ্ঘ প্রভৃতি এখনও মার ধোর করে হিন্দুধর্ম রক্ষা করতে ব্রতী হয়েছে।

নিষ্কর্মা আস্ফালন—কি চিন্তার জগতে, কি রাজনীতি ক্ষেত্রে, কখনই তাঁর ভালো লাগে না। কবি হলেও এদিকে তিনি সম্পূর্ণরূপে বাস্তববাদী। যে চিন্তার মূল শুষ্ক, প্রয়োগ অসম্ভব, সে ধরণের কল্পনা বিলাসে যে অসত্য আছে তা তাঁকে বিরূপ করেছে। কবি যে কতটা বাস্তববাদী তা তাঁর 'মায়াবাদের' প্রতি বিরূপতা থেকেও বোঝা যায়—ভারতীয় দর্শনের 'মায়াবাদের' সম্বন্ধে লিখছেন:

"হা রে নিরানন্দ দেশ, পরিজীর্ণজরা, বহির্বিজ্ঞতার
বোঝা ভাবিতেছ মনে,
ঈশ্বরের প্রবঞ্চনা পড়িয়াছে ধরা সুচতুর সূক্ষ্ম দৃষ্টি
তোমার নয়নে—
লয়ে কুশাঙ্কুর বুদ্ধি শাণিত প্রখরা, কর্মহীন
রাত্রি দিন বসি গৃহ কোণে
মিথ্যা বলে জানিয়াছ বিশ্ব বসুন্ধরা গ্রহতারাময়
সৃষ্টি অনন্ত গগনে।"···

দেশের মানুষের এই নিরানন্দ কর্মহীন দিনকে আনন্দে পূর্ণ ও কর্মে উদ্দীপিত করবার, সচল করবার, চেষ্টা করেছেন কবি পরবর্তী জীবনে। ভারতীয় দর্শনের লয়-তত্ত্ব নিয়ে চন্দ্রনাথ বসুর সঙ্গে যে তর্কাভিঘাত চলছিল তারই নিরর্থকতায় ক্লান্ত কবির ব্যঙ্গ কবিতা 'হিং টিং ছট্' আজকের দিনের Jargon বিলাসী পোলেটিক্যাল তার্কিকদের প্রতিও কম প্রযোজ্য নয়।

তৎকালীন প্রচলিত শিক্ষা-বিধি, শিক্ষার মাধ্যম প্রভৃতি বিষয়ে কবির চিন্তা তখন নূতন পথ খুঁজে বেড়াচ্ছে 'শিক্ষার হেরফের' নামে। (১৮৯২) সাধনায় প্রকাশিত দীর্ঘ প্রবন্ধে মাতৃভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম করার প্রস্তাব ও যুক্তি তখনকার দিনে এমন করে আর কেহ ভাবেনি! গোঁড়া সংস্কৃতজ্ঞ হিন্দুরা ভাবতেন ইংরেজি শিক্ষায় দেশের ধর্মনষ্ট হবে আর আধুনিকরা পিতার কাছেও ইংরেজিতে চিঠি লিখতেন। মাতৃভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম না করলে শিক্ষার সঙ্গে জীবনের সামঞ্জস্য হয় না। "গ্রন্থজগৎ এক প্রান্তে আর তাহাদের বসতিজগৎ অন্য প্রান্তে, মাঝখানে কেবল ব্যাকরণ অভিধানের সেতু—এইজন্য যখন দেখা যায় একই লোক একদিকে য়ুরোপীয় দর্শন বিজ্ঞান এবং ন্যায়শাস্ত্রে সুপণ্ডিত অন্যদিকে চির সংস্কারগুলিকে সযত্নে পোষণ করিতেছেন, একদিকে স্বাধীনতার উজ্জ্বল আদর্শ মুখে প্রকাশ করিতেছেন অন্যদিকে অধীনতার শত সহস্র লতাতন্তু পাশে আপনাকে এবং অন্যকে প্রতি মুহূর্তে আচ্ছন্ন এবং দুর্বল করিয়া ফেলিতেছেন।"

আজ দেশে অনেক পরিমাণে মাতৃভাষার সমাদর হয়েছে বাংলা-সাহিত্য নানা রসে পূর্ণ, সমৃদ্ধ কিন্তু শিক্ষার সঙ্গে জীবনের সামঞ্জস্য আজও পূর্ণ নয়—বিজ্ঞানের উচ্চমার্গের ছাত্রও নানা কুসংস্কার মানেন, আধিভৌতিব [illegible] বিশ্বাস করেন অশ্লেষা-মঘা মানেন, কালিঘাটে মানৎ করেন!

যখন মানসী, সোনারতরী, চিত্রা প্রভৃতি কাব্য গ্রন্থগুলি কবিতার ফসলে পূর্ণ হয়ে উঠছে তার পাশাপাশি কবির মনে রাজনৈতিক চিন্তাও শক্তিলাভ করছে।

সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক আবেষ্টনের উপর কোনো কল্পনার মোহজাল বিস্তার করা হয়নি।

তখন হিন্দু-মুসলমানের দ্বন্দ্ব পরিস্কার আকৃতি নেয়নি সেই সময়ে বাল গঙ্গাধর তিলকের 'গোহত্যা' সম্বন্ধে আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে দেশের আসন্ন বিপদ সম্বন্ধে কবি সচেতন হয়ে উঠলেন। এই সময়ে লেখা গদ্য প্রবন্ধগুলিতে জাতীয় জীবনকে সবদিক থেকে উদ্বোধিত করে তোলবার জন্য যেন কবি তাঁর সমস্ত শক্তিকে উদ্যত করেছেন। 'স্বদেশী সমাজ' স্থাপনের সময় কবি বলেছিলেন :

"যে লোকের ব্যবসা বাঁশি বাজানো সহসা সর্পাঘাতের উপক্রম হইলে সে বাঁশিকে লাঠির মতো ব্যবহার করিয়া থাকে। আমার যাহা কিছু শক্তি আছে তাহা উদ্যত করিয়া আজ দেশের এই আসন্ন দুর্দিনে অমঙ্গলকে ঠেকাইতে চেষ্টা করিতেছি।"

মহাকবির কবিত্ব শক্তি দেশের ঐকান্তিক মঙ্গলস্পৃহায় চারিদিকে পথ খুঁজছে—বাঁশী থামেনি, সুর ভুল হয়নি কিন্তু সে সুর এক মহাঐকতান—জগতে আর কোনো মানুষ এক সঙ্গে এতদিকে ভেবেছেন কিনা সন্দেহ।

এই ভাবনায় তাঁর তৃতীয় নয়ন খুলে গেছে, ভবিষ্যৎ দেখতে পেয়েছেন, এক-একটি কথা এত সত্য যে আজ ৬০।৭০ বৎসর পরও তা মূল্যবান।

"শুনিয়াছি এমন কথাও কেহ কেহ বলেন যে ইংরেজের প্রতি দেশের সর্বসাধারণের বিদ্বেষই আমাদিগকে ঐক্যদান করিবে।

...একথা যদি সত্যই হয় তবে বিদ্বেষের কারণটি যখন চলিয়া যাইবে, ইংরেজ যখনই এদেশ ত্যাগ করিবে তখনই কৃত্রিম ঐক্য-সূত্রটি তো এক মুহূর্তে ছিন্ন হইয়া যাইবে, বাহিরে যাইতে হইবে না, রক্তপিপাসু বিদ্বেষ বুদ্ধির দ্বারা আমরা পরস্পরকে ক্ষত-বিক্ষত করিতে থাকিব।"

আমরা সোনারতরী ও মানসী রচনার সময়ের কবির গদ্য ও পদ্য সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করলাম—এরপরে চিত্রা। এই সময় তাঁর গৃহ গৃহিণী শূন্য।

রবীন্দ্র কাব্যের মধ্যগগনে 'চিত্রা' নক্ষত্র। এই গ্রন্থের কবিতাগুলি এক সময়ে সমগ্র শিক্ষিত বাঙালীর মুখে মুখে সোচ্ছ্বাসে উচ্চারিত হয়েছে—এর মধ্যে 'জীবন দেবতা' কবিতা বহু আলোচিত। আত্ম-পরিচয়ে জীবন দেবতা পর্যায়ের কবিতাগুলিকে লক্ষ্য করে কবি লিখছেন :

..."যে শক্তি আমার জীবনের সমস্ত সুখ-দুঃখকে সমস্ত ঘটনাকে ঐক্যদান, তাৎপর্যদান করিতেছে, আমার রূপ-রূপান্তর জন্ম-জন্মান্তরকে এক সূত্রে গাঁথিতেছে, যাহার মধ্য দিয়া বিশ্বচরাচরের ঐক্য অনুভব করিতেছি, তাঁহাকেই জীবন দেবতা

নাম দিয়া লিখিয়াছিলাম—"ওহে অন্তরতম, মিটেছে কি তব সকল তিয়াষ আসি অন্তরে মম ?"···নিজের জীবনের মধ্যে এই যে আবির্ভাবকে অনুভব করা গেছে—যে আবির্ভাব অতীতের মধ্য হইতে অনাগতের মধ্যে প্রাণের পালের উপরে প্রেমের হাওয়া লাগাইয়া আমাকে কাল-মহানদীর নূতন নূতন ঘাটে বহন করিয়া লইয়া চলিয়াছে সেই জীবন দেবতার কথা বলিলাম।···(১৩১১)।"

এর বহু বৎসর পরে রবীন্দ্র রচনাবলীতে গ্রথিত হবার পূর্বে 'চিত্রা'র ভূমিকা লিখতে বসে নূতন করে চিত্রার মূল্যায়ণ করেছেন, ১৯৪০ সালে আশি বছর বয়সের নব যুগের কবি। তিনি লিখেছেন "চিত্রা কাব্যে আমি একদিন বলেছিলুম আমার অন্তর্যামী আমাকে দিয়ে যা বলাতে চান আমি তাই বলি কথাটা এই রকম শুনতে হয়। কিন্তু চিত্রায় আমার যে উপলব্ধি প্রকাশ পেয়েছে সেটি অন্য শ্রেণীর আমার একটি যুগ্ম সত্তা আমি অনুভব করেছিলুম···সে আমারই ব্যক্তিত্বের অন্তর্গত।"

রবীন্দ্রনাথের কবি সত্তা, তাঁর জীবন বোধ, ধাপে ধাপে বহু পরিবর্তনের মধ্যদিয়ে এগিয়ে চলেছে—জীবনের দুই প্রান্তে লেখা একই কাব্যের এই দুটি ভূমিকা থেকে তা বোঝা যায়।

"আমি কি গো বীণা যন্ত্র তোমার, ব্যথায় পীড়িয়া হৃদয়ের তার, মূর্ছনা ভরে গীত ঝংকার, ধ্বনিছ মর্মমাঝে ?"

এ কবিতার স্বান্যানুভূতির মধ্যে যদি বা কেহ স্রষ্টা ও তাঁর সৃষ্টি, ভগবান ও তাঁর লীলারহস্যের সংবাদ পান রবীন্দ্রনাথ চিত্রার দ্বিতীয় ভূমিকায় সে কথাটি স্পষ্ট করে নস্যাৎ করেছেন। নিজের ভিতরেই যে অনুভূতি তার থেকে পৃথক করে কোনো ভক্তের ভগবানের উপর জীবনের দায়িত্ব ন্যস্ত করতে তিনি আর প্রস্তুত নন। জীবনের প্রথম দিকে পিতার ঈশ্বর সাধনার পটভূমিতে কবির আনন্দোপলব্ধির যে ব্যঞ্জনা ছিল নব নব অভিজ্ঞতা ও চিন্তার আলোকসম্পাতে ক্রমেই ত. তন তাৎপর্য পেল। নিজের মধ্যে এই যে যুগ্ম সত্তার অনুভব এ সম্বন্ধে বলছেন "এক সত্তায় ভিতর থেকে আদর্শের প্রেরণা, আর এক সত্তায় বাহিরে কর্মযোগে তার প্রকাশ। সংসারে এই দুই সত্তার বিরোধ সর্বদাই ঘটে, নিজের অন্তরে পূর্ণতার যে অনুশাসন মানুষ দৃঢ়ভাবে বহন করছে, তার সম্পূর্ণ প্রতিবাদে জীবন ব্যর্থ হয়েছে এ দৃষ্টান্তের অভাব নেই।"

মনে হয় চার অধ্যায়ে নায়কের জীবনে দুই সত্তার এই [illegible]ের কথাই বলা হয়েছে।

আপনার দুই সত্তার সামঞ্জস্য ঘটেছে কিনা এই আশঙ্কাসূচক প্রশ্ন চিত্রার কবিতায় অনেকবার প্রকাশ পেয়েছে—

লেগেছে কি ভালে
হে জীবন নাথ আমার রজনী আমার প্রভাব ?

ভিতরের আদর্শের প্রেরণাকে "বাহিরের কর্মের" মধ্যে সত্য করে তোলার যে আন্তরিক অনুশাসন তারই তাগিদে কবির মন পীড়িত হয়েছিল বহু পূর্বেই।

কড়ি ও কোমলে 'বঙ্গবাসীর প্রতি' উদ্দিষ্ট 'আমায় বোলোনা গাহিতে বোলোনা' —গানে যখন এই বেদনার ধ্বনি শোনা গেছে তখনই কর্মের আহ্বান শুনতে পাচ্ছেন—'কে জাগিবে আজ, কে করিবে কাজ, কে ঘুচাতে চাহে জননীর লাজ, কাতরে কাঁদিবে, মা'র পায়ে দিবে সকল প্রাণের কামনা।'

রবীন্দ্রনাথের কর্মীসত্ত্বা এই সময় থেকে প্রকাশের বেদনায় ব্যাকুল হয়েছে এই ব্যাকুলতা 'দুরাশা' কবিতার ভাবে এবং ছন্দেও ছট্ ফট্ করে উঠেছিল।

"যে মৃদু নিশ্চেষ্টতার মধ্যে মানুষ কেবলই মধ্যাহ্ন তন্দ্রায় ঢুলিয়া ঢুলিয়া পড়ে, সেখানে মানুষের জীবন আপনার পূর্ণ পরিচয় হইতে আপনি বঞ্চিত থাকে বলিয়াই তাহাকে এমন একটা অবসাদে ঘিরিয়া ফেলে। সেই অবসাদের জড়িমা হইতে বাহির হইয়া যাইবার জন্য আমি চিরদিন বেদনা বোধ করিয়াছি তখন যে সমস্ত আত্মশক্তিহীন রাজনৈতিক সভা ও খবরের কাগজের আন্দোলন প্রচলিত হইয়াছিল, দেশের পরিচয়হীন ও সেবা বিমুখ যে দেশানুরাগের মৃদু মাদকতা তখন শিক্ষিত মণ্ডলীর মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল—আমার মন কোনোমতেই তাহাতে সায় দিত না। আপনার সম্বন্ধে, আপনার চারিদিকের সম্বন্ধে, বড়ো একটা অধৈর্য ও অসন্তোষ আমাকে ক্ষুব্ধ করিয়া তুলিত। আমার প্রাণ বলিত "—ইহার চেয়ে হতেম যদি আরব বেদুইন।"

প্রথম যৌবনের এই অসন্তোষ ও অধৈর্য পরিণত যৌবনে "এবার ফিরাও মোরে কবিতায়" বাঁধ ভেঙ্গে প্লাবন আনল। কর্মজীবনের ডাক শুনতে পেয়েছেন কবি, শুনেছেন অনেক দিন ধরেই—এবার তা স্পষ্টতর—তিনি শুনতে পেয়েছেন "কোন্ অন্ধ কারা মাঝে জর্জর বন্ধনে অনাথিনী মাগিছে সহায়।"...

আমরা শুনেছি এই কবিতা রচনার অব্যবহিত পূর্বে কবি কয়েকদিন রাজসাহীতে (?) লোকেন পালিত মহাশয়ের বাড়িতে বাস করেছিলেন। ধনীর পুত্র আই, সি, এস, লোকেন পালিত রবীন্দ্রনাথের আবাল্য পরিচিত। তাঁর সাহিত্য অনুরাগও ছিল গভীর যদিচ তাঁর রুচি ও প্রকৃতি রবীন্দ্রচিন্তানুযায়ী নয়— তখনকার দিনের আই, সি, এস ও ধনী লোকেন পালিতের বাঁড়ির বিলাস ও আমোদের আবহাওয়ায় কয়েক দিনের মধ্যেই কবির প্রাণ হাঁপিয়ে উঠেছিল। সেই অস্থিরতা এই কবিতার অব্যবহিত প্রেরণা। কবির অন্তরের যুগ্ম সত্তার মিলিত

আহ্বান এই কবিতার ছত্রে ছত্রে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে বহু মানুষকে প্রেরণা দিয়েছে 'গীতশূন্য অবসাদপুর' মৃত্যুঞ্জয়ী আশার সঙ্গীতে ভরে গিয়েছে, এই কবিতার ইন্ধনে মশাল জ্বালিয়ে বহু যাত্রী নির্ভয়ে এগিয়ে গেছে—তার আপন অন্তরস্থিত শক্তি জাগ্রত হয়েছে—মৃত্যুর গর্জন শুনেছে সে সঙ্গীতের মত। ফাঁসীর পূর্বদিনে দিনেশ দাশ এই কবিতা মন্ত্রের মতন উচ্চারণ করেছেন।

এই কবিতায় 'কে সে ?' বলে যাকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে—সে ভগবানের স্থানাভিষিক্ত কেহ নয়—মানুষের আপন সত্তার মধ্যে তার নিজেরই এক অংশ। যে অংশ তার আদর্শের পূর্ণতার জন্য স্বাভাবিক জীবন স্পৃহার উর্ধ্বে উঠতে ব্যগ্র—মরণে কৃতার্থ করি প্রাণ।

শিলাইদহ

রবীন্দ্রনাথের সংসার জীবনের সঙ্গে শিলাইদহ অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত।

বিবাহের অল্পদিন পরেই পিতার আদেশে রবীন্দ্রনাথ জমিদারীর কাজে পূর্ববঙ্গের নদীবাহিত গ্রামের মাঝখানে, বাংলাদেশের হৃদয়ের কেন্দ্রস্থলে উপস্থিত হলেন।

মহর্ষি লিখলেন "এইক্ষণে তুমি জমিদারীর কার্য পর্যবেক্ষণের জন্য প্রস্তুত হও। প্রথমে সদর কাছারিতে নিয়মিতরূপে বসিয়া সদর আমিনের নিকট হইতে জমা ওয়াসিল বাকি ও জমাখরচ দেখিতে থাক এবং প্রতিদিনের আমদানি-রপ্তানিপত্র সকল দেখিয়া তার সারমর্ম নোট করিয়া রাখ। প্রতি সপ্তাহে আমাকে তাহার রিপোর্ট দিলে উপযুক্ত মতো তোমাকে আমি উপদেশ দিব এবং তোমার কার্যে তৎপরতা ও বিচক্ষণতায় আমার প্রতীতি হইলে আমি তোমাকে মফঃস্বলে থাকিয়া কার্য করিবার ভার অর্পণ করিব।"

মাত্র ত্রিশ বৎসর বয়সে পিতার আদেশে তিনি জমিদারীর কাজের ভার নিয়ে সেই সদ্যোদ্ভিন্ন অপূর্ব যৌবনে পূর্ববঙ্গের গ্রামের নিঃসঙ্গ জীবনে প্রবেশ করেন। তখন জোড়াসাঁকোর বাড়ি কাব্য, সাহিত্য ও শিল্পচর্চার, নাটক অভিনয় গান প্রভৃতি উৎসবের কেন্দ্র—বিদগ্ধ জনসমাগমে প্রফুল্ল, এই পরিবেশ ছেড়ে, দরিদ্র দুঃখক্লিষ্ট অশিক্ষিত ম্যালেরিয়া জীর্ণ গ্রামবাংলার মধ্যে এসে পড়লেন—এবং সেই জন্যই তখনকার রাজনীতি ও দেশ সেবার অবাস্তবতা তাঁর কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠল —"ভারতমাতা যে হিমালয়ের দুর্গম চূড়ার উপরে শিলাসনে বসিয়া কেবলই করুণ সুরে বীণা বাজাইতেছেন একথা ধ্যান করা নেশা করা মাত্র। কিন্তু ভারতমাতা যে আমাদের পল্লীতেই পঙ্কশেষ পানা পুকুরের ধারে ম্যালেরিয়া জীর্ণ

প্লীহারোগীকে কোলে লইয়া তাহার পথ্যের জন্য আপন শূন্য ভাণ্ডারের দিকে হতাশ দৃষ্টিতে চাহিয়া আছেন, ইহা দেখাই যথার্থ দেখা।"—

জমিদারির কর্মের ভার নিয়ে প্রথমে রবীন্দ্রনাথের নিজের মনেও দ্বিধা উপস্থিত হয়েছিল "হয়তো আমি এ কাজ পারব না, হয়ত আমার কর্তব্য আমার কাছে অপ্রিয় হতে পারে। জমিদারির কাজকর্ম, হিসাবপত্র, খাজনা আদায় জমা-ওয়াশীল—এতে কোনো কালেই অভ্যস্ত ছিলুম না। · সেই অঙ্ক ও সংখ্যার বাঁধনে জড়িয়ে পড়েও প্রকৃতিস্থ থাকতে পারব একথা তখন ভাবতে পারি নি।……আমার স্বভাব এই যে যখন কোনো দায় গ্রহণ করি তখন তার মধ্যে নিজেকে নিমগ্ন করে দিই, প্রাণপণে কর্তব্য সম্পন্ন করি, ফাঁকি দিতে পারিনে—যখন আমি জমিদারির কাজে প্রবৃত্ত তখন তার জটিলতা ভেদ করে, রহস্য উদঘাটন করতে চেষ্টা করেছি। আমি নিজে চিন্তা করে যে সকল রাস্তা বানিয়েছিলুম তাতে আমি খ্যাতি লাভ করেছিলুম। এমন কি পার্শ্ববর্তী জমিদারেরা আমার কাছে তাদের কর্মচারী পাঠিয়ে দিতেন, কী প্রণালীতে আমি কাজ করি তাই জানবার জন্য।

"আমি কোনোদিন পুরাতন বিধি মেনে চলি নি। এতে আমার পুরাতন কর্মচারীরা বিপদে পড়ল। তারা জমিদারার কাগজপত্র এমন করে রাখত যা আমার পক্ষে দুর্গম। তারা আমাকে যা বুঝিয়ে দিত তাই বুঝতে হবে, এই তাদের মতলব। তাদের প্রণালী বদলে দিলে কাজের ধারা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে, এই ছিল তাদের ভয়। তারা আমাকে বলত যে, যখন মামলা হবে তখন আদালতে নতুন ধারার কাগজপত্র গ্রহণ করবে না, সন্দেহের চক্ষে দেখবে। কিন্তু যেখানে কোনো বাধা সেখানে আমার মন বিদ্রোহী হয়ে উঠে।…আমি আদ্যোপান্ত পরিবর্তন করেছিলুম, তাতে ফলও হয়েছিল ভালো"—

জমিদারির কার্যোপলক্ষে নদীবাহিত জলপথে বাংলা দেশের গ্রামের মাঝখানে যখন দীর্ঘদিন বাস করতে হ'ল তখন জনসাধারণের যে সব দুর্দশা চোখে পড়ল তার কয়েকটি তাঁর নিজের ভাষায় উল্লেখ করা যায়ঃ

"গরমের সময়ে একটা দুঃখের দৃশ্য পড়ত চোখে। নদীর জল গিয়েছে নেমে, তীরের মাটি গিয়েছে ফেটে, বেড়িয়ে পড়েছে…পাড়ার পুকুরের পঙ্কস্তর, ধুধু করছে তপ্ত বালু। মেয়েরা বহু পথ থেকে ঘড়ায় করে নদীর জল বয়ে আনছে, সেই জল বাংলা দেশের অশ্রুজল মিশ্রিত। গ্রামে আগুন লাগলে নিবোবার উপায় পাওয়া যায় না, ওলাওঠা দেখা দিলে নিবারণ করা দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে।"

আর একটি দৃশ্য দেখেছেন ও সেই ১৯০৮ সালেই ভেবেছেন যে, সমবায় নীতি অনুসারে চাষের ক্ষেত্র একত্র করে চাষ না করতে পারলে কৃষির উন্নতি হতেই

পারে না…"শিলাইদহে আমি যে বাড়িতে থাকতুম তার বারান্দা থেকে দেখা যায় খেতের পর খেত নিবন্তর চলে গিয়েছে দিগন্ত পেরিয়ে। ভোরবেলা থেকে হাল লাঙল এবং গরু নিযে একটি একটি করে চাষী আসে, আপন টুকরো খেতটুকু ঘুরে ঘুরে চাষ করে চলে যায়। এই রকম ভাগ করা শক্তিব যে কতটা অপচয় ঘটে প্রতিদিন সে আমি স্বচক্ষে দেখেছি।"

এ ছাড়া আরও দেখেছিলেন কৃষক মহাজনেব কাছে ঋণে আজীবন ডুবে থাকে, কোনও দিনও মুক্তি হয না এবং গ্রামেব মানুষদেব সর্বস্বান্ত হবার আর একটি উপায় বৃথা মোকদ্দমা।

"আব এক দুঃখের বেদনা" তাঁব "মনে বেজেছিল।" তিনি দেখলেন গ্রামের জীবনে তৃপ্তি দেবাব আনন্দ দেবার আযোজন অতি স্বল্প। "বাঁশঝাড়েব মধ্যে এক একটি গ্রাম যেন বাত্রিব বন্যাব মধ্যে জেগে আছে ঘনতব অন্ধকাব দ্বীপের মত। সেই দিক থেকে শোনা যায় ঢোলেব শব্দ, আর তাবই সঙ্গে কীর্তনের কোনো একটা পদের হাজাব বাব তারস্বরে আবৃত্তি। শুনে মনে হ'ত এখানেও কিন্তু জলাশযের জল তলায় এসে পড়েছে। তাদেব মনের উপবাস ঘোচাবাব জন্য কেউ তাদের কিছুমাত্র স১য করে না।—তাবা নিজেই আগেকাব দিনেব তলানি নিয়ে কোনমতে সান্ত্বনা পাবাব চেষ্টা কবে। আব কিছুদিন পবে এটুকুও যাবে শেষ হযে—নিবানন্দ ঘবে আলো জ্বলবে না। সেখানে গান উঠবে না আকাশে, ঝিল্লি ডাকবে বাঁশবনে, ঝোপ ঝাড়ের মধ্যে থেকে শেয়ালেব ডাক উঠবে প্রহরে প্রহবে—আব সেই সমযে শহবে শিক্ষাভিমানীব দল বিদ্যুৎ-আলোয সিনেমা দেখতে ভিড করবে।"

এই সকল প্রকাব দুঃখই দূব করবার কাজে নিযুক্ত হলেন ববীন্দ্রনাথ। দেশের লোককে ডাক দিযে বললেন: "যদি স্বদেশপ্রেম শিক্ষা দিতে হয় ব পিতামহেব নাম উল্লেখ কবিযা সিন্ধু হইতে ব্রহ্মপুত্র বিকম্পিত কবিযা agitate করিয়া বেড়াইলে হইবে না। হাতেকলমে এক একজন কবিযা দেশীযেব সাহায্য কবিতে হইবে।'

সাহায্য কবাব কাজে প্রবৃত্ত হযে ববীন্দ্রনাথ দেখলেন যে প্রকারে ধনী পূর্বকালে জলদান অন্নদান স্বাস্থ্যদান কবতেন তাতে একদল আশ্রয দিযে খ্যাতি ও পুণ্য পেয়েছে আর একদল আশ্রয নিযে আবাম পেয়েছে কিন্তু ফলে আশ্রিতের আত্মশক্তি জাগ্রত হবার কোনো পথ হয় নি—তাকে পরমুখাপেক্ষী করে তোলা হয়েছে। এব দুটি দৃষ্টান্ত তিনি বাববার উল্লেখ করেছেন: "আমার জমিদাবীতে নদী বহু দূরে ছিল, জল কষ্টের অন্ত ছিল না। আমি প্রজাদের বললুম 'তোরা কুয়ো

খুঁড়ে দে, আমি বাঁধিয়ে দেব।' তারা বললে, 'এ যে মাছের তেলে মাছ ভাজবার ব্যবস্থা হচ্ছে!' অর্থাৎ কুয়ো খোঁড়ার পরিশ্রমের বদলে তারা পাবে সামান্য জল আর ইনি পাবেন জল দানের অক্ষয় পুণ্য!

"আমাদের কাছারি থেকে কুষ্টিয়া পর্যন্ত উঁচু করে রাস্তা বানিয়ে দিয়েছিলুম। রাস্তার পাশে যে-সব গ্রাম তার লোকদের বললুম 'রাস্তা রক্ষা করবার দায় তোমাদের।' তারা যেখানে রাস্তা পার হয় সেখানে গরুর গাড়ির চাকায় রাস্তা ভেঙ্গে যায়। বর্ষাকালে দুর্গম হয়। আমি বললুম 'রাস্তায় যে খাদ হয় তার জন্য তোমরাই দায়ী, তোমরা সকলে মিলে সহজে ওখনাটা ঠিক করে দিতে পার।' তারা জবার দিলে, 'বাঃ আমরা রাস্তা করে দেব আর কুষ্টিয়া থেকে বাবুদের যাতায়াতের সুবিধা হবে।' অপরের কিছু সুবিধা হয় এ তাদের সহ্য হয় না। তার চেয়ে তারা নিজেরা কষ্টভোগ করে সেও ভালো! এদের ভালো করা বড় কঠিন।

তিনি আরো দেখলেন 'আমাদের সমাজে যারা দরিদ্র তারা অনেক অপমান সয়েছে, যারা শক্তিমান তারা অনেক অত্যাচার করেছে···অন্যদিকে আবার এইসব শক্তিমানেরাই গ্রামের সকল পূর্তকাজ করে দিয়েছে। অত্যাচার ও আনুকূল্য এই দুই এর ভিতর দিয়ে পল্লীবাসীর মন অসহায় ও আত্মসম্মানহীন হয়ে পড়েছে।'* তখন তিনি জানলেন অন্যকোনো দান দানই নয় শক্তিদানই দান। জনসাধারণের মধ্যে সেই শক্তি সমবায়ের জন্য সাধনার ক্ষেত্র হল, প্রথমে আপন জমিদারীতে পরে শ্রীনিকেতনে। "ইংরাজিতে যাকে বলে sentimentalism' সেই দুর্বল অস্পষ্ট ভাবাতিশয্য আমাদের জীবনকে এতদিন জীর্ণ করেছে। কিন্তু এই ভাবাবেগের হাত থেকে উদ্ধার পাবার একমাত্র উপায় কাজে প্রবৃত্ত হওয়া। কাজে লাগলেই তর্ককীটের আক্রমণ ও পাণ্ডিত্যের পঙ্গুতা থেকে রক্ষা পাব।

" দায়ে পড়ে নিজের সকল প্রকার অযোগ্যতা সত্ত্বেও কাজে নামতে হল। যাতে কয়েকটি গ্রাম নিজের শিক্ষা স্বাস্থ্য আর্থিক উন্নতি প্রভৃতির ভার সমবেত চেষ্টায় নিজেরা গ্রহণ করে আমি চেষ্টায় প্রবৃত্ত হলুম। দুই একটি শিক্ষিত ভদ্র-লোককে ডেকে বললুম 'তোমাদের কোনো দুঃসাহসিক কাজ করতে হবে না একটি গ্রামকে বিনা যুদ্ধে দখল কর'···কিন্তু আমি কৃতকার্য হতে পারিনি·· প্রথম ঝোঁকে মনে হয় আমিই সব করব···(কিন্তু) আমি ভালো কাজ করব এদিকে লক্ষ্য না

---

* এখনও জোতদারের সঙ্গে চাষীদের সম্পর্ক এই রকম। জোতদাররা অসময়ে সাহায্য করে, ফলে তাদের অনেক অন্যায়, যেমন চাল মজুত ও পাচার প্রভৃতিতে এরা সাহায্য করতে বাধ্য থাকে। দেশের এ চিত্র আজও অপরিবর্তিত।

করে যদি ভালো করব এদিকেই লক্ষ্য করতে হয় তাহলে স্বীকার করতেই হবে বাইরে থেকে একটি একটি করে উপকার করে আমরা দুঃখের ভার লাঘব করতে পারিনি। ··যার অভাব আছে, তার···অভাব মোচনের শক্তিকে জাগিয়ে তুলতে হবে।"

রবীন্দ্রনাথ পদ্মার বুকে ঘুরতে লাগলেন—গ্রামের ও বাঙালীর শতসমস্যা তাঁর চোখে পড়তে লাগল, তাঁর সক্রিয় মননশীল মন তখনি তার সমাধানে পথ খুঁজতে লাগল—পথের নিশানাও পাওয়া গেল, কিন্তু তিনি একা, একেবারেই একা। দেশ পরাধীন, কী ক'রে তাঁর চেষ্টা সফল করবেন? শুধু দারিদ্র্য, জলকষ্ট, ম্যালেরিয়া নয়—দেখলেন দেশের প্রাণে রসের কেন্দ্র গেছে শুকিয়ে। দেখলেন কুসংস্কার এমন দৃঢমূল যে বিদেশী মানুষ পথের পাশে মুমূর্ষু কিন্তু জাতিচ্যুত হবার ভয়ে তাকে কেউ স্পর্শ করবে না। মানুষের কাছে মানুষ এত মূল্যহীন হয়ে গেছে। তাঁর অতিপ্রিয় স্বদেশের স্বরূপ যখন স্পষ্ট হয়ে উঠল তখন আর সন্দেহ রইল না যে প্রকৃত স্বাদেশিকতা কি—শহরে মঞ্চ বেঁধে মাতৃভূমির মুক্তি সম্বন্ধে বক্তৃতা নয়, যেখানে মাতৃভূমি দারিদ্র্যে কুসংস্কারে অশিক্ষায় পীড়িত সেখানে সেই বেদনা থেকে মুক্তিদানই সর্বপ্রথম ও প্রধান কর্তব্য। এইভাবে গান্ধীজীরও বহু পূর্বে প্রথম স্বাদেশিকতার যুগে রবীন্দ্রনাথই প্রথম নেতৃবর্গকে দেখালেন স্বদেশ কোথায় ও তার যথার্থ সমস্যা কি।

শিলাইদহে একটি বিরাট পরিকল্পনা নিয়ে কাজ শুরু হয়েছিল। কবির পরিকল্পনা কত দূর পর্যন্ত কার্যিক (Practical) ছিল তা নিম্নোদ্ধৃত বিবরণ থেকে বোঝা যাবে ঃ

"১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে আমরা তাহাকে বঙ্গীয় হিতসাধন মণ্ডলীর সহিত যুক্ত দেখিতে পাই—উহার কর্মপদ্ধতি রবীন্দ্রনাথ এইরূপ নির্ধারণ করিয়াছেন ঃ (১) নিরক্ষরদিগকে অন্তত যৎসামান্য লেখা-পড়া ও অঙ্ক শেখানো (২) ছোট ছোট ক্লাস ও পুস্তিকা প্রচার দ্বারা স্বাস্থ্যরক্ষা, সেবাশুশ্রূষাদি সম্বন্ধে শিক্ষাদান, ম্যালেরিয়া, যক্ষা, নানাবিধ অজীর্ণ ও উদরাময় রোগ প্রভৃতির প্রতিষেধের জন্য সমবেত চেষ্টা। (৩) শিশুমৃত্যু নিবারণের উপায় নির্ধারণ ও ব্যবস্থা অবলম্বন। (৪) গ্রামে উৎকৃষ্ট পানীয় জলের ব্যবস্থা। (৫) গ্রামে গ্রামে যৌথ ঋণদান সমিতি ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা ও দরিদ্র লোকদের ইহার উপকারিতা প্রদর্শন। দুর্ভিক্ষ, বন্যা, মড়ক প্রভৃতির সময় দুঃস্থদিগকে বিবিধ সাহায্যদান।

আর একটি দিকে তিনি সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করছিলেন যে টাকাই আজ সবচেয়ে মূল্যবান হয়ে উঠছে এ ভারতীয় নীতি প্রকৃত বিরুদ্ধ।

"মুসলমানের আমলে হিন্দু সমাজের যে কোনো ক্ষতি হয় নাই তাহার কারণ,

সে আমলে ভারতবর্ষের আর্থিক পরিবর্তন হয় নাই। ভারতবর্ষের টাকা ভারতবর্ষেই থাকিত, বাহিরের দিকে তাহার টান না পড়াতে আমাদের অন্নের সচ্ছলতা ছিল। এই কারণে আমাদের সমাজ ব্যবহার সহজেই বহু ব্যাপক ছিল। তখন ধনোপার্জ্জন আমাদের প্রত্যেকের চিন্তাকে এমন করিয়া আকর্ষণ করে নাই। তখন সমাজে ধনের মর্যাদা অধিক ছিল না এবং ধনই সর্বোচ্চ ক্ষমতা বলিয়া গণ্য ছিল না। ধনশালী বৈশ্যগণ যে সমাজে উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছিলেন তাহাও নহে। এই কারণে, ধনকে শ্রেষ্ঠ আসন দিলে জনসাধারণের মনে যে হীনতা আসে, আমাদের দেশে তাহা ছিল না।

"এখন টাকা সম্বন্ধে সমাজস্থ সকলেই অত্যন্ত বেশি সচেতন হইয়া উঠিয়াছে। সেইজন্য আমাদের সমাজেও এমন একটা দীনতা আসিয়াছে যে, টাকা নাই ইহাই স্বীকার করা আমাদের পক্ষে সকলের চেয়ে লজ্জাকর হইয়া উঠিতেছে। ইহাতে ধনাড়ম্বরের প্রবৃত্তি গড়িয়া উঠে, লোকে ক্ষমতার অতিরিক্ত ব্যয় করে, সকলেই প্রমাণ করিতে বসে যে, আমি ধনী। বণিক জাতি রাজ সিংহাসনে বসিয়া আমাদিগকে এই ধন দাসত্বের দারিদ্র্যে দীক্ষিত করিয়াছেন।"

এইবারে গ্রামোন্নয়ন পরিকল্পনার কথা কিছু আলোচনা করা যাক—জগতে কোনে কবি এতখানি কার্যিক দায় নিয়েছেন কিনা সন্দেহ।

"কালিগ্রাম পরগনা ঠাকুরবাবুদের জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত—রাজশাহী ও বগুড়া জিলার আত্রাই. রঘুরামপুর, রাণীনগর, সান্তাহার, তিলকপুর, আদমদীঘি, নসরৎপুর ইত্যাদি ঘিরিয়া ওই পরগনা দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে অনেক শত মাইল ব্যাপিয়া। অতুল সেন হইলেন প্রধান কর্মী, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র ভদ্র, বিশ্বেশ্বর বসু প্রভৃতি ছিলেন তাঁর সহকারী। সঙ্গে অতুলবাবুর কর্মীসঙ্ঘ। কবি-নির্দিষ্ট কাজের উদ্দেশ্য ছিল প্রধানত পাঁচটি :

(১) যথাযোগ্য চিকিৎসা বিধান, (২) প্রাথমিক শিক্ষা বিধান, (৩) পাবলিক ওয়ার্কস অর্থাৎ কূপ খনন, রাস্তা প্রস্তুত ও মেরামত, জঙ্গল সংস্কার প্রভৃতি, (৪) জমিদার হইতে দরিদ্র চাষীকে রক্ষা, ও (৫) সালিশী দ্বারা কলহের নিষ্পত্তি।

প্রথমে কাজ আরম্ভ হয় তিনটি কেন্দ্রে; পতিসর, কামতা ও রাতোয়ালে। তিনটি হাসপাতাল ও ঔষধালয় স্থাপন করিয়া বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ চলিতে থাকে, হাসপাতালে যথারীতি ডাক্তার ও দুই একটি 'বেডে'র ব্যবস্থা করা হয়। এই সকল সৎকার্যের ব্যয়ভার অংশত জমিদার রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং ও অংশত প্রজারা বহন করিতেন; খাজনার টাকা পিছু এক আনা তিনি দিতেন, প্রজারা দিত এক আনা। আর এক উপায়েও অর্থ সংগ্রহ হইত। আমাদের দেশের নীতি এই যে (হিন্দু

মুসলমান নির্বিশেষে) কোন ব্যক্তি সামাজিক কোনও অপরাধ করিলে তাহাকে সামাজিক ভাবে বেশ কিছু অর্থদণ্ড দিয়া নিষ্কৃতি পাইতে হয়। সেই অর্থে একটা সামাজিক ভোজের আয়োজন হয়। রবীন্দ্রনাথের ব্যবস্থায় সাধারণ ফণ্ডে সামান্য কিছু চাঁদা দিয়াই এই বিরাট ব্যয়ের হাত হইতে অপরাধীরা নিষ্কৃতি পাইত। সাধারণ ফণ্ডের টাকা এই সকল সৎকার্যে ব্যয়িত হইত।

দুই শতাধিক অবৈতনিক নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া বিভিন্ন কেন্দ্রে নিরক্ষরতা দূরীকরণের কাজ আরম্ভ হয়। রাত্রির এবং দিনের (day and night) উভয়বিধ বিদ্যালয়েরই বন্দোবস্ত হয়; শিশু এবং বয়োবৃদ্ধ সকলেরই জন্য ব্যবস্থা করা হয়। নিরক্ষরতা দূর করার কাজ শেষ হইলেই পড়া লেখা ও পাটিগণিত (reading writing, arithmetic) শিক্ষার কাজে হাত দেওয়া হইত। এই শিক্ষা কিছু অগ্রসর হইলেই বক্তৃতা দ্বারা ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতির পাঠ দেওয়া চলিত। প্রধান লক্ষ্য থাকিত ভারতবর্ষের ইতিহাস ও ভূগোল, আনুষঙ্গিকভাবে পৃথিবীর ইতিহাস ভূগোলও তাহাদিগকে শিখানো হইত। ইহার সঙ্গে মুখে মুখে আকস্মিক বিপদে প্রাথমিক সাহায্য (first aid), কৃষি কর্মের সুবন্দোবস্ত, অগ্নি নির্বাপণে, বন্যার সময় কর্তব্য ইত্যাদি সম্পর্কে তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া হইত। অবসর সময়ে পৃথিবীর খবরাখবর শোনানোর ব্যবস্থা ছিল। (শনিবারের চিঠি)

দেশের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলের জন্য তিনি দেশের রাজসরকারের কাছে হাত পাতবার আবেদন নিবেদনের পক্ষপাতী নন। পাবনাতে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলনীতে সভাপতির ভাষণে যেকথা তিনি অতি পরিষ্কার ক'রে বলেছিলেন তখনকার রাজনীতিজ্ঞরা রবীন্দ্রনাথের এই সহজ ও সত্য প্রস্তাবের অনেক সমালোচনা করেছিলেন। তাঁদের মতে, কবি 'মিল' 'বেন্থাম' পড়েন নি। তাই রাষ্ট্রের কর্তব্য সম্বন্ধে তাঁর ধারণা ঠিক নয়। বিদেশী প্রভুদের নিকট আবেদন-নিবেদনের ব্যর্থতা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মত ছিল স্পষ্ট। দেশের জমিদারদেরও যথাকর্তব্য নির্দেশ ক'রে বলেছিলেন—'তাই দেশের জমিদারদিগকে বলিতেছি হতভাগ্য রায়তদিগকে পরের হাত এবং নিজের হাত হইতে রক্ষা করিয়া উপযুক্ত শিক্ষিত, সুস্থ ও শক্তিশালী করিয়া না তুলিলে কোন ভাল আইন বা অনুকূল রাজশক্তি দ্বারা ইহারা কদাচ রক্ষা পাইতে পারিবে না। ইহাদিগকে দেখিবামাত্র সকলেরই জিহ্বা লালায়িত হইবে। এমনি করিয়া দেশের অধিকাংশ লোককেই যদি, জমিদার, মহাজন, পুলিশ, কানুনগো, আদালতের আমলা যে ইচ্ছা সেই অনায়াসে মারিয়া যায় ও মারিতে পারে তবে দেশের লোককে মানুষ হইতে না শিখাইয়া-ই রাজা হইতে শিখাইব কি করিয়া ?'

রবীন্দ্রনাথ বলতেন যে দুর্বলের দুর্বলতাই সবলকে অত্যাচারী হ'তে প্রলুব্ধ করে। এ সম্বন্ধে তাঁর একটা উপমা মনে পড়ে—"অসহায় এক ছাগশিশু ব্রহ্মাকে গিয়ে বলল, 'প্রভু, মানুষ আমাকে খায় কেন ?' ব্রহ্মা তার নিরস্ত্র অসহায় নধর-কান্তির দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে বললেন, 'বাপু হে, তোমায় দেখে আমারই জিভে জল আসছে তা মানুষকে দোষ দেব কি ক'রে !"

সমগ্র দেশকে ভিতর থেকে শক্তিসম্পন্ন, শিক্ষিত ও জাগ্রত ক'রে না তুললে রাজনৈতিক স্বাধীনতার মূল্য সামান্যই। 'দুর্বল জনসাধারণ আজ ইংরেজের হাতে মার খাচ্ছে কাল অন্য কোন বিদেশীর কিংবা অত্যাচারী স্বদেশীর মার খাবে।' দুর্বলচরিত্রের, দ'ঢ়র, প্রতিরোধক্ষমতা নাই, তাই তারা প্রগতির সহায়ক নয়—তারা সমগ্র দেশকেই নিচের দিকে টানছে চোরাবালির মত। 'যারে তুমি নিচে ফেল সে তোমারে টানিবে যে নিচে।' এই অমোঘ ভবিষ্যদ্‌বাণী শুধু আপন দেশের পরিপ্রেক্ষিতেই নয় এই বিশ্ব সমাজে সভ্যজাতির দ্বারা অনাদৃত অবজ্ঞাত জাতিগুলির প্রতি লক্ষ্য ক'রে বিরাট মানবসমাজে নেশনালিজম গ্রন্থে পুনর্বার উচ্চারণ করেছিলেন।

পরে গ্রামোন্নয়ন পরিকল্পনা শান্তিনিকেতনে গৃহীত হয়। পরাধীন দেশে একেবারে একাকী রবীন্দ্রনাথ যে বিপুল কর্মের ভার নিজে গ্রহণ করেছিলেন বিস্ময়ের কথা এই যে তা তাঁর ভার ছিল না—ছিল আনন্দ। বিচিত্রভাবে মানুষের জীবনের সুখ-দুঃখের তরঙ্গে মিশে যাবার পর শ্রীনিকেতনের গ্রামের মেলায়, শোভা-সজ্জায়, আলপনায়, গানে সৌন্দর্যের আনন্দের বাঁধ খুলে দিলেন রসহীন দরিদ্র প্রাণে। আপনাকে বিচিত্রভাবে দান করবার উপযুক্ত ক্ষেত্র তৈরী করলেন কবি, তাই তাঁর কবিপ্রতিভাও পূর্ণতর হয়ে ওঠবার পথ পেল। তিনি শুধুমাত্র কাব্য-রচনাকারী কবি নন, জীবনরচনাকারী কবি হবার উপায় পেলেন। সেখানে মানুষই তাঁর কবিতার পদ, মানুষের সর্বাঙ্গীণ উৎকর্ষসাধনই তাঁর গূঢ়তম সৃষ্টি। যেমন গ্রামের কাজে রবীন্দ্রনাথের মননশক্তি ও উদ্যম এদেশের সমাজ-জীবনের অগ্রগতির পথনির্দেশ করেছে তেমনি রবীন্দ্রনাথের জীবনসাধনা ও কর্ম এই গ্রামের মানুষের জীবন-সংঘাতের ফলেই এমন পূর্ণ এমন সহৃদয় এমন প্রেমময় হয়ে উঠেছে। এইভাবে তাঁর আপনসত্তার মধ্যের 'অনুশাসন' বা নির্দিষ্ট আদর্শ সফল হতে পেরেছে।

গ্রামের মানুষকে দিতে গিয়ে তিনি পেয়েওছেন অনেক।

'তোমরা যে পার এবং যেখানে পার এক-একটি গ্রামের ভার গ্রহণ করিয়া সেখানে গিয়া আশ্রয় লও। গ্রামগুলিকে ব্যবস্থাবদ্ধ করো, শিক্ষা দাও, কৃষিশিল্প ও

গ্রামের ব্যবহারসামগ্রী সম্বন্ধে নতুন চেষ্টা প্রবর্তিত করো ; গ্রামবাসীদের বাসস্থান যাহাতে পরিচ্ছন্ন স্বাস্থ্যকর ও সুন্দর হয় তাহাদের মধ্যে সেই উৎসাহ সঞ্চার করো, এবং যাহাতে তাহারা নিজেরা সমবেত হইয়া গ্রামের সমস্ত কর্তব্য সম্পন্ন ক'রে সেইরূপ বিধি উদ্‌ভাবিত করো। এ কর্মে খ্যাতির আশা করিও না ; এমনকি, গ্রামবাসীদের নিকট হইতে কৃতজ্ঞতার পরিবর্তে বাধা ও অবিশ্বাস স্বীকার করিতে হইবে। ইহাতে কোন উত্তেজনা নাই, কোন বিরোধ নাই, কোন ঘোষণা নাই, কেবল ধৈর্য এবং প্রেম, নিভৃতে তপস্যা—মনের মধ্যে কেবল এই একটি মাত্র পণ যে দেশের মধ্যে সকলের চেয়ে যাহারা দুঃখী তাহাদের দুঃখের ভাগ লইয়া সেই দুঃখের মূলগত প্রতিকার সাধন করিতে সমস্ত জীবন সমর্পণ করিব।'

জমিদার রবীন্দ্রনাথ

১৩৪৯ শ্রাবণের প্রবাসীতে নরেন্দ্রনাথ বসু 'জমিদার রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর দুইখানি চিঠি' নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন তার কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি : "বিশ বাইশ বৎসর পূর্বের কথা, একজন খ্যাতনামা বঙ্গ সন্তান রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গে সকলকে প্রায়ই বলতেন, "আপনারা প্রভাত রবির কোমল কিরণেই মুগ্ধ হয়েছেন কিন্তু প্রচণ্ড মার্তণ্ডের দোর্দণ্ড প্রতাপ দেখেন নি, তা যদি দেখতে চান তো একবার গিয়ে তাঁর জমিদারী দেখে আসুন।"...

শুনিয়া মনে একটু সন্দেহ জাগিল তবে কি কবি রবীন্দ্রনাথ ও জমিদার রবীন্দ্রনাথের মধ্যে সামঞ্জস্য নাই ? ..

সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন সেই অন্যায় সন্দেহের জন্য আজ কবিগুরুর স্মৃতিতর্পণ সভায় আমি অকপটচিত্তে নিজের অপরাধ স্বীকার করিতেছি—শহরবাসী অন্যান্য জমিদারের মতো তিনি দুই দিনের জন্য নিজ জমিদারীতে যাইয়া উৎসবে আনন্দে ও শিকারে সময় কাটাইয়া নিজ কর্তব্য শেষ করেন নাই।

...পাঁচ বৎসর পূর্বে শান্তিনিকেতনে রবিবাসরের অধিবেশনে তিনি বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন—"অনেক দিন নগরের বাইরে পল্লীগ্রামের সুখ দুঃখের ভিতর দিয়ে দিন কেটেছে, তখনই আমি আমাদের দেশের সত্যিকার রূপ কোথায় তা অনুভব করতে পেরেছি...সে সময় থেকেই আমার মনে এইভাব হচ্ছিল। কেমন করে এই সব অসহায় অভাগাদের প্রাণে মানুষ হবার আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে দিতে পারি। এই যে এরা মানুষের শ্রেষ্ঠ সম্পদ শিক্ষা হতে বঞ্চিত, এই যে এরা এক বিন্দু পানীয় জল হতে বঞ্চিত, এর কি কোনো প্রতিকারের উপায় নেই ? · এই বেদনা আমার চিত্তকে একান্তভাবে স্পর্শ করেছিল কি ভাবে কেমন করে এদের এই মরণ

দশার হাত থেকে বাঁচাতে পারা যায়···

···দিন রাত স্বপ্নের মতো এই অভাব ও অভিযোগ দূর করার জন্য আগ্রহ ও উত্তেজনা আমার চিত্তকে অধিকার করেছিল যে কোনো দায়িত্বই হো'ক না কেন তাই গ্রহণ করব এই আনন্দেই অভিভূত হয়েছিলাম। আমার প্রজারা বিনা বাধায় আমার কাছে এসে অভাব অভিযোগ জানাতে কোনো সংকোচ বা ভয় করত না। আমি জমিদারীতে গিয়ে কর্মীদের ডেকে এনে প্রজাদের মৃতদেহে প্রাণ সঞ্চারের চেষ্টা করেছিলাম।"···

জমিদার রবীন্দ্রনাথ নিজেদের কর্মচারীদের তাঁহারা আত্মীয় অনাত্মীয় যাহাই হউক না কেন কখনো সন্দেহের চক্ষে দেখিতেন না। শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয় তিন বৎসর ঠাকুর স্টেটে ম্যানেজারি করিয়াছিলেন, তিনি লিখিয়াছিলেন :

"বিষয় কর্মে যারা লিপ্ত তাদের মনে নানারূপ সন্দেহের উদয় হয়, কিন্তু এ জাতীয় সন্দেহ তাঁর মনে এক দিনের জন্যও স্থান পায়নি। তাঁর মনের মত তাঁর চরিত্রও অসাধারণ উদার। এই বিশ্বাসপ্রবণতার ফলে তাঁকে হয়ত কোনো কোনো স্থলে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়েছে কিন্তু তাতে তাঁর মন কখনো মলিন হয়নি।"

এরপর লেখক জমিদারির ম্যানেজার জানকীনাথ রায়কে লেখা রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি পত্র উদ্ধৃত করেছেন তার কিছু অংশ নীচে দেওয়া গেল। বহু বিশিষ্ট মানুষেরও বিচারবুদ্ধি নিজের স্বার্থ সম্বন্ধে অবিচলিত থাকে না, যা অন্যের সম্বন্ধে নিন্দারযোগ্য মনে করেন নিজের সম্বন্ধে করেন না। রবীন্দ্র চরিত্রের অবিচলিত নৈতিক দৃষ্টির পরিচয় এই চিঠিগুলিতে আছে :

আশিষ সন্ত

কর্মের নিয়ম অনুসারে—কে যে ভাবে চালনা করিতে হইবে তাহা দৃঢ় ভাবেই স্থির করা আবশ্যক, সে সম্বন্ধে আমি কোনো শৈথিল্য করিতে বলি না। আমি কেবল মাত্র বলি তাহার প্রতি রাগ করিয়া কোনো কাজ না করা হয়। স্বার্থ রক্ষার জন্য প্রবল ব্যক্তিও স্বভাবত চাতুরী অবলম্বন করিয়া থাকে সে স্থলে দুর্বল পক্ষের বেলায় চাতুরী দেখিলে আমরা যে রাগ করি সে চাতুরীর প্রতি রাগ নহে দুর্বলতার প্রতিই রাগ, অমুকই চতুরতার দ্বারা আমাদের কোনো কাজ উদ্ধার করিলে প্রশংসা ও পুরস্কারের পাত্র হইত এমন স্থলে নিজেদের স্বার্থ সাধনের উদ্দেশ্যে চাতুরী প্রয়োগ দেখিলে আমাদের রাগ করিবার কারণ নাই। আমার প্রজারা নিজের বৈষয়িক স্বার্থ রক্ষার জন্য যখন চতুরতা করে তখন আমার মনে রাগ হয় না তাহাদের বেদনা ও ব্যাকুলতা বুঝিবার আমি চেষ্টা করি।

'অমুক' কে আমি তোমাদের কাছে ফিরাইয়া দিব—নিজে কোনো হুকুম দিব

না। তোমরা যেটা কর্তব্য বোধ করিবে তাহাই করিবে…কেবল মাত্র দণ্ড দিবার জন্য কিছুই করিবে না। 'অমুক' যদি প্রবল হইত তবে সে আমাকে দণ্ড দিবার জন্য চেষ্টা করিত—আমি দৈবক্রমে প্রবল হইয়াছি বলিয়াই যে ক্রোধ পরিতৃপ্তির জন্য তাহাকে দণ্ড দিব এবং সে তাহা অগত্যা বহন করিবে এ আমি সঙ্গত মনে করি না…ইতি

১৮ই আষাঢ় ১৩১৩

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

'গান্ধারীর আবেদন' কাব্যের সঙ্গে তুলনীয় এই ব্যক্তিগত চিঠি প্রমাণ করে তাঁর কবিতা তাঁর জীবনের প্রতিদিনের বিষয় ছিল। বহিরঙ্গ পোশাকী বস্তু নয়।

…"তোমার এবং ভূপেশ প্রভৃতির সঙ্গে আমার জমিদারী কাজের সম্বন্ধ ছাড়া আরো একটি বিশেষত্ব আছে আমি জমিদারিকে কেবল নিজের লাভ লোকসানের দিক হইতে দেখিতে পারি না। অনেকগুলি লোকের মঙ্গল আমাদেব উপর নির্ভর করে! ইহাদের প্রতি কর্তব্যপালনের দ্বারা ধর্মরক্ষা করিতে হইবে। এ পর্যন্ত যে সকল কর্মচারী ছিলেন তাঁহারা অনেকে কর্মপটু ছিলেন কিন্তু সকলেই আমাদিকেই পাপে লিপ্ত করিয়াছেন। তোমাদিগকে লইয়া আমি যে একটি নূতন ব্যবস্থা করিয়াছি তাহার মূল উদ্দেশ্যই আমাদের যথার্থ কর্তব্যসাধন করা। তোমরা সকলে মিলিয়া এই উদ্দেশ্যকে রক্ষা করিবে তোমাদের কর্ম ধর্ম-কর্ম হইয়া উঠিবে এবং তাহার পুণ্য তোমরা এবং আমরা লাভ করিব।"

জমিদারের কর্তব্য সম্বন্ধে তাঁর সচেতন দৃষ্টি ক্রমেই নানাভাবে নানা বিষয়ে পথ খুঁজছিল। ১৯১২ সালে জামাতাকে লেখা একটি চিঠিতে কর্মী ও চরিত্রাভিজ্ঞ কবির একটি বিশেষ পরিচয় রয়েছে:

"এই সুযোগে জমিদারির সমস্ত কাজের ভাব তোমার উপরে পড়েছে এতে আমি খুব খুশী হয়েছি। দায়িত্ব সম্পূর্ণ হাতে পেলে আপনি তোমার হাত পেকে যাবে। তুমি জমিদারীর কাজটাকে কেবল উপর উপর থেকে দেখো না। ওর যত কিছু technicalities সমস্ত বেশ ভাল করে আয়ত্ত করে নিয়ো। অর্থাৎ কোনো বিষয়েই আমলাদের মুখের কথার ওপর যেন তোমাকে নির্ভর করতে না হয়। কাজের সমস্ত খুঁটিনাটি আয়ত্ত করতে পারলে ওর মধ্যে কোথায় কি পরিবর্তন ও উন্নতি সম্ভব তা তুমি ভাবতে পারবে তা ছাড়া জমিদারীর বৈষয়িক অংশকেই একান্ত করে তুললে হবে না—তার চেয়ে বড়ো দিকটাকেও তুমি যদি খানিকটা এগিয়ে দিতে পার তাহলে আমি ভারি খুশী হব। অন্তত কালীগ্রামে এই দিক থেকে কাজ করবার ও উন্নতি দেখাবার রাস্তা আছে। সেখানে

বিভাগীয় ম্যানেজারদের সঙ্গে তোমাদের সর্বদা যোগ থাকা চাই—তারা যেন তোমাকে sympathetic বলে জানে তাদের খুব উৎসাহ দিয়ে, তাদের হৃদয় অধিকার করে, কেবল প্রভু নয়, বন্ধুর মত করে তাদের কাছ থেকে কাজ আদায় করো। অথচ তাদের প্রত্যেকের নিজের কিছু কিছু initiative থাকাও দরকার। খানিকটা পরিমাণে যাতে তারা নিজের প্রণালী অনুসারে পরীক্ষা করে দেখাতে পারে সেটুকু স্বাধীনতা দেওয়া উচিত—নইলে কেবলমাত্র আদেশ পালন করতে তারা যন্ত্র হয়ে উঠলে তাদের দ্বারা যথার্থ উঁচু দরের কাজ পাওয়া যায় না। মনে মনে আশা করে রইলুম ফিরে গিয়ে আমাদের দুই পরগনাতেই সকল বিষয়েই যথেষ্ট উন্নতি দেখতে পাব এবং দেখব তুমি সকলের হৃদয় জয় করে নিয়েছ। ইতি

৫ই জুন ১৯১২ শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বলা বাহুল্য তাঁর এ আশা সফল হয় নি। আত্মীয় পরিজন, যাঁদের দ্বারা রবীন্দ্রনাথের বিচিত্র কল্পনা কার্যকরী হতে পারত তারা কোনো ক্রমেই সেই প্রভূত জ্ঞান ও করুণার বাণী গ্রহণ করবার যোগ্য ছিলেন না। শিলাইদহের জমিদারির কাজে গিয়েই 'চিত্রায়' উল্লেখিত যুগ্ম সত্তার অস্তিত্ব অর্থাৎ "ভিতর থেকে আদর্শের প্রেরণা ও বাহিরে কর্মযোগে তার প্রকাশ" তাঁর কাছে অনিবার্য আবেগরূপে উপস্থিত হল। সেই সঙ্গে কোনো মতবাদের প্রভাবে পড়ে নয়, নিজের অভিজ্ঞতা ও অনুভবের মধ্যেই এ যুগের মহত্তম বাণী জাগ্রত হয়ে উঠল। এ দেশে সোসালিজমের ব্যাপক চর্চার বহু পূর্বে এখন কি রুশ বিপ্লবের পূর্বে জামাতা নগেন্দ্রনাথকে লেখা চিঠিগুলিতে শুদ্ধ মানবতার যে পূর্ণরূপ প্রকাশ করছে একমাত্র টলষ্টয়ের লেখাতেই তার তুলনা পাওয়া যায়:

কল্যাণীয়েষু,

তুমি সেখানকার কলেজের নিয়মিত পড়াশুনায় নিযুক্ত হয়েছ শুনে নিশ্চিন্ত হয়েছি। শিক্ষার বিষয় যেগুলি নির্বাচন করেছ সে ভালই হয়েছে। ভারতবর্ষের insect pest সম্বন্ধে সে-সমস্ত বই এখানে পাওয়া যেতে পারে সন্ধান করে তোমাকে পাঠান যাবে।

রথীকে পূর্বেই লিখেছি ভারতবর্ষে কৃষির উন্নতি করতে হলে জলসেচন সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করা চাই। সেটা তোমাদের মধ্যে কেউ একজন যেন শিক্ষা করে আসেন।

এ বৎসরে তো ভারতবর্ষে একটা ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ আসন্ন হয়ে এসেছে। শরতে যে বৃষ্টির নিতান্ত দরকার সেটা একেবারেই হল না—সেইজন্যে আমন ধান জ্বলে যাচ্ছে। এবং রবিশস্যের চাষের ব্যাঘাত ঘটেছে। বাংলাদেশের অবস্থা

ভারতবর্ষের অন্যান্য জায়গার মত তত বেশী নৈরাশ্যজনক নয়—কিন্তু তবু এখানেও আমাদের খুব ক্ষতি হয়েছে। উপরি উপরি কয়েক বছর শস্য না পাওয়াতে প্রজারা নিঃসম্বল হয়ে পড়েছে। গেল বছরে প্রজাদের অনেক টাকা ঘর থেকে দিয়ে রক্ষা করতে হয়েছে—এবারেও তাই করতে হবে। এতে বাংলার জমিদারদের দুঃসময় উপস্থিত হবে। তোমরাও দুর্ভিক্ষপীড়িত প্রজার অন্নগ্রাসের অংশ নিয়ে বিদেশে কৃষি শিখতে গেছ। ফিরে এসে এই হতভাগ্যদের অন্নগ্রাস কিছু পরিমাণেও যদি বাড়িয়ে দিতে পার তাহলে এই ক্ষতিপূরণ হয়ে মনে সান্ত্বনা পাব। মনে রেখ জমিদারদের টাকা চাষীদের টাকা এবং চাষীরাই তোমাদের শিক্ষার ব্যয়ভার নিজেরা আধপেটা খেয়ে এবং না খেয়ে বহন করছে—এদের এই ঋণ সম্পূর্ণ শোধ করবার দায় তোমাদের উপর রইল। নিজেদের সাংসারিক উন্নতির চেয়েও এইটাই তোমাদের প্রথম কর্তব্য হবে। আজকাল যে-সমস্ত বিপ্লবের সূচনা দেখা যাচ্ছে তা নিয়ে তোমাদের ভাববার দরকার নেই। কিন্তু অনাহার থেকে দেশের লোককে যথাসম্ভব বাঁচানই তোমাদের জীবনের ব্রত হবে—এতে তোমাদের নিজেদের যদি ক্ষতি হয় তাও স্বীকার করতে হবে। শহরের লোকের সঙ্গে পুলিশের যে মারামারি হয়েছে সে-সমস্ত খবর নিশ্চয়ই এতদিনে তোমাদের কাছে পুরানো হয়ে গেছে। 'বন্দেমাতরম্' কাগজে এর বিস্তারিত বিবরণ সব পাবে।

যাই হোক, সে-সব চুকে গেছে। এখন কলকাতায় কোথাও মিটিং নেই—লাল পাগড়ীওলাদের লম্বা লাঠিও ঘুচে গেছে। পরন্তু ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের মৃত্যু হয়েছে—তার মোকদ্দমা চলছিল। ইতিমধ্যে হার্নিয়ার ব্যামোয় অস্ত্রচিকিৎসা করার জন্য ক্যাম্বেল হাসপাতাল আশ্রয় করে ছিলেন। সেখানেই তাঁর মৃত্যু হল—রাজা তাকে জেলে দিতে চেয়েছিল, তার চেয়ে উপর থেকে তিনি খালাস পেলেন।

ইতি—

১২ই কার্তিক ১৩১৫

শুভানুধ্যায়ী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এই প্রসঙ্গে টলষ্টয়ের সঙ্গে তুলনা আরো একটুদূর চিন্তা করা যেতে পারে—জমিদার টলষ্টয়ও সামন্ত যুগকে অতিক্রম করেছিলেন। তাঁরও স্বকীয় অনুভবের তীব্রতার মধ্যে 'যুগবাণী' প্রকাশিত হচ্ছিল—কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর পার্থক্য মূলগত ও চারিত্রিক। টলষ্টয়ের ব্যক্তিগত জীবনে violence ও স্থূলতা ছিল, রবীন্দ্রনাথের চিন্তা অনুভূতি ও ব্যক্তিগত জীবন সুকুমার—কোথাও কারু সম্বন্ধে স্থূল হস্তক্ষেপের সম্ভাবনার অতীত। আমরা জানি রবীন্দ্রনাথ টলষ্টয়ের রচনার

পক্ষপাতী ছিলেন না—অ্যানা কারেনিনা তাঁর ভালো লাগে নি—এবং টলস্টয়ের সম্বন্ধে মাত্র একটি স্থানে 'মনীষী' বলে উল্লেখ থাকলেও বিশেষ আলোচনা পাওয়া যায় না। টলস্টয়ের রচনায় নবযুগের পদধ্বনি স্পষ্ট ও অব্যর্থ, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর মন ডগমা-কণ্টকিত, পাপবোধে শৃঙ্খলিত, মানুষের আত্মশক্তির চেয়েও ঈশ্বরের প্রতি নির্ভরশীল। অপরদিকে রবীন্দ্রনাথ উত্তোরোত্তর সর্ববিধ ডগমা থেকে মুক্ত হয়েছেন—ধর্ম, সমাজ ও রাষ্ট্রনীতির কোনো প্রচলিত বিশ্বাস, শাস্ত্রবাক্যের অমোঘতা বা পাপবোধ তাঁর মুক্তিপথের বিঘ্ন হতে পারে নি—বিশ্বাস থেকে যুক্তিতে ও ঈশ্বর থেকে মানুষে তিনি আস্থা স্থাপন করেছেন—বর্তমান যুগের এই বৈশিষ্ট্য রবীন্দ্র-চিন্তায় সর্বত্র প্রকাশ পেয়েছে। যদিও রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প 'বিচারক' ও টলস্টয়ের 'রেসারেক্‌শন' উপন্যাসের প্লট একই—এবং রবীন্দ্রনাথের গল্পটি ছয় বৎসর পূর্বে লেখা, উল্টোটি হলে অবশ্য আমবা মনে করতাম রবীন্দ্রনাথই টলস্টয়ের কাছে পেয়েছেন, অবশ্য টলস্টয়ের তো সেটি জানার সুযোগ ছিল না।

জমিদারির ক্ষেত্র থেকে লেখা চিঠিগুলির মধ্যে সবচেয়ে মূল্যবান ইন্দিরা দেবীকে লেখা ছিন্নপত্রাবলী—তেব বছব বয়সের একটি বালিকা, যিনি সম্পূর্ণ শহরের পরিবেশেই লালিত, তাঁর কাছে লেখা চিঠিগুলিতে যা লেখা হচ্ছে তাতে ভরে উঠছে হাল-লাঙ্গল-গরু-গোয়ালওলা মানুষদের দৈনন্দিন দুঃখ-দুর্দশা ও সুখ-দুঃখকাতর জীবনস্পন্দন। এর থেকে রবীন্দ্র-চরিত্রের কয়েকটি দিক স্পষ্ট হয়—উপলক্ষ্য যেমনই হোক, তা উপলক্ষ্যমাত্র। তিনি নিজের ভিতরের তাগিদেই আপনাকে প্রকাশ করেন—আর এক, কাউকেই তিনি ছোট বলে ছোট করে দেখেন না; বরঞ্চ ছোটকে বড় করে তোলবার জন্যই তাঁর ব্যাকুলতার অন্ত নেই।

অন্যান্য প্রতিভাধর ব্যক্তিদের মত তিনি আত্মীয় স্বজনের প্রতি উদাসীন নন—চারপাশের সকলকেই তিনি নিজের চিন্তা, কর্ম ও ভাবের সঙ্গীরূপে পেতে চান। মৃণালিনী দেবীকে লিখছেন: "আজকাল আমার মনের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা এই—আমার জীবন সহজ এবং সরল হোক···আমাদের সংসারযাত্রা আড়ম্বরশূন্য ও কল্যাণপূর্ণ হোক, আমাদের অভাব অল্প, উদ্দেশ্য উচ্চ, চেষ্টা নিঃস্বার্থ এবং দেশের কার্য আপনাদের কাজের চেয়ে প্রধান হোক। যদি বা ছেলেমেয়েরা আমাদের আদর্শ থেকে ভ্রষ্ট হয়ে ক্রমশঃ দূরে চলে যায়, আমরা দু'জনে শেষ পর্যন্ত পরস্পর মনুষ্যত্বের সহায় এবং সংসার-ক্লান্ত হৃদয়ের একান্ত নির্ভরস্থল হয়ে জীবনকে সুন্দরভাবে অবসান করতে পারি।···

সেইজন্যই আমি কলকাতায় স্বার্থ-দেবতার পাষাণ মন্দির থেকে তোমাদের দূরে নিভৃত পল্লীগ্রামের মধ্যে নিয়ে আসতে এত উৎসুক হয়েছি।"···

জোড়াসাঁকোর সংস্কৃত পরিবেশ ও আনন্দ-উৎসব-মুখরিত আত্মীয়পরিজনে সমাবৃত সুন্দর সংসার ছেড়ে, মৃণালিনী দেবী গ্রামের একঘেঁয়ে নির্জন জীবনে যেতে উৎসুক ছিলেন না—সেজন্য শেষ পর্যন্ত শিলাইদহের বাস তুলে দিতে হল।

জামাতা পুত্র ও পরিবারের নানাজনের মধ্যেই দেশের কাজে আত্মনিবেদনের প্রেরণা দিতে ও বৃহত্তর মানবসমাজের আহ্বান শোনাতে চেষ্টা করেছিলেন এবং বহু ক্ষেত্রে বিফল হয়ে মর্মান্তিক দুঃখ ভোগ করেছিলেন। সংসারে বার বার তাঁর স্নেহ লাঞ্ছিত, শুভ ইচ্ছা প্রত্যাখ্যাত হয়ে দুঃখের তৃণগুলি মর্মভেদ করে দিয়েছে, তারই ফলে সৌরভের মত উত্থিত হয়েছে স্বর্গগামী সঙ্গীত :

"আমার এ ধূপ না পোড়ালে
গন্ধ কিছুই নাহি ঢালে,
আমার এ দীপ না জ্বালালে
দেয় না কিছুই আলো।"

ছিন্নপত্র ও রবীন্দ্রদর্শন

রবীন্দ্রনাথ ডায়েরী লেখার পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি মনে করতেন কবির ব্যক্তিগত দৈনন্দিন জীবনের ঘটনা ও বৃত্তান্ত-বিবরণে সাধারণের কোনো প্রয়োজন নেই। সকল কাব্যই কবির প্রকৃত জীবনী। কাব্যের ভিতর দিয়ে কবির অন্তর্জীবন যেমনভাবে প্রকাশিত, ভবিষ্যৎকালের জন্য সেইটুকুই যথেষ্ট। সোনার তরীতে ফসলেরই স্থান আছে, ব্যক্তির নেই। তথাপি পরবর্তীকালের মানুষ নৈর্ব্যক্তিক কবিত্বরসটুকু নিয়েই সন্তুষ্ট হয় না। মানুষকে চায়—তার মধ্যে কিছু অংশ কৌতূহল ‑ গল্পের লোভ হলেও কিছুটা সত্যানুসন্ধান। বর্তমানে রবীন্দ্র-জীবন নিয়ে এই কৌতূহল মাঝে মাঝে সত্যের সীমা লঙ্ঘন করছে এবং কৌতূহলীর আপন বুদ্ধিবৃত্তি ও মনোবৃত্তির ছাঁচে ঢালা বিবিধ রবীন্দ্র-জীবনীব উপকরণ তৈরী হচ্ছে। কিন্তু কল্পনার ঘোড়দৌড় না করেও' রবীন্দ্র-জীবনীর উপকবণ সুলভ ও পর্যাপ্ত হয়ে আছে রবীন্দ্রনাথের পত্রসাহিত্যে। তার মধ্যে 'ছিন্নপত্র' প্রধান।

পরবর্তী দীর্ঘজীবনে রবীন্দ্রনাথ যত বিচিত্র কর্মে চিন্তায় মননে পূর্ণ হয়ে উঠেছিলেন, তার সম্পূর্ণ এবং সুগঠিত রূপ প্রতিফলিত হয়েছে এই চিঠিগুলিতে—মনে হয় এই সময়ে তিনি যে পূর্ণতালাভ করেছিলেন তাকে আর অতিক্রম করতে হয় নি। এই সময়কার কোনো চিন্তাই পরবর্তীকালে পরিত্যাগ করেন নি, শুধু পূর্ণতর করেছেন মাত্র।

রবীন্দ্র-সাহিত্য ও জীবনের বিচিত্র এবং বহুমুখী দিক, তাঁর কর্মেরও বহুমুখী গতি ; তবু বৈচিত্র্যময় কর্মপ্রবাহের মধ্যে চিন্তার যে অন্তঃসলিলা সামঞ্জস্য আছে তার ফলে প্রত্যেকটি কর্ম আর একটির দ্বারা পরিপূরিত হয়ে সম্পূর্ণ হয়েছে। বস্তুত বিভিন্ন বিপরীতগতি ভাবের সমন্বয়সাধনে, আদর্শ মানবের উদ্বোধনেই রবীন্দ্র-সাধনা নিয়োজিত। রবীন্দ্রনাথ কবি। যদিও তিনি গায়ক, সুরকার, শিল্পী, বক্তা, নাট্যকার, অভিনেতা, সমাজ-সংস্কারক, ইত্যাদি, ইত্যাদি, কিন্তু, তা সত্ত্বেও তাঁর প্রধান পরিচয়—তিনি কবি। তিনি নিজেও বারে বারেই বলেছেন, তিনি সাধক নন, গুরু নন, তপস্বী নন, তিনি মানুষের কবি।

"আমি পৃথিবীর কবি, যেথা তার যত উঠে ধ্বনি
আমার গানের সুরে সাড়া তার জাগিবে তখনি।"

সেই পৃথিবীর কবির কবিত্বের পটভূমিকা কি ? কোন্‌খান থেকে সে পেয়েছে প্রেরণা, কোন্ আনন্দে তার উৎসারণ? কোন্ লোকে তার ব্যাপ্তি? স্বর্গ না

মর্ত্য ? জ্ঞানময় চিৎলোক না সূর্যালোকিত সাবিত্রী পৃথিবী ? এ নিয়ে তর্ক আছে —অভিযোগও আছে যে, তিনি বাস্তববাদী নন—বস্তুজগতের সঙ্গে সম্পর্কচ্যুত, প্রাত্যহিক সংসার ও সমাজের দ্বন্দ্ব থেকে বিমুখ—কল্পলোকের রঙ্গীন পাখা তুলে স্বরচিত মনোলোকে তাঁর ভ্রমণ। তিনি নিজে কিন্তু সে কথা স্বীকার করেন না। পরিহাস করে বলেন—

"কাব্য পড়ে যেমন ভাবো কবি তেমন নয় গো,
চাঁদের পানে চক্ষু তুলে রয় না পড়ে নদীর কূলে"…

কিন্তু একথাও অস্বীকার করবার উপায় নেই যে ঐ নদীকূলেই কবির জীবনের সবচেয়ে বড় অধ্যায়টি রচিত হয়েছিল। চারপাশের সুখ-দুঃখ-জীবনসংঘাত থেকে বিচ্ছিন্ন, চাঁদের পানে চক্ষু তুলে রাখা নয়; নদীর কলধ্বনি মেশান ছোট ছোট মানুষের জীবনের কলগানই কবির জীবনের সেই বৃহৎ অধ্যায়ের ভূমিকা।

পদ্মাতীরের জীবনেব পুঙ্খানুপুঙ্খ সংবাদ তাঁর চিঠিপত্রে আছে। নানা জনের কাছে ঐ সময়ে তিনি নানা প্রসঙ্গে চিঠি লিখেছেন, তার মধ্যে ছিন্নপত্রে আমরা সেই পদ্মাতীরের সীমাহীন সৌন্দর্যের অলোকসুধা পান করে কবির অন্তরের গভীর অনুভবের সঙ্গে আজো যুক্ত হই। প্রথম আটখানি ছাড়া ছিন্নপত্রের আর সমস্ত চিঠিই ইন্দিরা দেবীচৌধুরাণীকে লেখা। এই চিঠিপত্রগুলির রচনাকাল আট নয় বৎসরব্যাপী। কবির বয়স তখন পঁচিশ থেকে তেত্রিশের মধ্যে এবং ইন্দিরা দেবীর বয়সও বার থেকে যথাক্রমে তদূর্ধ্বে। উন্মুক্ত প্রকৃতির মাঝখানে থেকে শহর বাসিনীকে লেখা এই চিঠিগুলির মধ্যে কবির নিগূঢ় স্বরূপ যেমন অভিব্যক্ত এমনটি বোধ হয় আর কোথাও হয় নি। বিশেষত ব্যক্তিগত জীবনের সুখ-দুঃখ কাব্যে ব্যক্তিগতভাবেই প্রকাশ করা তাঁর স্বভাব ছিল না, যখন জীবনভোগের মন্থনোদ্ভুত রস সকলের হয়ে উঠত তখনই তা কাব্যের যোগ্য বলে সাহিত্যে স্থান পেত। তাঁর জীবনটি স্পষ্টভাবে তাই কাব্যে পাই না। তিনি জানতেন তাঁর সুখ-দুঃখ তাঁরই, কিন্তু সেই সুখ-দুঃখ ভেদ করে যে ভাব উঠছে, তা সকলের। সেজন্য কাব্যের মধ্যে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনকে খুঁজতে যাওয়া কঠিন, তাতে পদে পদে ভুলের সম্ভাবনা। কিন্তু তাঁর জীবন কী করে কাব্য হয়ে উঠছিল, সৃষ্টির সেই আশ্চর্য অভিব্যক্তির একটি স্পষ্ট ছবি একমাত্র ছিন্নপত্রেই আমরা দেখতে পাই। পদ্মার ঘাটে ঘাটে, তার অগাধ বিস্তৃত চরের নিঃশব্দ নিঃসঙ্গ সৌন্দর্যের উৎসারণের মধ্যে বসে, কখনো বা জমিদারির কুঠিবাড়িতে সরল সহজ গ্রাম্য মানুষদের আত্মীয়তায়, বিচিত্র মানুষের সান্নিধ্যে থেকে এই চিঠিগুলিতে কবি তাঁর প্রতিদিনের ভাবনা-চিন্তা সুখ-দুঃখ রহস্য-কৌতুকের জাল বুনেছেন। প্রকৃতির সঙ্গে এমন

আত্মিক যোগের সহজ সরল প্রকাশ চিঠি ছাড়া যেন আর কোথাও হতে পারত না। কবিতায় কবিত্বের মধ্যে যদি বা কিছু ছদ্মবেশ থাকে চিঠি পত্রে তা নেই প্রত্যহের সুখ-দুঃখের সঙ্গে জড়িয়ে আছে সকাল-সন্ধ্যার মাধুরী। কি আশ্চর্য ভালোবাসায় প্লাবিত করে তিনি দেখছেন এই বসুমতী বসুন্ধরার রূপ! কবি নিজেই এই চিঠি লিখতে লিখতে লিখছেন—

"আমাকে একবার তোর চিঠিগুলি দিস, আমি কেবল ওর থেকে আমার আনন্দসম্ভোগগুলি টুকে নেব। কেননা, যদি দীর্ঘকাল বাঁচি তাহলে এক সময় নিশ্চয় বুড়ো হয়ে যাব, তখন এই সমস্ত দিনগুলি স্মরণের এবং সান্ত্বনার সামগ্রী হয়ে থাকবে, তখ· পূর্বজীবনের সমস্ত সঞ্চিত সুন্দর দিনগুলির মধ্যে তখনকার সন্ধ্যার আলোকে ধীরে ধীরে বেড়াতে ইচ্ছে করবে।"

এখানে কবির বক্তব্যের মধ্যে তাঁর ভবিষ্যৎ বাণীটি অবশ্য সত্য হয়নি, অর্থাৎ যদিচ তিনি দীর্ঘদিন বেঁচেছিলেন তবু বুড়ো হননি। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাঁর চিত্ত ছিল নবীন—প্রকৃতির সৌন্দর্যলীলার রসসম্ভোগে চির অতৃপ্ত। কবির অনুরোধ অনুসারে শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবী চিঠিগুলি থেকে ব্যক্তিগত ও পারিবারিক বিষয় বাদ দিয়ে তাঁকে উপহার দিয়েছিলেন। তা থেকেও কবি কতকগুলি সম্পূর্ণই বর্জন করেন, কতকগুলি থেকে বাছাই করে কিছু কিছু অংশ 'ছিন্নপত্র' নামে প্রকাশিত হয়। পত্রগুলি সম্পূর্ণ নয় বলেই 'ছিন্নপত্র' নাম। সম্প্রতি কবি কর্তৃক পরিত্যক্ত সেই অংশগুলি ও চিঠিগুলি ছাপা হওয়ায় পত্রসাহিত্যের মধ্যেই যে রবীন্দ্র-জীবনদর্শনের গভীরতম সত্যগুলি প্রত্যক্ষবৎ প্রকাশিত হয়ে রয়েছে তা নিঃসংশয়ে জানা গেছে। এই পত্রগুলির মধ্যে কবির পারিবারিক ও গার্হস্থ্য জীবনের যে ছবি আমরা পেয়েছি এমন আর কোথাও নেই। স্বজনবৎসল গৃহী, কর্তব্যপরায়ণ সেই স্নেহনিমগ্ন পিতৃহৃদয়কে না দেখলে তাঁকে সম্পূর্ণ চেনা হয় না। বিশ্ব এবং ঘর, আকাশ ও নীড়, ভবের সঙ্গে ভাবের মিলনে দেখি তাঁর মানবিক পূর্ণতা।

নানাদিক-প্রসারী ভাব ও বিপুল কর্মোদ্যমের সঙ্গে তিনি সংসারী এবং গৃহস্থ এ কথাটি শুনতে সামান্য হলেও একেবারেই সামান্য নয়। জগতের ইতিহাস আলোচনা করলে রবীন্দ্রনাথের সমতুল্য প্রতিভার সংখ্যা বেশী নয়, তাঁর কাছাকাছি আসতে পারে এমন সংখ্যাও কম। তবু মোটামুটি আমরা যা জানি—এরকম প্রতিভাদীপ্ত কবি, শিল্পী বা সুরকার প্রায় কেউই তাঁদের আত্মীয়-পরিজনকে, সংসারকে, গৃহকে শান্তি-স্নেহ ও কর্তব্যের এমন পূর্ণআনুগত্য দিতে পারেন নি। এমন সহৃদয় ভালোবাসায় আত্মীয়পরিজনের কাছে সত্য হয়ে উঠতে পারেন নি। অধিকাংশ প্রতিভার জীবনই প্রতিভার দীপ্তিকে জ্বালাবার উপযুক্ত তেল সংগ্রহ

করে আনেনি বা আধারটি উপযুক্ত নয়—তাই জ্বলতে সুরু করেই তারা দাবদাহে চতুর্দিক জ্বালিয়ে দিয়েছে, চারপাশে বিক্ষোভের তরঙ্গ তুলেছে, কখনো নিজেও ডুবে মরেছে—কেন এমন হয়? কারণ, তখন তাঁদের অবস্থা—"পাগল হইয়া বনে বনে ফিরি আপন গন্ধে মম"—সেই সুগন্ধের সংবাদ, সেই অলৌকিক আনন্দের দুঃসহতার খবর তাদের সঙ্গীরা জানে না, জানে না তাদের ভাই-বন্ধু, পিতা-মাতা, স্বামী-স্ত্রী, তাই কেউ তাদের সঙ্গে সাম্য রাখতে পারে না; তখন তারা উড়িয়ে দেয় পুড়িয়ে দেয়, সংসার ছারখার করে এবং সেই মত্ততার দাবানলে তারা নিজেদের শক্তির প্রবলতাকে, প্রাণের বেগকে অনুভব করে। তাই অধিকাংশ শিল্পীর জীবনই সাধারণ মানুষের জীবনের মত, সুস্থ স্বাভাবিক বা নিস্তরঙ্গ হতে পারে না। কারণ তাদের যে—

"নিমেষ তরে ইচ্ছা করে বিকট উল্লাসে।
সকল টুটে যাইতে ছুটে জীবন-উচ্ছ্বাসে"—

এই ভাব রবীন্দ্রনাথের জীবনেও অবশ্যই বহু মুহূর্তে প্রবলভাবে এসেছে, যখন ক্ষুদ্র গৃহকোণ তাঁকে ধরে রাখতে পারে নি—যখন তিনি তীব্রভাবে অনুভব করেছেন—"থাকিতে নারি ক্ষুদ্র কোণে আম্রবনছায়ে। সুপ্ত হয়ে লুপ্ত হয়ে গুপ্ত গৃহবাসে"—যখন তাঁর চিত্ত প্রাত্যহিকতার নাগপাশ ছিঁড়ে ছুটে যেতে চেয়েছে—কিন্তু নদী যেমন কখনো কখনো উচ্ছ্বসিত হলেও তীরের বাধার মধ্যে নিজেকে সংহত করে দেশদেশান্তরে কল্যাণ বহন করে নিয়ে যায় তেমনি তাঁর বহুমুখী প্রতিভার দীপ্ত তীব্র বেগ গভীর সাধনায় ও চারপাশের মানবজীবনের প্রতি মমত্ব ও সমবেদনায় সংহত হয়ে কল্যাণ ও শান্তি বহন করে দীর্ঘদিন দীর্ঘ পথ চলেছে। প্রাণের উচ্ছ্বাসের সঙ্গে অপ্রমত্ততা, অনুভবের তীব্রতার সঙ্গে সামঞ্জস্যবোধের আশ্চর্য সমন্বয় 'ছিন্নপত্রের পত্রে পত্রে প্রকাশিত। এই অল্পবয়সের নদীতীরের জীবন থেকেই আমরা দেখি কেমন করে সাধক দেবেন্দ্রনাথের পুত্র কবি রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রবল জীবনোচ্ছ্বাসকে নানা মানব সম্বন্ধের ও কর্মের সীমারেখার মধ্যদিয়ে সাবধানে সংহত করে প্রবাহিত করেছেন—সেই কাজ এই জীবনশিল্পীর সবচেয়ে বড় রচনা যে, তিনি মহত্তম ও বৃহত্তম কবি হয়েও, বিশ্বের মানুষ হয়েও, আদর্শ পুত্র, আদর্শ স্বামী, আদর্শ পিতা হয়েছিলেন। যখন তিনি বিশ্বকে ঘরের মধ্যে আহ্বান করেছিলেন, ঘরকে প্রসারিত করেই করেছিলেন; সেজন্য ঘরকে ভেঙ্গে চুরমার করেন নি। এ কথাটি সামান্য, কিন্তু জগতের অন্যান্য শিল্পীর জীবন আলোচনা করলে আমরা জানি, এ সামান্য নয়—এবং এই জীবনসাধনাই তাঁর দীর্ঘদিনব্যাপী সকল কাব্য-সৃষ্টির উৎস। রবীন্দ্র-জীবনীর পাঠক জানেন অতি অল্পবয়সে অর্থাৎ ত্রিশ বৎসর মাত্র বয়সে পিতার

আদেশে তিনি জমিদারির কাজের ভার নিয়ে তাঁর সেই সদ্য-উদ্ভিন্ন অপূর্ব-যৌবনে পূর্ববঙ্গের গ্রামের নিঃসঙ্গ জীবনে প্রবেশ করেন। 'রবীন্দ্র-জীবন-প্রবাহে' আছে—"এইবার সাহিত্যজীবনের বিচিত্র মাধুর্যের মধ্যে হঠাৎ আসিয়া পড়িল বিপুল জমিদারির হিসাবপত্র, দলিল, দাখিলা, নথিপত্র ও হাতচিঠা···কিন্তু রবীন্দ্রনাথ আশ্চর্যভাবে এই নূতন কর্তব্যকে জীবনের সঙ্গে মানাইয়া লইলেন, শুধু মানাইলেন না, নিপুণভাবে সম্পন্ন করিতে লাগিলেন।" রবীন্দ্রনাথের জীবন ও কাব্যের উপর এই নূতন কাজের প্রভাব ব্যাপক ও গভীর। জীবনের নানা দিক্‌কে সংহত করে সামঞ্জস্য সৃষ্টির ক্ষমতা ও কর্তব্য নিপুণভাবে সম্পন্ন করবার জন্য যে দৃঢ়তা ও নিষ্ঠার প্রয়োজন তার মধ্যেই আমরা তাঁর উত্তরজীবনের বিপুল সফলতার কারণ দেখতে পাই।

প্রথম যৌবনের নিবিড় রসানুভূতিতে মগ্ন এই পত্রসাহিত্য—কিন্তু কবির মনো-জগতের আনন্দলীলার এ-রকম অভিব্যক্তি সাধারণত ঐ বয়সের শিল্পীর কাছে প্রত্যাশা করা যায় না। কোথাও ব্যগ্র উন্মাদনা বা উচ্ছ্বাস তাঁর সুচিন্তিত অথচ রসস্নিগ্ধ ভাবময় চিত্তসমুদ্রকে তোলপাড় করে তুলছে না ভবিষ্যৎকালে তাঁর মধ্যে যে ঋষি, মনীষির আবির্ভাব হয়েছিল তারই সাধনার আসন সেদিন পাতা হচ্ছিল বাংলাদেশের নদীবাহিত উপলসঙ্কুল চরে, সোনার ফসলভরা প্রান্তরে।

ছিন্নপত্রের মধ্যে তিনটি বিশেষ ধারা আমরা পাই, একটি বাংলাদেশের গ্রামের মানুষের ঘনিষ্ঠ ঘরোয়া ছবি, আর একটি বাংলাদেশের সৌন্দর্যময়ী প্রকৃতি। তৃতীয়—এই দুই-এর সঙ্গমে উদ্ভূত কবির মনন ও তত্ত্ববাণী। এই তিন ভাব একেবারে ওতপ্রোত হয়েছিল তখনকার জীবনে এবং পরবর্তীকালের কবির জীবন-সাধনার ও কর্মসাধনার ভূমিকা রচিত হয়েছিল এই ভাবধারার মধ্যে। সেজন্য রবীন্দ্র-সাহিত্যের মধ্যে জীবন ও জীবনের মধ্যে সাহিত্যবেদন কেমন করে প্রবেশ করেছে এইখানেই তা পরিষ্কার জানা যায়—এমন কি, বহু কবিতার ভাব, গূঢ় অর্থ, বিশেষ ব্যঞ্জনা এবং কোন্ অভিজ্ঞতা থেকে তাদের জন্ম তাও এখানে জানা যায়। কলকাতায় অভিজাত ঠাকুর পরিবারের শিক্ষা-সংস্কৃতিতে লালিত হয়ে গ্রামের জীবনের সঙ্গে অপরিচিত থাকলেও তাঁর কাব্যজীবন হয়ত প্রতিভার আপন বেগে প্রকাশ পেতই, কিন্তু তাঁর কর্মজীবন—যে কর্মের যোগে জ্ঞানের পূর্ণতা, তা এমন করে প্রকাশিত হয়ে উঠত কি না সন্দেহ।

বাংলাদেশের খড়ে-ছাওয়া মাটির ঘরের বড় কাছাকাছি এসেছিলেন কবি। পদ্মার জলে ভাসছে তাঁর নৌকা, তিনি দেখছেন দু'পাশের জীবনলীলা—কখনো বা কল্পনায় একেবারে তাদের সুখ-দুঃখ ভোগ করছেন। কোন মেয়ে শ্বশুরবাড়ি যেতে

জলভরা চোখে নৌকায় উঠল, তার ভবিষ্যৎ কল্পনা গল্পের বীজ বুনছে। কোথাও বা শীতকালের ভোরে ক্রন্দনরত শিশুকে ঠাণ্ডা জলে স্নান করাতে করাতে চড়-চাপড় মারছে ধৈর্যহীন জননী, শীতার্ত শিশুর সেই আর্তস্বর আর্ত করে তুলেছে তার সুন্দর সকাল—"একে এই ভোরের শীতে কনকনে জলে চান তার পরে আবার রাক্ষসীর হাতের মার।" চিঠিগুলি পড়তে পড়তে গ্রামের দৈনন্দিন জীবনের আলো-ছায়া আজও স্পষ্ট হয়ে ওঠে—কি আশ্চর্য সহৃদয় দৃষ্টিপাতে কবি দেখেছেন সুখ-দুঃখমাখা, হাসিকান্নাভরা মানুষের বড় ভালোবাসার জীবন। আর দেখেছেন নদী খাল বিল তাল নারিকেলকুঞ্জ, অবারিত প্রান্তরে সূর্যোদয়ের ও অস্তের সমারোহ, মাথার উপরে স্তব্ধ নীলাকাশের জ্যোতির্বিকীর্ণ মহোৎসব—মানুষ ও প্রকৃতি দুই মিলেছে এক আনন্দসঙ্গমে, সেই আনন্দে মগ্নচৈতন্য কবির জীবনভোগ—ইয়োরোপীয় কবি ও শিল্পীদের চেয়ে কত পৃথক। অধিকাংশ সময়েই সম্পূর্ণ একাকী—কোনোরকম পার্থিব ভোগবিলাসশূন্য, দু'একখানি বই মাত্র সঙ্গী। গ্রামের ঘাটে বাঁধা বোটে মাঠের ধারে ক্ষেতের পাশে জ্যোৎস্নাপ্লাবিত রাত্রে চলেছে কবির জীবনভোগের রসোৎসব। এই জীবন ভোগের জন্য অর্থের প্রয়োজন নেই। বিলাস দ্রব্যের প্রয়োজন নেই—এমন কি সঙ্গীর প্রয়োজন নেই এই রসোৎসবে। তিনি লিখেছেন —এই সুন্দর শরৎ-প্রভাতের সঙ্গে, এই জ্যোতির্ময় শূন্যের সঙ্গে আমার এই যে চিরকালের নিগূঢ় সম্বন্ধ সেই সম্বন্ধেরই প্রত্যক্ষ ভাষা এই বর্ণ গন্ধ গীত।" এইসব চিঠি থেকে আমরা বুঝতে পারি কেন বৈরাগ্যসাধনে মুক্তির পথ তাঁর নয়—স্পষ্ট হয়ে ওঠে সেই অতি প্রসিদ্ধ পঙ্‌ক্তি দু'টির অর্থ—যা কিছু আনন্দ আছে দৃশ্যে গন্ধে গানে, তোমার আনন্দ রবে তারি মাঝখানে।"

মানুষ ও প্রকৃতির বিচিত্র লীলার দর্শক কবির অন্তর্লোকে চলেছে গভীর রসনিমগ্ন মনন—চোখে যা দেখছেন, বাইরে যা ঘটছে তাকে ছাড়িয়ে দেখছেন তার অন্তরতর সত্য। গভীর চিন্তার পথ বেয়ে উত্তীর্ণ হচ্ছেন নিগূঢ় জ্ঞানলোকে। কিন্তু তার ফলে তাঁর দেখাটা অস্পষ্টও হচ্ছে না, বাস্তবতাভ্রষ্ট হয়ে কল্পনার বিষয়ে পরিণতও হচ্ছে না। দার্শনিকের উদাসীন দৃষ্টিভঙ্গীও তাঁর নয়। সুখ-দুঃখকাতর মানুষের প্রতি স্নেহে প্রেমে সমবেদনায় পূর্ণ সে দৃষ্টিপাত। এক জায়গায় লিখেছেন—

"আমার কাছে এইসব সরল বিশ্বাসপরায়ণ অনুরক্ত প্রজাদের মুখে একটি কোমল মাধুর্য আছে। বাস্তবিক এরা যেন আমার দেশজোড়া এক বৃহৎ পরিবারের লোক। এই সমস্ত নিঃসহায় নিরুপায় নিতান্ত নির্ভরপর সরল চাষাভুষোদের আপন লোক মনে করতে একটা সুখ আছে—এরা অনেক দুঃখ অনেক ধৈর্য সহকারে

সয়েছে, তবু এদের ভালোবাসা কিছুতে ম্লান হয়নি। এদের উপর যে আমার কতখানি শ্রদ্ধা হয় আপনার চেয়ে যে এদের কতখানি ভালো মনে হয় তা এরা জানে না।"

কখনো বা দেখি এক গভীর মানব মূল্য বোধ সকলের সঙ্গে একাত্ম ভাব এনেছে, কবি দেখছেন মানুষে মানুষে ভেদটা বাইরের। কোনো অহমিকা তাঁর দৃষ্টির ও ধারণার স্বচ্ছতাকে ম্লান করতে পারেনি।· তিনি বলছেন—

মানুষ ও প্রকৃতির বিচিত্র লীলার দর্শক কবিব অন্তর্লোকে চলেছে গভীর রসনিমগ্ন মনন—চোখে যা দেখছেন, বাইরে যা ঘটছে তাকে ছাড়িয়ে দেখছেন তার অন্তরতর সত্য। গভীর চিন্তার পথ বেয়ে উত্তীর্ণ হচ্ছেন নিগূঢ় জ্ঞানলোকে। কিন্তু তার ফলে তাঁর দেখাটা অস্পষ্টও হচ্ছে না, বাস্তবতাভ্রষ্ট হয়ে কল্পনার বিষয়ে পরিণতও হচ্ছে না। দার্শনিকের উদাসীন দৃষ্টিভঙ্গীও তাঁর নয়। সুখ-দুঃখকাতর মানুষের প্রতি স্নেহে প্রেমে সমবেদনায় পূর্ণ সে দৃষ্টিপাত। এক জায়গায় লিখেছেন—

"আমার কাছে এইসব সরল বিশ্বাসপরায়ণ অনুরক্ত প্রজাদের মুখে একটি কোমল মাধুর্য আছে। বাস্তবিক এরা যেন আমার দেশজোড়া এক বৃহৎ পরিবারের লোক। এই সমস্ত নিঃসহায় নিরুপায় নিতান্ত নির্ভরপর সরল চাষাভুষোদের আপন লোক মনে করতে একটা সুখ আছে—এরা অনেক দুঃখ অনেক ধৈর্য সহকারে সয়েছে, তবু এদের ভালোবাসা কিছুতে ম্লান হয়নি। এদের উপর যে আমার কতখানি শ্রদ্ধা হয়, আপনার চেয়ে যে এদের কতখানি ভালো মনে হয় তা এরা জানে না।"

কখনো বা দেখি এক গভীর মানবমূল্যবোধ সকল মানুষের সঙ্গে একাত্মভাব এনেছে, কবি দেখছেন মানুষে মানুষে ভেদটা বাইরের। কোনো অহমিকা তার দৃষ্টির ও ধারণার স্বচ্ছতাকে ম্লান করতে পারেনি। তিনি বলছেন—

"প্রজারা যখন সম্ভ্রমকাতরভাবে দরবার করে এবং আমলারা বিনীত করযোড়ে দাঁড়িয়ে থাকে," তখন কিন্তু চারিদিকের মানুষের উপর ক্ষমতাপ্রকাশের সুযোগে তাঁর ঔদ্ধত্য হয় না, অহমিকা বাড়ে না। তিনি বলেন—"তখন আমার মনে হয় এদের চেয়ে আমি এমনই কি মস্ত লোক···অন্তরের মধ্যে আমিও যে এদের মত দরিদ্র সুখ-দুঃখকাতর মানুষ, পৃথিবীতে আমারও কত ছোট ছোট বিষয়ে দরবার, কত সামান্য কারণে মর্মান্তিক কান্না, কত লোকের প্রসন্নতার উপর জীবনের নির্ভর—এইরকম ছেলেপিলে গরু লাঙ্গল ঘরকন্নাওলা সরলহৃদয় চাষাভুষোরা আমাকে কি ভুলই জানে, আমাকে এদের সমজাতির মানুষ বলেই জানে না—সেই ভুলটি রক্ষা করবার জন্য কত সরঞ্জাম রাখতে আড়ম্বর করতে হয়।"

বাংলাদেশের মাটির মানুষ যারা হাল লাঙ্গল গরু গোয়াল চাষ খামার নিয়ে

ব্যস্ত—যারা শিক্ষিত নয়, সুসভ্য নয়, ধনী নয়, মার্জিত নয়, অক্ষম অসহায় মাটির মানুষ, তাদের মূঢ় মূক হৃদয়ের ভাষা পৌঁছেচে কবির অন্তরে, কবি তাদের সরল হৃদয়ের মধ্যে দেখেছেন স্নেহের অমৃত, শ্রদ্ধা ও ভক্তির সৌন্দর্য। তাঁর আপন হৃদয়ও বিগলিত হয়ে পৌঁছচ্ছে তাদের হৃদয়ের দরজায়। এক একটি ঘটনা এমন প্রভাব রেখেছে যে, মৃত্যু পর্যন্ত সেগুলি স্মরণ করেছেন—

"এখানকার প্রজাদের উপর বাস্তবিক মনের স্নেহ উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে, এদের সরল ছেলেমানুষের মত আব্দার শুনলে মনটা আর্দ্র হয়ে ওঠে যখন তুমি বলতে তুই বলে, যখন আমাকে ধমকায় ভারি মিষ্টি লাগে।"

মানুষের প্রেম তিনি কেমন করে অন্তরে গ্রহণ করেছেন এই ছিন্নপত্রের মাধ্যমেই আমরা তা যথার্থরূপে বুঝতে পারি। যাদের কথা ভেবে তাঁর চিত্ত স্নেহে ও শ্রদ্ধায় পূর্ণ হয়েছে, মনে গভীর সাম্যবোধের জন্ম হয়েছে, সেই চাষী মজুরদের কাছে সে কথা পৌঁছতে পারেনি, কেবলমাত্র পত্রসাহিত্যেই ধরা আছে সেই আশ্চর্য ইতিহাস আর আছে তাঁর পরবর্তী জীবনের কর্মসাধনায়। তিনি যে মানুষের কবি, সকল উপাধিহীন মানুষের কবি—শুধু শিক্ষিতের নয়, অভিজাতের নয়। তাঁর কাব্য যদিও সব মানুষের কাছে পৌঁছতে পারল না, তবু একথা সত্য করে তুলল তারাই যারা নিরক্ষর দরিদ্র "যারা কেহ নয়, যারা কিছু নয় পৃথিবীর ইতিহাসে।"

কবি গিয়েছেন জমিদারীর তত্ত্বাবধান করতে, সে জমিদারী তাঁর একলার নয়, তাঁর যা ইচ্ছা তা করতে পারেন না—তাই চিঠিতে তাঁর মনের সাধটি লিখছেন— "আমি যদি এদের একলা জমিদার হতাম তবে এদের খুব সুখে রাখতাম।" মানুষকে সুখে রাখবার এই ইচ্ছাটি যে কত সত্য কত আন্তরিক তা প্রমাণ হল পরবর্তীকালের সুদীর্ঘ নিরলস কর্মজীবনে—কিন্তু এই ইচ্ছার জন্ম হল পদ্মার ঘাটে—উত্তর ও পূর্ববঙ্গের প্রান্তরে খ'ড়ো ঘরের দুঃখ-দারিদ্র্যের স্পর্শে। সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের নানা ঘটনার সংঘাতে কবির হৃদয় উত্তীর্ণ হচ্ছে অনুভবের নতন নূতন স্বর্গে, লাভ করছেন অসংখ্য বন্ধনমাঝে মহানন্দময় মুক্তির স্বাদ, তা কেবল মাত্র কবিতায় পড়লে বোঝা সহজ হত না; কারণ, সত্য কথা বলতে কি, অধিকাংশ মানুষ কবিতাকে বিশ্বাস করে না, মনে করে তা একটা ভাবের বুদ্‌বুদমাত্র—সে ভাব জীবনপ্রবাহের সঙ্গে সংযুক্ত মিশ্রিত নয়। মোটের ওপর, কবিতা জীবন থেকে বিযুক্ত একটা মুখের কথা। কিন্তু পদ্মাতীরের জীবনে যে ভাব তাঁর মধ্যে প্রবেশ করেছিল তা যে কত সত্য কত দৃঢ়মূল তা প্রমাণ করলেন সারা জীবন সেই গ্রামের কাজেই উৎসর্গ করে। তিনি ভালোবাসলেন দেশকে, দেখলেন কোথায় যথার্থ কাজ, কোথায় ত্যাগের প্রয়োজন। পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে একজনকে তাই লিখেছেন

—"পাড়াগাঁয়ের মধ্যে পড়ে হীন শ্রেণীর উন্নতির জন্য পড়ে থাকায় কেউ সুখ পায় না ; কারণ, দেশকে সত্যভাবে কেউ ভালবাসে না, কেউ সেবা করে না, প্রভুত্ব করতেই চায়।" দীর্ঘদিন পূর্বে লেখা হলেও এ অভিযোগের কারণ আজও বর্তমান আছে। শুধু কাজ করার ইচ্ছা নয়, কি করতে হবে সে সম্বন্ধেও তার ধারণা অস্পষ্ট নয়। পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে সে সম্বন্ধে তার যে পরিকল্পনা আজও তার চেয়ে বেশী কিছু হয়নি। তিনি লিখছেন—"চাষাদের সঙ্গে Cooperation-এ চাষ করা, ব্যাঙ্ক করা, ওদের স্বাস্থ্যকর স্থানে বাসস্থান স্থাপন করা, বৃদ্ধ বয়সের সংস্থান করে দেওয়া, রাস্তা করা, বাঁধ বেঁধে দেওয়া, জলকষ্ট দূর করা পরস্পরকে পরস্পরের সহায়তা-সূত্রে আবদ্ধ করা এমন কত কাজ আছে তার সীমা নেই।" পদ্মাতীরের জীবন তাকে টেনে নিয়ে গেল পরাধীন দেশের দারিদ্র্যপূর্ণ তামসিক জড়জীবনের দুঃখের মধ্যে—সে দুঃখের ছবি শুধু তার কবিতায় প্রেরণা যুগিয়েই থেমে গেল। না, কঠিন বাস্তব কর্মক্ষেত্রে তিনি নেমে এলেন। ভেবেছিলেন দেশের এই সত্য সেবায় দেশের মঙ্গলকে মূল থেকে তৈরী করে গড়ে তুলবার কাজে সাহায্য করবেন দেশের যুবকবৃন্দ। নানা বিদ্যা শিখতে বিদেশে পাঠালেন দু'একজনকে। কৃষিবিদ্যা শিখতে পাঠালেন জামাতাকে।

জীবনের শেষ পর্ব পর্যন্ত তাঁর গভীরতম চিন্তা মনন ও অনুভবের বিচিত্র দিকের মধ্যে প্রধান একটি দিক ছিল সাধারণ মানুষের কল্যাণকামনা, সর্বাঙ্গীণ কুশলসাধন। মানুষ যে মৃন্ময় এবং চিন্ময় দুইই, তার মাটির পাত্রেই যে অমৃত আছে সে কথা যিনি জানেন, তিনি মাটিকে অশ্রদ্ধা করেন না। তারই সূত্রে শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতনের বিবিধ কর্মের আরম্ভ। মানুষকে সুখে রাখবার সেই যে ইচ্ছাটি ছিন্নপত্রে পঁচিশ বৎসর বয়সে জেগেছিল, দীর্ঘকাল ধরে নানা দুর্লঙ্ঘ্য বাধা অতিক্রম করে সেই ইচ্ছা বলবতী নদীর মত ক্রমেই নানা শাখা-প্রশাখায় বিস্তৃত হয়ে প্রবাহিত হল। জগতের ইতিহাসে কোনো কবির জীবন এমন কর্মময় উদ্যমে পূর্ণ হতে দেখা যায় না।

আজীবন কবির একটি প্রধান দিক ছিল কৌতুকপ্রিয়তা, কোনো অবস্থাতেই তা রুদ্ধ হত না—ছিন্নপত্রের মধ্যে সেই উজ্জ্বল ঝলমলে কৌতুক প্রতিদিনের ঘটনাকে রসে জমিয়ে তুলেছে। সামান্যে উপলক্ষে অসমান অবস্থায়, অসমান পদে স্থিত লোকের সঙ্গে জমিয়ে তুলতেন মজা।

ছিন্নপত্রে আমরা দেখি, চারিদিকের পরিদৃশ্যমান প্রকৃতির সৌন্দর্যমগ্ন কবির মন নানা গভীর উপলব্ধির মধ্যে প্রবেশ করছে কিন্তু তা সত্ত্বেও অর্ধশিক্ষিত গ্রাম্য পোস্টমাস্টারের সঙ্গে বসে তার বাজে গল্প শুনতে তিনি আমোদ পান—আরো কত

ছোট-খাটো ঘটনা, মেমসাহেবের উৎসাত, স্কুলের ছেলেদের বিনয় সম্বন্ধে বক্তৃতা, স্বাস্থ্য সম্বন্ধে উপদেশ—সবই চিরকালের মানুষকে হাসিয়ে মারবে। মহামূল্যবান হীরার উপর আলো যেমন ঝকমক করে, তেমনি তাঁর মহিমান্বিত গভীরতার উপর চিরকাল ঝলমল করেছে কৌতুক—তাঁর জীবনের একটা বড় অংশ অকারণ আনন্দ-হাস্যে উদ্ভাসিত। বস্তুত জীবনভোগের সমস্ত উপকরণ তিনি সঙ্গে নিয়েই জন্মেছিলেন, বাইরের সরঞ্জামের বিশেষ প্রয়োজন ছিল না।

"না চাহিতে মোরে যা করেছ দান, আকাশ আলোক তনু মন প্রাণ"—জীবনের রসোৎসবে সেই ছিল যথেষ্ট।

কিছুদিন থেকে বঙ্গসাহিত্যে, বঙ্গসাহিত্যে বললে ভুল হবে, কারণ যা কিছু ছাপা হয় তাই সাহিত্য নয়, যাই হোক লেখক সম্প্রদায়ের কয়েকজনের মধ্যে, একটা অসুস্থ মনোবৃত্তি দেখা যাচ্ছে। তাঁরা রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য ও জীবন মিশিয়ে জীবন-রচনার চেষ্টায় কল্পনার ঘোড়দৌড় করিয়ে নানা বিকৃত কাহিনী গড়ে তুলছেন, আপন আপন সংকীর্ণ মাপে; পঙ্গু চিন্তায় তাঁরা রবীন্দ্র-সাহিত্যের পূর্ণ বিচারে চেষ্টিত হয়েছেন ব্যক্তিগত জীবনের আলোতে। তাঁদের আমরা অনুরোধ করি, একবার ছিন্নপত্রের মধ্যে সেই আশ্চর্য জীবনপ্রবাহকে দেখতে। জগতের কোন্ কবি তাঁর প্রথম উদ্বেল যৌবনে, পাড়াগাঁয়ের গেঁয়ো মানুষের সঙ্গে সম্পূর্ণ উপকরণ-বিহীন হয়ে এমন মধুর এমন আনন্দময় জীবন বছরের পর বছর যাপন করেছেন? কোথায় ছিল তাঁর আনন্দের উৎস, কোথা থেকে উৎসারিত কবিতা? কি করে জাগল এই মানবপ্রেম, যা নিয়ে গেল সর্বসাধারণের মধ্যে তাঁর করুণা। কোমর বেঁধে দেশহিতব্রতের সে সংকল্প নয়, সে স্বতঃ-নির্ঝরিত ভালবাসা। সুখী হবার উপকরণ, প্রাণমনকে অনুভব করবার উপকরণ ছিল তাঁর আপন অন্তরে, পদ্মাতীরের নিঃসঙ্গ দিনগুলি তাই কোন বিশ্বাতীত আনন্দসংগীতে ভরে উঠত। প্রকৃতির সঙ্গে এই গভীর আনন্দসংগম একটি ভাববিলাস নয়, এ তাঁর জীবনের প্রবলতম সত্য। পঁচিশ ত্রিশ বৎসরের অভিজাত ধনী যুবক কবি যাঁর জীবন সুখসঙ্গে সরস হয়ে নানা ভোগে পূর্ণ থাকবে, সেই শক্তিমান পুরুষ দিনের পর দিন গ্রামের পথে পথে যেখানে শারীরিক স্বাচ্ছন্দ্যটুকুও বজায় রাখা কঠিন, চা কোকো পর্যন্ত দুর্লভ বস্তু—হঠাৎ ম্যাজিষ্ট্রেট অতিথি এসে পড়ায় যে সব বস্তুর অভাবে বিপদেই পড়তে হয়, সেখানে উপকরণবিমুখ কবি নিরবচ্ছিন্ন একাকী আনন্দসাগরে মগ্ন হয়ে রয়েছেন। ছিন্নপত্রের প্রতি ছত্রে সে সংবাদ আছে। ঝড় উঠছে, বজ্র বিদ্যুতে নৌকা দুলছে, জ্যোৎস্না বিগলিত হচ্ছে, সর্বোপরি আকাশ-ভ্রমণকারী ত্রিবিক্রম সূর্যের মহিমা—কখনো উদয়লীলা, কখনো অস্তের সমারোহ, নিত্য নূতন রূপে চলেছে পৃথিবীর রবির

"পূরবে পশ্চিমে বন্ধু-সংগম।" এরকম অবস্থা দু'চার দিন পরেই বহু মানুষের কাছেই একঘেয়ে নির্বাসন-দুঃখে পরিণত হ'ত। কিন্তু সেই একই রকম প্রাকৃতিক দৃশ্যে সাজান একই রকম দিনগুলি প্রত্যহ নূতন হয়ে এসেছে তাঁর কাছে না-পড়া চিঠির মত। প্রতি প্রত্যুষে গ্রহণ করেছেন এক একটি স্বর্ণরেখাঙ্কিত পরম রহস্যময় সূর্যসনাথ দিন। বস্তুত ছিন্নপত্রের কোনো ব্যাখ্যা নেই—ছিন্নপত্রের মধ্যেই কবির জীবনদর্শন কাব্য ও সাহিত্যের ব্যাখ্যা পাওয়া যায়—এবং জানা যায়—যে কোনো মহৎ মানুষের জীবনকে যদি আমরা 'হওয়া' এবং 'করা' এই দুই পর্যায়ে ভাগ করি, তবে রবীন্দ্রনাথের এই ছিন্নপত্রের যুগ তাঁর হওয়ার যুগ, যখন সৃষ্ট হয়ে উঠল রবীন্দ্রনাথের অন্তরতর মানবধর্ম, যা পরে বিভিন্ন পর্যায় বহুবিধ কর্মের মধ্যে ব্যক্ত হল।

জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি

সব দেশেই বড় বড় পরিবারের নাম কোনো স্থানের নামের সঙ্গে যুক্ত হয়। বাংলা দেশেও তার প্রচলন আছে—যেমন শোভাবাজারের দেবদের, হাটখোলার দত্তদের, ইত্যাদি। বাড়ি বলতে এসব স্থলে আমরা ইট-কাঠের একটি স্তূপ বা নির্দিষ্ট কোনো স্থান বুঝি না। আমাদের মনে আসে একটি পরিবারের বিশেষ রূপ তাদের বিশেষ আচার আচরণ ঈপ্সা অভীপ্সা। বড় বড় প্রসিদ্ধ পরিবারগুলো তাই স্থানের নামে নামাঙ্কিত হলেও সেই স্থানেই সীমিত নয়—সেই পরিবারের মানুষ-গুলির মধ্যে তার আপন বিশেষ স্বাক্ষর ক্রমে ক্রমে নিজেকে দূরে দূরে ব্যাপ্ত করে দেয়—এক পরিবারের উদ্ভূত আচার আচরণ তার স্বগুণে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িও তাই।

এক সময়ে বাংলাদেশের প্রাণকেন্দ্র ছিল ঐ বাড়ি—কাব্য সাহিত্য দর্শন রাজনীতি অভিনয় সঙ্গীত শিল্প সব দিকের উজ্জীবন ঘটেছিল এ পরিবারের মধ্যে এমনভাবে যে, সারা দেশ বিস্ময়ে তাকিয়ে ছিল—ধনের গৌরবের কথা কারো স্মরণই হতো না কারণ ধন কোথাও নিজেকে প্রকট করত না, তা শুধু সেবকরূপে আড়ালে থাকত যেখানে তার যথার্থ স্থান; প্রকাশ পেত চিত্তের ঐশ্বর্য শিল্পে কলায় সঙ্গীতে।

প্রায় দেড় শতাব্দী ধরে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিকে একটি সর্বাঙ্গীণ রূপ দিতে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির যে দান তা নিয়ে একটি সুবৃহৎ গ্রন্থ রচনা হতে পারে। আমি এখানে তার দুটি একটি মাত্র দিক নিয়ে সেই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আলোচনা করব।

আমাদের বাল্যকালে যখন আমরা ঠাকুরবাড়িতে নানা উৎসবে অনুষ্ঠানে কখনও বা কবির সান্নিধ্যের আশায় যেতাম তখন সে বাড়ির পড়ন্ত বেলা—শেষ বেলাকার রঙ্গীন সূর্য যেমন চারদিকের প্রকৃতির উপর মায়াময় আলো বিছিয়ে দেয় তেমনি সেই বাড়ির শোভা সৌন্দর্য বিশেষ আচার আচরণ আমাদের মনোহরণ করত। দেখতাম অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, সমরেন্দ্রনাথকে তাঁদের পিতৃব্য সকাশে—দীর্ঘ লম্বা বারান্দা পার হয়ে ধীর মন্দ পদক্ষেপে সাক্ষাৎ করতে আসছেন। যে পরিচ্ছদে তাঁদের দীর্ঘ দেহ আবৃত থাকত সে কখনো কোনো সাধারণ বাঙালীর দেহে দেখিনি, যে ভাষায় তাঁরা কথা বলতেন সে ভাষাও সাধারণ বাঙালী পরিবারের ব্যবহৃত ভাষা নয়। এই বাড়িতে যে কোনো গৃহে প্রবেশ করলে বা যে কোনো মানুষের সান্নিধ্যে

এলে প্রথমেই মনে হত এঁরা অসাধারণ—সেই অসাধারণত্ব প্রকাশ করত তাঁদের ব্যবহারের সৌজন্য চারুতা ও সৌন্দর্যরুচি।

গত শতাব্দীর মধ্যভাগে যখন বিলিতিয়ানার ঢেউ সমাজের মধ্যে উত্তাল হয়েই প্রবেশ করেছে—ইঙ্গ বঙ্গ সমাজের আধুনিকতা—সর্ব বিষয়ে অন্ধ পরানুকরণের রূপ নিয়েছে তখন এ বাড়িতে স্বাদেশিকতার গৌরববোধ বাংলাদেশের সংস্কৃতি ও রুচিকে রক্ষা করলে। যা কিছু স্বদেশীয় তা যে শুধু সেই কারণেই বর্জনীয় এবং যা কিছু ইউরোপীয় তাই যে অনুকরণযোগ্য নয় একথা তাঁদের জীবনে ও গৃহে আশ্চর্য সুন্দরভাবে উদাহরণ রূপে প্রকাশ পেল। বাংলা ভাষা যা শিক্ষিত সমাজ না জানারই গৌরব করত সেই ভাষাকে এঁরা জগৎসভায় স্থাপিত করলেন।

শুনেছি মহর্ষির কাছে কোনো আত্মীয় ইংরাজীতে পত্র লিখলে যা নাকি তখনকার দিনের একান্তই রেওয়াজ ছিল, উনি সে পত্র ফেরত পাঠিয়ে দেন। আর এই ভাষাকে উজ্জ্বল পরিষ্কৃত সুসম্বদ্ধ ও বিচিত্র ঐশ্বর্যশালিনী করে তোলাই তো রবীন্দ্রনাথের সারা জীবনের সাধনা হল। এই ভাষা দিয়ে তৈরী হল বাঙালী জাতি, তার চিন্তা করবার শক্তি, তার দেখবার চোখ, তার বুঝবার মন। রবীন্দ্রনাথ যদি বাংলা ভাষায় না লিখতেন—বাংলা ভাষার ভিতরে গভীর চিন্তা, তীক্ষ্ণ মননা, যুক্তি, উপমা ও রসের প্রবল স্রোত উদ্বেল না হয়ে উঠত তাহলে জগৎ যে এত সুন্দর, প্রেম যে এত মহিমাময়, প্রকৃতি যে এত আপন ও ঈশ্বর যে আমাদের দেহে মনে অনুপ্রবিষ্ট তা আমরা জানতেই পারতাম না।

স্বদেশের যা কিছু ভাল তারই পুনরুজ্জীবন ঘটল ঠাকুর বাড়িতে—কারণ দেশকে তাঁরা যথার্থই ভালবাসলেন—দেশ বলতে কোনো একটা কাল্পনিক সংজ্ঞা স্থির করে নিয়ে তারই উদ্ধারের জন্য ইংরাজীতে বক্তৃতা দিয়েই অধিকাংশ দেশপ্রেমিক সে যুগে তাঁদের কর্তব্য করতেন। কিন্তু এরা সে দেশ নয়—প্রকৃত দেশের খবর পেলেন, যে দেশের দূর দূর গ্রামপ্রান্তে নানা অনাদৃত স্থানে অজ্ঞাত শিল্পীর হাতে আশ্চর্য শিল্প তৈরী হয়েছে—কত আশ্চর্য কারুকার্যময় নক্‌সা, বসনে ভূষণে তৈজসে সে সব সংগ্রহ হল। দেশের যেখানে যে সুন্দর জিনিস আছে ঠাকুরবাড়িতে তা এসে পৌছল। মনে পড়ে বিচিত্রা গৃহ—রবীন্দ্রনাথের লালবাড়ি, যেখানে এখন বিশ্বভারতীর অফিস, ঐ প্রকাণ্ড ঘরখানা কি অপরূপ আসবাবেই সাজানো ছিল। এমন কিছু মহামূল্য জিনিস নয় কিন্তু সব দেশীয়, বিশেষত তার দেশীয় ভঙ্গীই ছিল মনোহারী। যখন ভারতবর্ষের সমস্ত ধনীর গৃহে, শিক্ষিত সমাজে বিলাতী আসবারের ঘটা, যখন স্প্রিং দেওয়া সোফা কোচ, বিলাতী ফুলদানী ও নেটের পর্দার রাজত্ব চলেছে—তখন তাঁরাই সম্বলপুরের কাপড়, হায়দ্রাবাদের প্রিন্ট, রাজপুতানার

বাঁধি তাদের গৃহসজ্জায় স্থান দিয়ে আমাদের দেখিয়ে দিলেন আমাদের নিজেদের হাতের কি আশ্চর্য কারুকলা শতশত বৎসরের স্মৃতি নিয়েও অনাদৃত হয়ে পড়ে আছে এখন এসব বস্তু যত সহজে আমরা গভর্ণমেণ্টের কটেজ ইণ্ডাষ্ট্রির কল্যাণে চারদিকে ছড়ান দেখতে পাচ্ছি এমন তো তখন ছিল না। বস্তুত কটেজ ইণ্ডাষ্ট্রির সৃষ্টি হত কি না, হলেও এই দিকে দৃষ্টি যেত কি না তাও সন্দেহ যদি না দীর্ঘদিন ধরে ঠাকুরবাড়ি ও পরে শান্তিনিকেতনে এ জিনিস খুঁজে দেখবার চোখ, ভাল লাগবার শক্তি, শিল্পবোধ, আমাদের মধ্যে জাগিয়ে তুলত, সকলের মধ্যে ছড়িয়ে দিত। শান্তিনিকেতন তথা ঠাকুরবাড়ি সমগ্র ভারতের শিল্পবোধ যে কতখানি জাগিয়ে তুলেছে তা হয়ত বর্তমান প্রজন্ম জানেই না।

যে লালবাড়ির কথা হচ্ছিল শুনেছি মহর্ষি ছোট ছেলেকে ঐ বাড়িটি বানাতে অর্থ দিয়েছিলেন। মাঝখানের বিরাট হলঘর, দক্ষিণে বারান্দা ও পিছনে ও পাশে কতকগুলি ছোটছোট ঘর বসবাসের জন্য। কবি বরাবর ছোট ঘর পছন্দ করতেন, উপকরণ বাহুল্যের মত, পেটুকের ভোজের মত, তিনি দৈহিক সুখগুলির আয়োজনকে বড় করে তুলতে চাইতেন না। পরবর্তী জীবনে শান্তি-নিকেতনেও তাই কবির বাসগৃহগুলি ক্ষুদ্রায়তন, তারা স্পর্ধা প্রকাশ করেনি—করেছে সৌন্দর্য প্রকাশ। লালবাড়িরও তাই নিজের ব্যবহারের ঘরগুলি ছোট, শুধু বিচিত্রা বড, কারণ ঐখানে আসবে বিশ্বের মানুষ, ও-ঘর সকলের। ঐখানে শোভা সজ্জায় মিলে শিল্পে কারুতে সুচারু মনোময় গৃহে বাণীবন্দনার সভা, কবি যে সর্বদা বলতেন—মানুষের মধ্যে দুটি ভাগ—দুই আমি। এক 'আমি' আমার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুখ-দুঃখ দিয়ে গাঁথা জৈব জীবনে আবদ্ধ সেখানেই লোভক্ষোভের দ্বন্দ্ব, সে আমার ছোট আমি, আর এক আমি বিশ্বসত্তার সঙ্গে সংযুক্ত—তার মধ্যেই জাগে দেশপ্রেম, ত্যাগ ও নানা মহৎ অভিলাষ—সেই বড় আমিই জীবদেহে গ্রথিত মরণশীল এই মানুষকে অমরত্বের সংবাদ দেয়। তার কাছে আত্মপর নেই, দেশ জাতি ধর্মের গণ্ডি নেই—সে বিশ্বমানব। ঐ ঘর যেন সেই কথাই বলে, নিজের জৈবপ্রয়োজনে যেটুকু দরকার যে ভোগ আত্মগত তাকে বাড়িয়ে তুলে কি হবে, যে ভোগ সকলের সঙ্গে মিলিত যেখানে সব মানবের নিমন্ত্রণ সেইখানেই উদার সম্বর্ধনা। বিস্তৃত বৈঠকখানা 'বিচিত্রা' ঘর তাই নানা উপকরণে ছবিতে সজ্জিত। ভারতবর্ষের যেখানে যা সুন্দর বস্তু আছে সবই বোধহয় ঐ ঘরে ছিল, সাজানের ভঙ্গীও স্বদেশীয়। মনে হয় যেন অতীত যুগের কোন ছবি থেকে ঘরখানি এসেছে—অথচ তাতে বর্তমানের যুগোপযোগিতাও ছিল যথেষ্টই। ছবিগুলি টানাবার ভঙ্গীতেও ছিল বিশেষত্ব।

আলোগুলোতে বিলিতি টোপর ছিল না, পরান হয়েছিল পাথরের আলোর আবরণ। বলা বাহুল্য, সে যুগে দেশী জিনিসের কোনো আমদানীই ছিল না। তাই স্বদেশী জিনিসের ব্যবহারের জন্য চেষ্টা কল্পনা এমন কি রীতিমত সংগ্রহ সাধনার প্রয়োজন ছিল। এঁরা শুধু যে উপকরণের মধ্যে স্বদেশী শিল্পের প্রবর্তন আনলেন তা নয়, জীবনের ভঙ্গীতে দৈনন্দিন জীবন-যাপনেও আনলেন তারা সুসংস্কৃত রীতি। বিদেশের যে সুবিধেগুলো গ্রহণযোগ্য স্বদেশীভাবে তাকে স্বকীয় করে নিলেন—খাবার টেবিলে, নীচু চৌকি টেবিলের উপর কাঁচের পাত্রের বদলে এল বড় বড় শ্বেত পাথরের কষ্টিপাথরের থালা বাটি। ইতিপূর্বে কোনো বাঙালীর গৃহে দৈনন্দিন ব্যবহারে অমন সুসজ্জিত পাথরের বাসনের শোভা দেখিনি। যে ভৃত্যরা সে বাসনে আহার্য বহন করে আনত তাদের অঙ্গে কখনও উর্দি বা মাথায় পাগড়ি দেখিনি যা তখনকার সময়ে (এবং এখনও) সাহেবিয়ানায় অগ্রসর সমাজের গৃহে প্রচলিত হয়েছিল। উর্দি পরিয়ে ভৃত্যকে শুধুই ভৃত্য ও প্রভুর ঐশ্বর্যের বিজ্ঞাপন করার রীতি সে গৃহে ছিল না কিন্তু একটা জিনিস তাঁরা পরিয়েছিলেন, শিখিয়েছিলেন, সে সৌজন্য, ঠাকুরবাড়ির ভৃত্য একজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলেই যে কেউ বুঝতে পারতেন যে আচরণে বিনয়ে সে নম্রতা শিখেছে। করজোড়ে নত হয়ে নমস্কারের বিশেষ ভঙ্গীটির স্বদেশীয় অভিবাদনের সৌকর্য, ঠাকুরবাড়ির ভৃত্যের একটি বিশেষ পরিচয় ছিল—যখন সেলাম হুজুর বা সাধারণ গৃহের অসম্ভাষিত আচরণ ভৃত্যের ভৃত্যত্বই শুধু প্রকাশ করত। পরিবারের অঙ্গরূপে সমস্ত পরিবারের সঙ্গে মিলিয়ে এমন একটি পরিচয় যা ঐ পরিবারের সঙ্গে সম্পর্কিত ভৃত্যে পর্যন্ত সুস্পষ্ট হয়ে উঠত তা বড় কম আশ্চর্যের কথা নয়। ঠাকুরবাড়ির সৌজন্য তাই একটি বিশেষ একটি খ্যাতি লাভ করেছিল। পরস্পরের বন্ধুজনের, সমসম্পর্কিতজনের সাক্ষাতে যে নমস্কারের প্রথা এতো আমাদের মধ্যে ছিলই না বললে হয়। এমন কি শান্তিনিকেতনে বিদ্যালয়ে এই অভিবাদন প্রথা প্রচলন করায় বাহিরে তাঁর প্রতি বিদ্রূপও শুনেছি—ও একটা রাবীন্দ্রিক ব্যাপার। আমাদের বাল্যকালেও রাবীন্দ্রিক কথা পরিহাস ছলে ব্যবহার হতে শুনেছি।

জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির সৌজন্যবোধ সৌন্দর্যবোধেরই একটি বিশেষ অভিব্যক্তি—সে মানুষের সঙ্গে মানুষের ব্যবহারের সৌন্দর্য। গুরু লঘু ছোট বড় আত্মীয় অনাত্মীয় বন্ধু এবং বান্ধব প্রত্যেক সম্পর্কের বিশেষত্ব রক্ষা করে সামাজিক এবং মানবিক একটি মূল্যবোধের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘ কর্মজীবনে বহু বিচিত্র মানুষের সংস্পর্শে এই গভীর সৌজন্যবোধের চারুতা একটি সুগন্ধ পরিকীর্ণমণ্ডল সৃষ্টি করে রেখেছিল। অত্যন্ত ক্ষুব্ধ বিরক্ত হলেও তাঁর স্বর কখনো

স্বাভাবিকের চেয়ে বিশেষ উচ্চগ্রামে পৌছত না—ভৎর্সনা কালেও ঈষৎ ভ্রূকুটির চেয়ে রূঢ়তর কোনো ভঙ্গী দেখা যেত না—ভাষা কখুনো কর্কশ হত না। ছোট বড় যে কেউ যে কোন অন্যায় আব্দার নিয়ে উপস্থিত হত নিজের শরীরকে পীড়ন করেও তিনি সে আব্দার রক্ষা করতেন। তাঁর বিপুল কর্মোদ্যমের মধ্যে অপরিচিত বালক-বালিকার চিঠির উত্তর স্বহস্তে লেখার কথা আজ ভাবলে বিস্ময় বোধ হয়। মানুষের কাছে মানুষের যে দাবি তা উপস্থিত হ'লে আপন স্বাস্থ্যের সীমা লঙ্ঘন করেও তা না চুকিয়ে তিনি পারতেন না। সে যেমন বড় বিষয়ে তেমনি ছোট বিষয়ে—যেমন অত্যাচারিত জালিয়ানওয়ালাবাগ কবির লেখনীর সমর্থন প্রত্যাশা করে, অপমানিত স্বদেশ কবির শক্তির আশ্রয় চায়, তেমনি ক্ষুদ্র এক বিমূঢ় বালিকার একটুকরা হাতের লেখার জন্য আবেদন মানুষেরই দাবি। সেটুকু থেকে বঞ্চিত হলে তার বেদনাটুকু কবি অগ্রাহ্য করতে পারেন না। উদারচরিতনামের এই ধর্ম রবীন্দ্রজীবনব্যবহারে পদে পদে উদ্ভাসিত হয়ে উঠত। তুচ্ছ মানুষের জীবনের উপরে তিনি তাঁর স্নেহবিকীর্ণ হাসি হেসে সূর্য যেমন বনফুলকে বলেছিল, তেমনি বলতেন—"ভা.. আছ ভাই ?"

এই স্বাভাবিক সৌজন্য কবির কাছে কোন বাহ্য অভ্যাসমাত্র ছিল না এর উৎস ছিল মানুষের প্রতি মমত্বে এবং সেই মমতার আদান প্রদানে তাঁর নিজের অস্তিত্ব ও মাধুর্যের ঐশ্বর্যে পূর্ণ হয়েছিল তাই তাঁর জীবনে প্রবল শক্তির সঙ্গে অসীম করু- - সঙ্গম—যেন এই বিপরীতের সমন্বয় যেন সূর্যের আলোর শক্তির সঙ্গে জ্যোৎস্নার লাবণ্য মিলিয়ে দিত।

রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী

রবীন্দ্রনাথের পত্রসাহিত্যের কথা চিন্তা করলে অভিভূত হয়ে পড়তে হয়। এক দিন এক বান্ধবী আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "আপনার কাছে রবীন্দ্রনাথের ৩০০ চিঠি আছে শুনেছি। সে কথা কি সত্য ?"

"না অতিরঞ্জিত।"

"তবু কত বলুন ?"

"দেড়শ' বেশী কখনই নয়"—এ কথাটি বলেই স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম, জীবনের শেষ প্রান্তে যখন তাঁর শরীর ক্লান্ত, শক্তি পরিমিত হয়ে এসেছে তখন ক'দিনের জন্যই বা আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল ? ভাবলে কি বিস্ময় বোধ হয় না যে, যে ব্যক্তি হাজার হাজার গান লিখেছেন, সুর সংযোগ করেছেন, যাঁর ছাব্বিশ খণ্ড রচনাবলী এনসাইক্লোপিডিয়ার তুল্য ভারী, যিনি প্রায় তিন হাজার ছবি এঁকেছেন, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন অত বড় বিরাট প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন, পল্লীসংগঠন পরিকল্পনায় পথ দেখিয়েছেন গঠনমূলক কর্মের—দেশ-দেশান্তরে ভারতবর্ষের অমৃতবার্তা নিয়ে কত বাধা বিঘ্ন লঙ্ঘন করে ঘুরেছেন, জীবনের এমন কোন দিক নেই যেদিকে তাঁর চিন্তার আলো পড়ে নি, নৃত্যগীত অভিনয়ে আনন্দমুখর করে উৎসব জাগিয়ে তুলেছেন অবসন্ন জাতীয় চেতনায়—এত বিপুল কর্মোদ্যমের মধ্যে, এত বিচিত্র নানাদিকপ্রসারী চিন্তার মধ্যে, তিনিই সামান্য বালক-বালিকার চিঠির উত্তর স্বহস্তে দিতেন। যাঁদের তার নিকটে যাবার বা চিঠিপত্র পাবার সৌভাগ্য হয়েছিল তাঁদের অবশ্যই মনে পড়বে এই পত্রোত্তর তার কাছ থেকে কি নিয়মে আসত। আপনি যদি আজ চিঠি লেখেন সে চিঠি কাল শান্তিনিকেতনে পৌঁছবেই (কারণ আজকালকার মত পিওনরা তখন চিঠি জলে ফেলে দেওয়া অভ্যাস করে নি), আর তার পরদিন তাঁর উত্তর লিখবেনই এবং তার পরের দিন যথা নিয়মে আপনার কাছে সে উত্তর এসে পৌঁছবে, তা সে আপনি গণ্যমান্য গুণী ব্যক্তিই হন বা নগণ্য বালিকা অর্ধশিক্ষিত স্ত্রীলোক বা কেবলই অটোগ্রাফ-অন্বেষী হোন। এই নিয়মে অনুমান করলে সহজেই বোঝা যায় সুদীর্ঘ আশী বছরে কত লোককে তিনি কত চিঠি লিখেছেন। এই প্রসঙ্গে একটা কথা মনে পড়ে গেল। আমার তখন ১২।১৩ বছর বয়স। স্কুলে থার্ড ক্লাসে পড়ি। সে সময়ে মধ্যে মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বাক্ষরিত চিঠি পাবার সৌভাগ্য আমার হত। হয়তো সে চিঠিগুলি কিঞ্চিৎ অহমিকার সঙ্গে বন্ধুবান্ধবদের কাছে দেখাতাম। আমার এক সহপাঠিনী

ঈর্ষাপরায়ণা হয়ে কবিকে একটি চিঠি লিখলেন—"আপনি শুধু শুধু মৈত্রেয়ীকে চিঠির উত্তর দেন কেন—এতে সে ভারী অহঙ্কারী হয়ে যাচ্ছে। আপনি আমাকেও উত্তর দেবেন।" যত দূর মনে পড়ে তিনি তার উত্তরে লিখেছিলেন, "তোমার বন্ধু যখন আমায় চিঠি লেখে তখন কিছু প্রশ্ন করে, কিন্তু তুমি তো কোনো প্রশ্ন করনি—কি উত্তর দেব ?"

যাই হোক উত্তর ঠিকই এসেছিল।

মানুষের কাছে মানুষের যে দাবি, স্নেহ ভালবাসা ভক্তি বা ন্যায়বিচার এর কোনোটাই তাঁর কাছে উপস্থাপিত হলে প্রত্যাখ্যাত হতে পারত না। শ্রদ্ধা বা প্রীতি অতি সামান্য লোকের কাছ থেকে এলেও তার সবটুকু রসমাধুর্য গ্রহণ করবার আশ্চর্য ক্ষমতা তাঁর ছিল। এ ক্ষমতা আশ্চয বলছি এই জন্য যে বড়মানুষরা শক্তিশালী মানুষরা যে কত অনুদার হতে পারেন, আত্মকেন্দ্রিক হতে পারেন তা তো আমরা অনেকেই জানি। বস্তুত নিজেকে আত্মকেন্দ্র থেকে বিশ্বের দিকে বিকীর্ণ করাই তাঁর যে প্রতিমুহূর্তের কাজ তা তাঁর চিঠিপত্রের মধ্যেই পূর্ণরূপে প্রকাশিত।

এই তো গেল অনাত্মীয় স্বল্পপরিচিত মানুষদের কাছে চিঠির কথা। এ ছাড়া তাঁর বিরাট পত্রসাহিত্যের একটি দিকে আছে, যেখানে আত্মীয়স্বজন আত্মীয়সমদের কাছে তিনি নিজের প্রত্যহের জীবনকে উন্মুক্ত করার আনন্দেই উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। সাহিত্যপত্র যা সাহিত্যিক বা পণ্ডিত ব্যক্তিদের কাছে লেখা সেগুলির কথা স্বতন্ত্র, কিন্তু ঘরোয়া চিঠির মধ্যেই তাঁর অন্তর্জীবনের প্রাত্যহিক লীলা যেমন-ভাবে প্রকাশিত এমন আর কোথাও নয়। বস্তুত রবীন্দ্রজীবনী রচনার প্রধান উপকরণ এই চিঠিপত্রের মধ্যেই আছে। সেই জন্য একদিক থেকে মনে হয় তাঁর প্রতিটি পত্রই প্রকাশিত হওয়া উচিত। তবু এর অন্যদিক থেকেও কিছু বলবার আছে। রবীন্দ্রনাথ নিজে ব্যক্তিগত জীবনের ডায়রী লেখার পক্ষপাতী ছিলেন না, কারণ তাঁর নিজের জীবনে সমস্ত অভিজ্ঞতা সমস্ত সুখ-দুঃখ আনন্দ বেদনা ক্রমাগতই ব্যক্তিগত বিষয় থেকে নিজেকে মুক্ত করে নৈর্ব্যক্তিক হয়ে উঠত। শোক, সঙ্গীতে মুক্তি পেত, প্রেম, প্রেমের পাত্রকে ছাড়িয়ে যেত। যা একান্ত আত্মগত তাকে কেবলই পার হয়ে যাওয়াই যাঁর কাজ, প্রাত্যহিকতাকে তিনি মূল্য দেন যখন সে আপন গণ্ডিকে অতিক্রম করে তখনই। অথচ তাঁর লেখকের মন মানবপ্রেমিক মন, মানবচিত্ত অনুসারী মন, মানুষের ছোটখাটো ভুলত্রুটি লক্ষ্য করে। কখনও তাতে পীড়িত হয়, কখনও বা হর্ষিত হয়—কখনও বা তুচ্ছ ঘটনা কল্পনায় নানা রূপ নেয়। লেখক কখনও প্রত্যহের মানুষকে বাদ দিতে পারে না। তারা সত্য,

তারা বাস্তব, তারাই তো তাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাতরতায়, অসম্পূর্ণতার ভিতর দিয়ে বিচিত্র মানবলোকের সংবাদ আনে। চিঠির মধ্যে বিশেষত আত্মীয় বা আত্মীয়-প্রতিম মানুষদের কাছে যেসব চিঠি লেখা হয় তার মধ্যে তাই নানা মানুষের নানা কথা নানা মুহূর্তে ধরা পড়ে। কখনও মহত্ত্ব, কখনও নীচতা, কখনও বিশ্বাস, কখনও অবিশ্বাসের ছায়া-রৌদ্রপাতে পরিচিত মানব সমাজের বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন-ভাবে কবির চোখে প্রকাশ পায়। তার কোনটাই স্থায়ীরূপ নয়। কল্পনাপ্রবণ কবির মন কখনও অতি তুচ্ছ বিষয়ের মধ্যে বিরাট মহত্ত্ব দেখতে পান, কখনো বা অতি সামান্য ত্রুটি তাঁর স্পর্শচেতন মনকে বিমুখ করে। চিঠির মধ্যে এই ছায়া-রৌদ্রপাত ঘটে বিশেষ করে তাঁদের কাছেই, যাঁরা আপন জীবনকে ছায়ারৌদ্রময় করে রেখেছেন। এ কথা সকলেই জানেন যে চিঠির সৃষ্টি শুধুই লেখকের কলমে হয় না, চিঠির যিনি প্রেরণা তিনিও তার মধ্যে থাকেন, যেমন অঞ্জলি তাতে তেমনি ধারণযোগ্যতা। যার সঙ্গে যেমন আলোচনা সহজ হয় যার যেমন বোধশক্তি তার কাছে লেখা চিঠিগুলির মধ্যে তার কিছু প্রকাশ থাকেই। যদিও লেখবার আনন্দে, আত্মপ্রকাশের সহজ সরল পথে আপনাকে স্বাক্ষরিত করবার ইচ্ছাতেই প্রধানত এ জাতীয় পত্রসাহিত্যের জন্ম।

যে চিঠিগুলি প্রকাশ করবার উদ্দেশ্যে লেখা তাকে আমরা এ ধরণের পত্র-সাহিত্যের অন্তর্গত করতে পারি না, যেমন 'রাশিয়ার চিঠি'—সেগুলি চিঠি নয় নিবন্ধ। বিদেশ থেকে লেখা এ রকম পত্রাকারে রচিত প্রবন্ধগুলি বাদ দিলে বাল্যকাল থেকে অর্থাৎ যৌবনের প্রারম্ভ থেকে বহু সত্যকার চিঠি, যা শুধু ব্যক্তি-বিশেষের কাছে, আপন একান্ত ব্যক্তিগত স্বরূপ ও দৈনন্দিন ভাবনাকে ছেড়ে দেওয়া, এমন চিঠি বহু আছে। সদ্য পুনঃপ্রকাশিত 'ইয়েরোপ প্রবাসীর পত্র' কৈশোরে লেখা এমনই এক আশ্চর্য পত্রসাহিত্য। বিস্ময়ের কথা এই যে, এই পত্রগুচ্ছ একবার মাত্র প্রকাশ হয়েছিল, তারপর তিনি নিজেই এর পুনঃপ্রকাশনা বন্ধ করে দেন। কারণ তাতে বিদেশের কিছু নিন্দা ছিল। তিনি লিখছেন—"সাহিত্যে সাবালক হবার পর থেকেই ঐ বইটির উপরে আমার ধিক্কার জন্মেছিল। বুঝেছি যেখানে গিয়েছিলুম সেখানেরই যে সম্মানহানি করা হয়েছে তা নয়, ওটাতে নিজেরই সম্মানহানি। বিস্তর লোকের বারবার অনুরোধ সত্ত্বেও বইটি প্রকাশ করি নি। কিন্তু আমি বাধা দিলেই ওটা যে অপ্রকাশিত থাকবে এই কৌতূহল-মুখর যুগে তা আশা করা যায় না! সেই জন্যে এ লেখার কোন্ কোন্ অংশকে লেখক স্বয়ং গ্রাহ্য এবং ত্যাজ্য বলে স্বীকার করেছে সেটা জানিয়ে রেখে দিলুম। যথা সময়ে ময়লার ঝুলি হাতে আবর্জনা কুড়োবার লোক আসবে বাজারে, সেগুলো

বিক্রি হবার আশঙ্কাও যথেষ্ট আছে। অনেক অপরাধের অনেক প্রায়শ্চিত্ত বাকি থাকে ইহলোকে প্রেতলোকে, সেগুলো সম্পূর্ণ হতে থাকে।"

মনে ভয় হয় রবীন্দ্রনাথের এই আশঙ্কার কারণ আজ নানা জায়গায় প্রকট হয়ে উঠছে।

নানা লোকের কাছে নানা অবস্থার অভিঘাতে লেখা চিঠিতে ও ব্যক্তিগত কথাবার্তায় যা প্রকাশ পায় অবশ্যই তার মধ্যে বক্তা ও শ্রোতা লেখক ও পাঠকের সমধর্মিতা এসে পড়ে, যেমন উদাহরণস্বরূপ বলছি,—রবীন্দ্রনাথ লোকোত্তর প্রতিভায় জ্যোতির্ময় হলেও তিনি মানুষ ছিলেন, তাঁর জীবনের একটি বড় অংশ প্রতিদিন প্রত্যহের নানা ছোট মানুষের সংস্পর্শে আসত, তাঁরা কেউই জ্যোতির্ময় সত্বার আলোকসুধা পান করেই সর্বদা সন্তুষ্ট থাকতেন না। তাঁরা পরস্পর পরস্পরের নিন্দা করতেন, নানা ছোটখাটো ঘটনার দ্বারা একে অপরের প্রতি কবির মন বিমুখ করতে চাইতেন—তাঁদের কারু কারু তো কবির সম্বন্ধে 'প্রপ্রাইটরি রাইট' এত বেশী ছিল যে, অন্য কোন ব্যক্তিকে তাঁর কাছেই ঘেঁষতে দিতে চাইতেন না। রবীন্দ্রনাথের চতুর্দিকে, কাঁটাতারের বেড়া অনেক ছিল তবু যে সেই বেড়া ডিঙ্গিয়ে নূতন নূতন মানুষ তাঁর কাছে মাঝে মাঝে গিয়ে উপস্থিত হতে পারত তার একমাত্র কারণ এই যে কবি সবই জানতেন। তাঁর গভীর গূঢ়-সঞ্চারী মন সহজেই মানব-মনের বিচিত্র মনস্তত্ত্বের সব চাবিগুলিই অনায়াসে পেয়ে যেত। এই প্রসঙ্গে একটা মজার গল্প মনে এল—গল্পটি একেবারে সত্য। বছর কুড়ি পূর্বে আমার এক বান্ধবী আমায় জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "আচ্ছা ভাই, তুমি কখনও গুরুদেবকে স্বপ্নে দেখ?" "না মোটেই না, সর্বদা তাঁর কথাই আলোচনা হয় বলে বোধহয় স্বপ্ন আর দেখি না।" আমার বান্ধবী বললেন, "আমি কাল তাঁকে স্বপ্নে দেখলাম—তিনি যেন খড়দার গঙ্গাতীরের বাড়িতে বসে আছেন—তেমনি একটা বড় কেদারায় হেলান দিয়ে, তেমনি উজ্জ্বল মধুর আশ্চর্য সুন্দর মূর্তি সমস্ত মনপ্রাণকে তাঁর দিকে ডাকছে, আমি এগিয়ে যাচ্ছি এমন সময় অমুকবাবু এসে দরজার সামনে দু'হাত তুলে দাঁড়ালেন দরজা বন্ধ করে। যাওয়া হল না। বড় কষ্টে ঘুম ভেঙে গেল।" এই স্বপ্ন হলেও সত্যের একেবারে নিখুঁত ছবি যা আমার বান্ধবীর অবচেতনে দৃঢ়মূল হয়ে রয়েছে।

আর এ ধরণের ঘটনায় তখন অনেক যন্ত্রণা ভোগ হলেও আজ বুঝি এ এমন দুষ্য কিছু নয়, দৈবক্রমে treasure land-এর খবর যদি কেউ আগে পেয়ে যায় সেখানে হাতে ধরে অন্যকে কে নিয়ে যাবে? তবে যে কথা প্রসঙ্গে এত কথা এল তাই বলি, চিঠি বা ব্যক্তিগত কথায় অবশ্যই রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিকটবর্তীদের কথার উত্তরে

প্রত্যুত্তরে কখনও তাঁদের ভাবনায় প্রভাবিত হয়ে (কারণ তাঁরা সকলে তাঁর প্রিয়জন —প্রিয়জনের প্রভাব তাঁর উপর পড়বে না এত বড় অ-মানব তিনি কখনই ছিলেন না) এমন কথা অনেক লিখেছেন যা সাহিত্যের দরবারে ছাপার অক্ষরে অন্যের বিরুদ্ধে তাঁর মতের একটি অব্যর্থ প্রতিরূপ বলে চিরস্থির করে রাখা তাঁর অভিপ্রায় ছিল না। জীবনের স্রোতে চলতি পথে কত কিছু ভেসে আসে, চলে যায়, তার মধ্যে চিরন্তনের ছাপ নেই। আমার দুঃখ হয় যখন দেখি অনায়াসে আজ সেসব কথা ছাপিয়ে দিতে তাঁর আপনজনেরা বন্ধু-বান্ধবেরা কুন্ঠিত হন না। নিজের সমস্ত রচনাকে যিনি নির্বিচারে কেটে ছেঁটে এক আঁচড়ে নির্মমভাবে পাতার পর পাতা উড়িয়ে ভাস্করের মত বাক্যের মূর্তি গড়তেন, যাঁর হাতে লেখায় বর্জনীয় অংশ বাদ দিতে গিয়েই এত বড় এক নব্য চিত্রজগৎ রূপ পেল, অনুমান করা যায় যা কিছু কলমের মুখে চিহ্নিত হয়েছে তার সমস্তই তিনি ছাপার যোগ্য বা রক্ষণীয় মনে করতেন না। আজ তিনি বর্তমান নেই বলেই তাঁর ইচ্ছার অমর্যাদা করতে অনেকেই দ্বিধাগ্রস্ত হন না—কারণ তার দ্বারা হয়তো পরোক্ষে এই প্রমাণ হয় যে আমার কাছে যখন অন্যের বিষয়ে এই নিন্দাজনক কথা যখন বলেছিলেন তখন আমার সম্বন্ধে তাঁর সমস্ত মতই ছিল সন্তোষজনক। কিন্তু এ 'করোলারি' সত্য নয়। মানুষকে বিশ্বাস করা যেমন তাঁর স্বভাব ছিল তেমনি মানুষকে চেনবার অন্তর্দৃষ্টিও তার স্বভাবজ ইন্দ্রিয়ের মত।

রবীন্দ্রনাথের জীবিতকালে যাঁরা তাঁর শত্রু ছিলেন অর্থাৎ সর্ববিষয়ে অবিরত তাঁর প্রতি নিন্দা উদ্‌গিরণ করতেন তাঁরাও জানেন তিনি কারুর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করতে স্বভাবতই অক্ষম ছিলেন। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে একদা কথাচ্ছলে এক ব্যক্তির কথা আমাদের বলেছিলেন—'যদিও ওর অনেক কাজ অনুমোদন করি না তবু ওর বাবা আমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করেছিল—সেই কারণেই ওকে একটু বেশি স্নেহ করি, ওর বিরুদ্ধে কিছু বলা বা ও কিছু চাইলে না দেওয়া আমার সম্ভব হয় না।' আর একটি দিনের কথা মনে আছে—এক ব্যক্তি তাঁর কোন প্রসিদ্ধ কাগজে রবীন্দ্রনাথের বহু পরিবাদ করেছিলেন, পরে তিনি কবির কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। কবিও অতি প্রসন্ন মনে তাঁকে গ্রহণ করেন। আমরা প্রায়ই কবির মুখে সেই ব্যক্তির কথা শুনে এবং তার কী রকম পরিবর্তন হয়েছে তারই প্রশংসাপত্র বার বার উচ্চারিত হচ্ছে দেখে রুষ্ট হয়ে বলেছিলাম—এই লোক আপনাকে কি কি বলেছিল ভুলে গেছেন ? ঐ সব জঘন্য নিন্দকারীকে আপনি ক্ষমা করতে পারেন আমরা পারি না। আমার আজও বেশ মনে আছে কবি ঈষৎ হাস্য করে বলেছিলেন, 'তোমাদের সঙ্গে আমার সেই তো সামান্য একটু প্রভেদ, আমি ক্ষমা

করতে প্যারি তোমরা 'পার না।' বস্তুত রবীন্দ্রজীবনকাব্যের এই মূল ধ্বনি। মাঝে মাঝে ক্ষণকালের জন্য তার ব্যত্যয় হয়তো ঘটেছে—রুষ্ট ক্ষুব্ধ বিরক্ত হয়েছেন, কিন্তু সে বিমুখতা কারুকে চিরদিনের জন্য লাঞ্ছিত করে রাখত না। যাঁরা রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্র লাভ করবার সৌভাগ্য লাভ করেছেন তাদের উপর এই গুরুদায়িত্ব আছে যে যা যথার্থ সত্য তাকেই ছাপার অক্ষরে স্থায়ী করবেন—তা না হলে যা কবি থাকলে স্বহস্তে মার্জনা করে ফেলে দিতেন তা যাঁরা একত্রে করে তাঁর জীবনের প্রবাহর সঙ্গে গেঁথে দিতে চান তারা জ্যোতিষ্কের কক্ষপথে ছায়াকেই, রাহুকেই বড় করে তোলেন।

রবীন্দ্রনাথের পত্রসাহিত্যের আলোচনা করতে গেলে দীর্ঘ সময় লাগবে—আজ দু'দণ্ডের মধ্যে তা হবার নয়। স্ত্রীর কাছে লেখা পত্রগুলি যা চিঠিপত্রেব প্রথম খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে—তা আমাদের বিস্ময়বিমূঢ় করে দেয়। বাইশ বছরের অপূর্ব যৌবনে, সৌন্দর্য-মূর্তি পুরুষের সঙ্গে প্রায় নিরক্ষরা দশ বছর বয়স্কা গ্রাম্য বালিকার বিবাহ হয়েছিল, যাঁর পূর্বে ইয়োরোপ পর্যন্ত দেখা ও য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র লেখা হয়ে গেছে, সেই পরিণত মন,:উন্মুখ জাগ্রতচিত্তবৃত্তি প্রতিভাধর মানুষের অসাম্য বিবাহ কি সৌহার্দে সখ্যে প্রীতিতেই না পূর্ণ করে তুলেছিলেন! একটি আশ্চর্য সুন্দর অভাবনীয় পরিণতির ছবি এই চিঠিগুলির মধ্যে ফুটে উঠে রবীন্দ্রনাথের একটি অভিনব শক্তি আমাদের কাছে প্রকাশ করে—যে শক্তি সহজে সুখী হবার শক্তি, যে শক্তি অনায়াসে ঘোষণা করে "যা পেয়েছি, যা দেখেছি তুলনা তার নাই"—যে শক্তি, যা-পাই নি তার হিসাব মিলায় না—জীবনে সন্তোষ লাভের, সকল অবস্থাকেই আনন্দে পরিণত করবার এই শক্তি রবীন্দ্রজীবনের মহত্তম বল। জগতের কবিদের মধ্যে শিল্পীদের মধ্যে এ সহজলভ্য নয়।—সাধকের ধার্মিকের ও ন্যায়পরায়ণের যে পথ, যে অন্তর্নিহিত গভীর মানব-হিতৈষণা অনায়াসে উচ্চ-নীচ শিক্ষা-অশিক্ষা সকল ভেদ মুছে দিয়ে মানুষকে মানুষের কাছে নিয়ে আসে, রবীন্দ্রনাথের জীবনে অতি অল্প বয়স থেকে নানা সম্বন্ধের মধ্য দিয়ে সে কথা কত সত্য হয়ে প্রকাশ পেয়েছে তা আমরা একমাত্র পত্রসাহিত্যের মধ্য দিয়েই বুঝতে পারি।

ছয় খণ্ডে প্রকাশিত চিঠিপত্রে ভানুসিংহের পত্রাবলীব মত আশ্চর্য সাহিত্য যা শিশু সাহিত্যে একটি শ্রেষ্ঠ স্থান নিতে পারে, এ ছাড়াও বিভিন্ন ব্যক্তির কাছে লেখা হাজার হাজার চিঠি নানা পত্রপত্রিকায় অবিরতই দেখা যাচ্ছে ও দীর্ঘদিন ধরে দেখা যাবে, তার ভিতর দিয়ে সেই আশ্চর্য ব্যক্তিস্বরূপ কত রকমেই না প্রকাশ পাচ্ছেন। কিন্তু যৌবনে লেখা ছিন্নপত্রের মধ্যে পাই এক অভাবনীয় সমগ্রতা, যেন তাঁর ভূত ভবিষ্যৎ সমস্ত একত্রিত হয়ে, একদিকে তাঁর অনুভূতি উপলব্ধির বেদনা মথিত হয়ে,

গূঢ় গভীর অনির্দেশ্য ভাবলোক তরঙ্গিত হয়ে উঠছে, আর একদিকে প্রত্যহের বাস্তব জগৎ সুখদুঃখ-কাতর মানব-হৃদয়, হাল-লাঙ্গল-গরু-গোয়ালআলা বাংলাদেশের দুঃখপ্রপীড়িত আর্ত মানুষ তাঁকে ডাকছে কর্মের জগতে। এক দিকে আশ্চর্য সুন্দরী প্রকৃতি পদ্মার সোনালী বালুচরে রৌদ্রের খেলা, দিগন্তে সূর্যোদয়, জ্যোৎস্নামোদিত শশীসনাথ রাত্রি তাঁকে প্রবেশ করাচ্ছে বিশ্বের আনন্দলোকে, জড় বলে সসীম বলে কিছুই তিনি পৃথক করে দেখতে পারছেন না, তাঁর বিশ্ব ও বিশ্বেশ্বর এক হয়ে যাচ্ছে—আর একদিকে মানুষের লোকালয়, যেখানে শিক্ষা নেই, আলো নেই, জল নেই, পথ্য নেই—যেখানে মূঢ় মূক হৃদয়ের ক্রন্দন, সেখানের ডাক পৌঁছচ্ছে কবির হৃদয়ে। আজকের যুগের মানবসমাজের প্রধানতম বাণী রূপ নিচ্ছে কবির চিন্তায় —তাঁর উপলব্ধির গভীরে নূতন সমাজচেতনা পল্লীসংঘটন কর্মের পরিকল্পনায় মূর্ত হয়ে উঠেছে।

বস্তুত মনে হয় ছিন্নপত্রের মধ্যে কবিমানসের যে প্রতিকৃতি ধরা পড়েছে তা ক্রমে পূর্ণতর হয়েছে বটে কিন্তু পরিবর্তিত হয় নি। এই পত্রগুলিতে সেই নিঃসঙ্গ দিনগুলির মধ্যে এক বিরাট মানসের গড়ে ওঠার, রূপে রসে বিচিত্র হয়ে আমাদেব ভাবনাকে মুগ্ধ করে দেয়। বিস্ময়ের কথা এই যে, এই পত্রগুলি যাকে লেখা হয়েছিল সেই ইন্দিরা দেবীর বয়স তখন ছিল তের থেকে চৌদ্দ। এ থেকে সেই শক্তিমতী মহিলাব শিক্ষার ও বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা অনুমান করা যায়। তবু সকলেই জানেন এই ছিন্নপত্রগুলি রবীন্দ্রনাথ স্বহস্তে কেটে ছেঁটে প্রকাশযোগ্য একটি সংকলন করেছিলেন—পত্রগুলি সম্পূর্ণ নয় বলেই ছিন্নপত্র—এতে আমার পূর্বের অভিমত সমর্থিত হয়। অবশ্য তখন কবি চিঠিগুলির মধ্যের সমস্ত ব্যক্তিগত ও পারিবারিক উল্লেখ বাদ দিয়ে বিশুদ্ধ সাহিত্যরস ছেঁকে তুলে ছিলেন। সম্প্রতি সেই কর্তিত অংশের অনেকগুলি পুনরুদ্ধার করে ছাপা হওয়ায় আমরা কবিব পারিবারিক জীবনের যে ছবিটি পেলাম তা মূল্যবান। সন্তান-বৎসল পিতা রূপে, পাবিবারিক মানুষ রূপে এই বিশ্বনন্দিত মানুষকে দেখতে আমাদের ভাল লাগে। তিনি যখন তাঁর মোটা সোটা বাচ্চা মেয়েটির উপুড় হওয়া মূর্তির বর্ণনা করেন তখন আমাদের মনের মধ্যে সমধর্মী মন সেই পিতৃহৃদয়কে নিজের একান্ত সন্নিকটে পায়। রবীন্দ্রনাথ যে মানুষ, আমাদেরই মত নানা সম্বন্ধযুক্ত সুখ দুঃখ ভার বহন করে এই পৃথিবীর ধূলামাটিতে বাস করে গেছেন সে সত্য তাঁর চিঠিপত্রগুলির মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত হয়ে তাঁকে আমাদের একান্ত ঘনিষ্ঠ করে দেয়। এর ফলে হয়তো এই পূজাপ্রবণ দেশে ভবিষ্যতে তাঁর মূর্তি বানিয়ে তার সামনে চাল-কলার নৈবেদ্য দেবার ইচ্ছাটি না আসতেও পারে।

তিনি যে মানুষ সেইটাই মানুষের গৌরব। আমাদের যুগে আমাদের দেশে সর্বাঙ্গীণ মানবতার পুর্ণ প্রকাশ আমরা দেখেছি। মানুষ তার সমস্ত অন্তরাত্মা, বুদ্ধি মন, স্নেহ প্রেম, বিচিত্র উপলব্ধির শক্তি দিয়ে যা হয়ে উঠতে চায় কিন্তু পারে না তিনি সেই আকাঙ্ক্ষারই মূর্তরূপ হয়ে এই বাংলাদেশের মাটিতে আবির্ভূত হয়েছিলেন এই সত্য তাঁর সমগ্র কাব্য সাহিত্য ও কর্মের মধ্যে দিয়ে আমাদের বুদ্ধিকে স্পর্শ করে, আর পত্রসাহিত্যের মধ্যদিয়ে আমাদের হৃদয়েব ঘনিষ্ঠতম প্রান্তে পৌছয়।

একটি সকালে

শতবার্ষিকী উপলক্ষে কিছুদিন ধরে রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধে বহু কথা লেখা হয়েছে তার মধ্যে তাঁর ব্যক্তিগত পরিচয়, মানুষ রবীন্দ্রনাথের পরিচয় প্রকাশ করবার ইচ্ছাও তাঁর নিকটস্থ পরিচিত ব্যক্তিদের মধ্যে খুবই প্রবল হয়েছে। সে আশ্চর্য পুরুষকে প্রত্যক্ষ করবার সৌভাগ্য যাঁদের হয়েছে সে সৌভাগ্য পাঁচজনের সঙ্গে ভাগ করে নেবার ইচ্ছাটা স্বাভাবিক। কিন্তু সাধ এবং সাধ্যব মধ্যে পার্থক্য আছে। রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত পরিচয়, তাঁর উপস্থিতির আনন্দময় মাধুর্য, তাঁর নৈকট্যের অনির্বচনীয় সৌগন্ধ শুধু কতগুলি কথপোকথনের বিবরণ দিয়ে প্রকাশ করা যায় না, কারণ যদি বা বহু সাধনায় কেউ যথাযথ অনুলেখন করতেও প্যারেন তাঁর সঙ্গে যোগ করতে পারেন না সেই স্বর্ণ ঝংকৃত কণ্ঠস্বর যা বাক্যকে বাক্যের অতীত মাধুর্যে ভরে দিত আর যোগ করা যায় না নীরবতার সেই গভীর ব্যাপ্তি যা পটভূমি রূপে থেকে দৈনন্দিন তুচ্ছ কথাবার্তার মধ্যেও নূতন ব্যঞ্জনা আনত। বাক্যকে পুনরুচ্চারিত করা যায় কিন্তু অনুচ্চারিত বাণীর শক্তি থাকে অব্যক্ত।

রবীন্দ্রনাথের হাস্যকৌতুকের কথাবার্তার মনোহরণ দিব্য দ্যুতির সঙ্গে সঙ্গেই বিলগ্ন থাকত এক গভীর নৈঃশব্দের পরিমণ্ডল সেই নৈঃশব্দের অনির্বচনীয়তাই তাঁর বাক্যের মধ্যে বাক্যাতীতের সংস্পর্শ অন্যের অনুভবে সঞ্চারিত করত। তিনি যখন চুপ করে বসে থাকতেন সে এমনি এক আশ্চর্য রকম চুপ করা যা আমরা সাধারণত কল্পনায় আনতে পারি না। কোনো সাধন ভজন নিধিধ্যাসন নয়—শুধু আত্মস্থ নীরবতার এক গভীর শক্তি দিব্যদ্যুতির মত চারপাশে ছড়িয়ে পড়ত। বিশেষত অতিপ্রত্যুষে সূর্যাভিমুখী হয়ে যখন বসতেন কোলের উপর রাখা দুহাতের আঙ্গুল-গুলি পরস্পর সম্বন্ধ—সামনের দৃশ্যপট ছাড়িয়ে অদৃশ্যে নিবদ্ধ দৃষ্টি সেই মূর্তি থাকত বিগ্রহের মত স্থির, দুর্জ্ঞেয়। ঘণ্টার পর ঘণ্টা একটি আঙ্গুল না নেড়ে এক চুলও না সরে অমন স্থির হয়ে বসা সাধারণ মানুষের পক্ষে প্রায় অসম্ভব। সেই ভোরের আলোয় তাঁর চেয়ারের পাশে এসে যখন বসতুম তখনই তা বেশ বুঝতে পারতুম—কারণ উপনিষদে বর্ণিত বৃক্ষ ঃ ইবস্তব্ধ ভাবটিতো সহজ নয়—চুপ করে বসতে গেলেই শরীরের নানা স্থানে উৎপাত সুরু হয়, হয়ত কানের কাছটা সুর্‌ সুর্‌ করতে লাগল নয়ত বা পায়ে ঝিঁঝিঁ ধরল একটা না একটা ছোটখাটো উপসর্গ ঘটে নড়া চড়া অবশ্যম্ভাবী করে তোলে। আজকের আধুনিক মানুষদের স্তব্ধ হয়ে বসতে আমরা বড় একটা দেখি না।

বিচিত্র রসাস্বাদনে উন্মুখ বিকশিত চিত্তবৃত্তির সঙ্গে এই আত্মস্থ প্রশান্তির সংযোগের অনির্বচনীয়তা যাঁরা দেখেননি তাঁরা সেই মহাকবির কবিত্বের একটি বিশেষ প্রকাশই দেখতে পেলেন না যে প্রকাশ অনুচ্চারিত অশব্দিত ভাবতরঙ্গে নিষ্যন্দিত হয়েছে।

আমাদের পাহাড়ের দেশ কীট-পতঙ্গের রাজ্য বললেই হয়। বিশেষ বর্ষা ঋতু সমাগমে কত বিচিত্র কীট আলোর টানে এসে ঢুকত তার শেষ নেই—তার মধ্যে ডানা মেলা নানা রং-এর ঢেউতোলা এনামেল করা পুষ্প খচিত সুকুমার সুন্দর প্রাণীও অনেক ছিল আবার বিরাটাকার পাঁচ ইঞ্চি লম্বা এক আঙ্গুল পরিধি বিশিষ্ট সহস্রপদী কেন্নুই অজস্র এসে ঘরে ঢুকত যেগুলো দেখলেই সর্বশরীর শিউরে ওঠে। ভোর বেলা তারা বারান্দায় স্বেচ্ছাসুখে প্রাতর্ভ্রমণ করত যতক্ষণ না বনমালী এসে একটি ছোট টিনে কেরাসিন ভরে আর একটি লাঠি দিয়ে তাদের সংগ্রহ করে তুলে নিয়ে কীটদের পরলোকে পাঠিয়ে দিত।

একদিন এমনি প্রত্যুষে কবি বসে আছেন পূর্বদিকে মুখ করে—সবে ভোরের আভাস দেখা দিয়েছে পাহাড়ের আড়াল থেকে, আমি আমার অভ্যাস মত চেয়ারের পিছনে [illegible] স্থানটিতে নিঃশব্দে বসবার জন্য এসে স্তম্ভিত হয়ে গেলুম। একটি স্থূলকায় কেন্নুই চেয়ারের হাতল বেয়ে উঠে ধীরে ধীরে হাতের উপর দিয়ে বেয়ে পিঠের কাছ দিয়ে অন্য হাতের দিকে চলেছে তার এই দেহ পরিক্রমায় চমকে উঠে সরিয়ে ফেলার সহজ প্রবৃত্তি হবে না এমন ভাবতেও পারা যায় না। কিন্তু কবি বসে আছেন ঊষার মৃদু আলোতে পার্বত্য প্রকৃতির মধ্যে তারই একটি অংশের মত স্থির নিষ্কম্প। আমি দাঁড়িয়ে রইলাম বিমূঢ়; জানিনা কি কর্তব্য, ওটাকে ফেলে দিয়ে এই নীরবতা খণ্ডিত করা যেন মন্দিরের পবিত্রতাকে মলিন করে দেওয়া।

কেন্নুইটা যখন তার সহস্র পদের সুর সুরি দিয়ে ঘাড়ের নীচ দিয়ে চলেছিল তখন কেন তিনি হাত দিয়ে সরিয়ে সেটা ফেলে দিলেন না, তা কোনো ব্যাখ্যা দিয়ে বোঝান কঠিন। তিনি ধ্যানেও মগ্ন ছিলেন না, সোজা চোখ খুলে তাকিয়ে ছিলেন ঊষার আভাস জড়ান আকাশের দিকে। যেন ঐ নৈঃশব্দের ভিতর দিয়ে মহাকবির কবিতায় এক গভীরতম সুর বিশ্ববন্দনা করছিল তার ছন্দপতন ঘটান ছিল অসম্ভব।

বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ

বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে নূতন করে একটি কথার আলোচনা হচ্ছে যে, সমসাময়িক হয়েও রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ এই দুই বিরাট পুরুষ পরস্পরের সম্বন্ধে নীরব ছিলেন কেন। তাঁদের পরস্পরের প্রতি মনোভাব কি ছিল! বলা বাহুল্য এতদিন পরে সে নীরবতার মর্মভেদ করতে গেলে অনেকটাই কল্পনা ও অনুমানের আশ্রয় নিতে হয়, অনেকেই তাই নিয়েছেন। এই নীরবতা যে একটু বিস্ময়কর তাতে সন্দেহ নেই, কারণ বহু বিষয়েই তাঁদের কর্ম ও মতের ঐক্য ও সাদৃশ্য আমরা লক্ষ্য করতে পারি।

সমাজচেতনা ও মানবমূল্য বোধ, দুজনেরই কর্মের প্রেরণার মূলে এই দুটি ভাব প্রবল। বিবেকানন্দ ধার্মিক, বৈদান্তিক, আবার তিনি একজন প্রবল হিন্দু কিন্তু সে ধর্ম, সে হিন্দুত্ব লোকাচার নয় সংস্কারের বন্ধনমাত্র নয়। মানব-ভাবনার যা কিছু শ্রেষ্ঠ ভাব দেশপ্রেমের রসায়নে তিনি যেন সে সমস্তকেই 'হিন্দু' করে নিয়েছেন। তাই তখনকার দিনের আচারবদ্ধ সমাজ তাঁকে বদ্ধ করতে পারে নি। তিনি জনসাধারণের মধ্যে, পতিতের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছেন 'ভাতের হাঁড়ি'র ধর্ম চুরমার করে দিয়ে। ডাক দিয়েছেন ভারতবর্ষের তাঁতি জোলা মুচি চাষী সকলকে।

রবীন্দ্রনাথও ধনী, কবি এবং এক নূতন ধর্ম-অভ্যুদয়ের মধ্যে তাঁর জন্ম, তবু তাঁর ঐশ্বর্য, কবিত্ব, সুকুমার শিল্পবোধ ও যুক্তিবাদী ধর্ম, কিছুই তাঁকে কুসংস্কারাচ্ছন্ন মূঢ় জনসাধারণের কাছ থেকে সরিয়ে রাখে নি। তিনিও নেমে এসেছেন তাদেরই মধ্যে যাদের কর্মক্ষেত্রে ঘর্ম পড়ে ঝরে,' যোগ দিয়েছেন তাদেরই কাজে যারা 'দীনের অধম দীন'।

জনগণের আপন সুপ্ত শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করা, তাদের শ্রদ্ধার সঙ্গে স্নেহের সঙ্গে জাগিয়ে তোলা, তাদের সর্বাঙ্গীণ কুশল চেষ্টায় নানা কর্মের সূচনা করা, এ সবাই দুই মহাপুরুষের কর্ম জীবনের লক্ষ্য। দেশে এবং বিদেশে তাঁদের চিন্তা এবং কর্মের ঐক্যই সহজে লক্ষ্য হবে। দুজনেই সভ্যতাগর্বিত ইয়োরোপ ও আমেরিকায় ভারতবর্ষের যা শ্রেষ্ঠ চিন্তা, তার সংস্কৃতির যা শ্রেষ্ঠ ফল তাই হাতে রাজার মত বেশে, দাতার মত বেশে গিয়েছিলেন। সে যুগ ছিল এশিয়ার মানুষের ইউরোপের কাছে শিক্ষানবিসীর যুগ, তারা কৃপাপার্থী রূপেই গর্বিত শক্তিমত্ত ইউরোপের কাছে নিজেদের দৈন্য প্রকাশ করত, তখন ভারতবর্ষের এই দুই মহাপুরুষ বিস্মিত ইয়োরোপের মাঝখানে দাঁড়িয়ে যেন বলেছিলেন, 'অয়ম্ অহং ভো—আমি এসেছি—ভারতের এই স্বরূপ দেখ।

রবীন্দ্রনাথ যখন বলেছিলেন যে আমাদের যা শ্রেষ্ঠ তা দিতে পারলে তবেই আমরা অন্যের যা শ্রেষ্ঠ তা দাবি করতে পারি, তখন এ কথা পূর্ণরূপে বোঝা সহজ ছিল না।

একজন জাপানী লেখকের কাছে শুনেছিলাম যে সে সময়ে জাপান ও সমগ্র এশিয়াতে ইউরোপের প্রভাব এমন ব্যাপক হয়েছিল যে 'পরের অশন পরের ভূষণ' তো বটেই জীবনের সর্বক্ষেত্রে অনুকরণের প্রবল স্পৃহায় তাড়িত মানুষ নিজেদের বহুদিনের শিক্ষা সংস্কৃতি ও সভ্যতা সমূলে উৎপাটিত করে ফেলেছিল। সেই সময়ে ইয়োরোপে ভ্রমণরত রবীন্দ্রনাথের আচার আচবণ বেশভূষার দিকে তাকিয়ে তাঁরা বুঝেছিলেন যে সভ্য হবার জন্য ইয়োরোপীয় হবাব কোন প্রয়োজন নেই। এ কথা বিবেকানন্দ সম্বন্ধেও একই রকম সত্য। তাই বলে অবশ্য যে কেউ কুর্তা বক্স জহবকোট বা প্রিন্সকোট পবে বিলেতে যাবে তাব সম্বন্ধেই এ কথা প্রযোজ্য নয়। তারা ভারতীয় সভ্যতাব যা কিছু শ্রেষ্ঠ ও সুন্দব তাই নিজেদের জীবনে ও কর্মে প্রতিফলিত করেছিলেন বলেই বাহ্য পোশাকও তাব সঙ্গতি রক্ষা করেছিল। দেশী কুর্তা পরেও আচার আচবণে যদি পরানুকরণপ্রিয়তা প্রকাশ পায় তাহলে পোশাকেব বাব। ত.ব শোধন হতে পাবে না। এ কথা আবার আজকের উন্মত্ত অনুকরণের দিনে মনে করাব প্রয়োজন হযেছে।

আবও একটা দিকে বিবেকানন্দ ও ববীন্দ্রনাথের কর্ম ও চিন্তাব ঐক্য আছে, দুজনেই তখনকাব সাধু সংস্কৃত ঘেঁষা বাংলায় যু। চলতি ভাষাব ব্যবহার শুরু করেন। এ বিষয়ে বিবেকানন্দ অগ্রণী। দুজনেব ব্যবহৃত কথ্যভাষাব অবশ্য অনেয় পার্থক্য রয়েছে কিন্তু সর্বসাধাবণেব ব্যবহৃত ভাষাকেই সর্বরকম চিন্তার বাহন করবার মূলে যে মানবহিতৈষণা সে একই। জনসাধাবণের সঙ্গে চিন্তার ভূমিতে মিলিত হবার ইচ্ছা, মানুষের গভীবতম ভাবনার উপর সকলের যে অধিকার ৺ ার ব্যূহ দ্বারা ব্যাহত করা হয়, সেই বাঁধ ভেঙে দিয়ে মানব মিলনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করা।

এমনি ছোট বড বহু বিষয়ের মিল আছে। কিন্তু পার্থক্যও আছে অনেক। সেই পার্থক্য চরিত্রের গভীরে স্থিত। যার ফলে এঁদের জীবনভঙ্গী সম্পূর্ণরূপে পৃথক হয়ে গেছে বললে বোধহয় ভুল বলা হয় না। স্বামী বিবেকানন্দ কেন কখনও রবীন্দ্রনাথেব উল্লেখ করেন নি, বা কবি রবীন্দ্রনাথ কেন তাঁর সম্বন্ধে উল্লেখ-যোগ্য কিছুই লেখেন নি এ কথা অনুমান করা কঠিন নয়। দুজনেই দু-জনের মহত্ত্ব নিশ্চয়ই বুঝেছিলেন কিন্তু চরিত্রগত ও ভাবগত পার্থক্যের জন্য পরস্পরের জীবনকে স্পর্শ করতে পারেন নি। এ কথা অনুমান করা হয়তো অসঙ্গত নয় যে বিবেকানন্দ যদি অত অল্প বয়সে না মারা যেতেন, তাঁর জীবন যদি আরও বহুতর

কর্মের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে প্রকাশিত হতে থাকত তাহলে ক্রমে তাঁরা নিশ্চয়ই নিকটে আসতেন যেমন এসেছিলেন মহাত্মা গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথ। উভয়ের মতানৈক্য তো উভয়েই প্রকাশ করেছিলেন কিন্তু সে মতেরই অনৈক্য মাত্র তার বেশি নয়।

আজ অনেকে রবীন্দ্রনাথের লিখিত ও উক্ত দু-চারটি কথা উল্লেখ করে বলতে চান যে তিনি বিবেকানন্দ সম্বন্ধে উদাসীন ছিলেন না। কিন্তু ওই অকিঞ্চিৎকর উল্লেখগুলির চেয়ে নীরবতাই তার অধিকতর প্রমাণ। এ কখনও সম্ভব নয় যে এই প্রাণহীন অর্ধমৃত দেশে দুই জ্যোতিষ্ক পরস্পরকে লক্ষ্যই করেন নি, কিংবা যদি বিরূপতাই পোষণ করতেন তারও প্রত্যক্ষ প্রমাণ থাকত। পরস্পরকে মহৎ ও শ্রদ্ধেয় জেনেও একমত না হবার মত যে চরিত্রের বৈশিষ্ট্য তাই এই নীরবতার কারণ। এবং সেই অনৈক্য এত সূক্ষ্ম ও সুকুমার যে তা ভাবায় প্রকাশ করতে গেলে তার উপরে ভার সয় না। অন্ততঃ রবীন্দ্রনাথ যে তাই মনে কবতেন তা তাঁর নিবেদিতার উপর লেখা প্রবন্ধটি পডলে বোঝা যায়।

নিবেদিতাকে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে দেখেছিলেন এবং এ কথা অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে নিবেদিতাকে যিনি জানেন তিনি তাঁব জীবনে তাঁর গুরুর প্রভাব ও অবিচল অস্তিত্বকেও জানেন। তবু বিস্ময়ের কথা এই যে, এই সুদীর্ঘ প্রবন্ধটিতে কোথাও রবীন্দ্রনাথ বিবেকানন্দের নাম উল্লেখ করেন নি। নিবেদিতার আত্মনিবেদন যে নৈর্ব্যক্তিক এক হিন্দুজাতির ভাবধারার কাছে নয়, তা যে একটি বিশেষ ব্যক্তির জীবনস্পর্শে উত্থিত হৃদয়োত্তাপ সুগন্ধ-বাষ্পের মত তাঁর চারিদিকের পরিমণ্ডল ব্যাপ্ত করেছিল, এমন হতে পারে না যে কবি তা জানতেন না বা অনুভব করেন নি। সাধারণ মানুষ দৈনন্দিন জীবনের শত নিরর্থকতার জালে ঘেরা, মানব সম্বন্ধের অনেক সূক্ষ্ম সুকুমার অথচ গভীর সত্যের খবরই রাখে না, তাদের কাছে তাই সাদা ভাষায় ছাপার অক্ষরে বলতে গেলে অনেক গূঢ় সুন্দর সত্যও স্থূল বোধ হয়, তাৎপর্য ভ্রষ্ট হয়। যে কথা শুধু কবিতায় বলা চলে সে কথা হয়তো গদ্যে প্রবন্ধে বলা চলে না। তা ছাড়া এ যুগের মানুষ যত সহজে মানবসম্বন্ধ নিয়ে অলোচনা করতে পারে এবং করা উচিত মনে করে সে সময়ে তা সম্ভব ছিল না। তাঁরা ছিলেন সমসাময়িক মানুষ, পরস্পরের ইচ্ছা অনিচ্ছাকে তাঁরা অতিক্রম করতে পারতেন না।

এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ নিবেদিতাকে 'সতী' বলেছেন, সতী শব্দের ধাতুগত অর্থ যাই হোক এর ব্যবহারিক অর্থে নৈর্ব্যক্তিক কোন সত্যের প্রতি নিষ্ঠা বোঝায় না— যেমন দেশপ্রেম জনকল্যাণ ইত্যাদি কর্মের প্রাত নিষ্ঠাকে সতীত্ব বলে না। সতী শব্দে

নারীর কোন বিশেষ ব্যক্তির প্রতি প্রেম ভক্তি নিষ্ঠা ও সমগ্রজীবনের আত্মনিবেদন প্রকাশিত হয়। সতী শব্দের ব্যবহারে তাই রবীন্দ্রনাথ পরোক্ষভাবে নিবেদিতার জীবনে বিবেকানন্দের অবিচল প্রভুত্বের কথাই বলেছেন।

'মহুয়া' কাব্যগ্রন্থে 'পথবর্তী' আর 'মুক্তরূপ' বলে দু'টি কবিতা আছে। এই কবিতা দুটিতে স্ত্রী ও পুরুষের মিলিত কর্মজীবনের যে কথাটি আছে সে 'চিত্রাঙ্গদা' কাব্যের বক্তব্যের চেয়ে ভিন্ন। কিন্তু 'পথবর্তী' কবিতায় নারী পুরুষের পার্শ্ববর্তিনী নয় আবার 'মুক্তরূপ' কবিতায় তাকে দেখি আর এক মূর্তিতে। চিত্রাঙ্গদা পুরুষের পার্শ্ববর্তিনী সহকর্মিণী—উভয়ের কর্মক্ষেত্রও এক। 'মুক্তরূপ' কবিতায় নারী তার জীবনের অর্ঘ্য এনেছে পুরুষকেই শক্তি দিতে, তাকে তার নিজ কর্মে প্রতিষ্ঠিত করতে—সে নারী পথবর্তিনী তরুর মত শুধু ছায়া দিয়ে সন্তাপ হরণ করবে না, কঠোরকে মধুর করাই তার একমাত্র করণীয় নয়। সে পুরুষের অজেয় আত্মার রশ্মিতে স্নাত, অকৃপণ মনে কর্মক্ষেত্রে মুক্তি দিচ্ছে, প্রেরণা দিচ্ছে সেই মানবকে যার শৌর্যে 'সূর্যের মহিমা' যে মর্তে 'তিমিরজয়ী প্রভু।' পূর্ণ আত্মনিবেদনের মধ্য দিয়ে শক্তি সঞ্চারণ করবার ক্ষমতার মধ্যে নারীর সার্থক প্রকাশ। আমরা শুনেছিলাম যে, এই কবিতাটি লেখবার সময়ে নিবেদিতার জীবনদীপ্তি কবির মনে পড়েছিল। যে দীপ্তি না হলে পুরুষের জীবনের আলো পূর্ণ প্রকাশিত হত না, আর একজনের ভক্তি ভালবাসা ও বিশ্বাসের বহ্নিমুখে উদ্দীপ্ত না হলে সে শক্তি হত না পূর্ণ অভিব্যক্ত।

নারীর এই শক্তিরূপ পুরুষের মুক্তরূপেই সার্থক। এই কবিতার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ একদা বলেছিলেন, "বিবেকানন্দ কি বিবেকানন্দ হতেন, যদি না নিবেদিতার আত্মনিবেদন লাভ করতেন?" (মংপুতে রবীন্দ্রনাথ) তখন আমরা নানা কথায় বুঝেছিলাম নিবেদিতার জীবনের কী গভীর সার্থকতার ছাপ কবির মনে আছে। সন্ন্যাসীর জীবনের সঙ্গে যোগ হল নারীর যে আসক্তিবিহীন অবারিত আত্মোৎসর্গ তখনকার যুগে এ দেশে তার আর কোন দৃষ্টান্ত কি ছিল? কোন যুগেই এমন দৃষ্টান্ত বেশী নেই, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই 'মোর রক্ততরঙ্গের মত্ত কলরবে বাণী তব মিশে ভেসে যায়।'

বিবেকানন্দ চলে গেলেন কিন্তু নিবেদিতার জীবনে প্রকাশিত রইলেন তাঁর গুরু। এ কথা বলা কঠিন যে বিবেকানন্দ যদি জীবিত থাকতেন তবে স্বাধীনতা সংগ্রামের যে পথ নিবেদিতা বেছে নিয়েছিলেন সেই পথেই তিনি অগ্রসর হতেন কিংবা রামকৃষ্ণ মিশনের মঠে মন্দিরে ও দরিদ্রনারায়ণের সেবাকর্মই তাঁর একটি মাত্র পথ থাকত কিংবা এ উভয়কেই অতিক্রম করে আরও কোন সত্যতর পথে,

উচ্চতর আদর্শে তিনি দেশকে আহ্বান করতেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ দেখেছিলেন পুরুষের বিপুল কর্মোদ্যমের পাশে, রণযাত্রার পথে, শ্রদ্ধার পাথেয় নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে নারী—বলছে :

"আমার প্রাণের শক্তি প্রাণে তব লহো,
মোর দুঃখ যজ্ঞের শিখায়
জ্বলিবে মশাল তব—"

সেই দুঃখযজ্ঞের আত্মাহুতি কবি দেখেছিলেন, কবির মন সে সতীর তপস্যা ভুলতে পারে নি। বহুকাল পরে লেখা 'মহুয়া'য় এই কবিতা সেই স্মৃতির পরিপূর্ণ ছবি।

রবীন্দ্রনাথ 'কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ' কথাটা নিয়ে অনেক কৌতুক করতেন, 'দরিদ্রনারায়ণ' কথাটাও তাঁর মনঃপুত ছিল না। নারীকে কামিনী বলা তার একটি বিশেষণ মাত্র, সে বিশেষণ মিথ্যা নয়, কিন্তু খণ্ডিত ; নারীর পূর্ণরূপ কি তা নিবেদিতার জীবননাট্যের দর্শকরূপে রবীন্দ্রনাথ দেখেছিলেন। ওই প্রবন্ধে তিনি লিখেছিলেন এবং মুখেও বলতেন, নিবেদিতার চরিত্রে অপরকে অভিভূত করবার ও স্বমতে চালিত করবার একটি প্রবলতা ছিল তা তাঁর ভাল লাগত না। কবি চিরদিন প্রত্যেক মানুষের জীবনকে সম্পূর্ণ স্বাধীন করে দেখতে চাইতেন, স্বাধীন মানুষ যদি তাঁর ভাব গ্রহণ করে তবে ভাল, নইলে জবরদস্তির পথ তাঁর নয়। নিবেদিতার জীবন তাঁর গুরুর দ্বারা সম্পূর্ণ অভিভূত—সেই মতের প্রভাব তাঁর জীবনসীমা পার করে সকলের মধ্যে বিস্তৃত করে দেওয়াই শিষ্যারূপে তাঁর কর্তব্য—'আমার গুরুকে আমি যেমন দেখেছি' তেমনি দেখুক সকলেই। আমাদেরও বিশ্বাস কোন নারীই সম্পূর্ণ স্বাধীন হতে পারে না। যে মুক্তপ্রেমে, যে অচলভক্তিতে, যে সতীর নিষ্ঠায় তার নারীত্বের পূর্ণরূপ, সেগুলি তার পক্ষে একসঙ্গে মুক্তি এবং বন্ধন। নিজের আত্মায় উদ্বোধিত সেই পরম শক্তিকে নিজের জীবন থেকে অন্যের জীবনে সঞ্চারিত প্রবাহিত করে দিতে পারলে তবেই সে উদ্বোধন সার্থক হয় কিন্তু তাতে একটু জোর লাগে হয়তো। নিবেদিতার হৃদয়োত্থিত যজ্ঞের আগুন থেকে জ্বলে উঠেছিল যে স্বাধীনতা যুদ্ধের মশাল, বিবেকানন্দের প্রবল দেশপ্রেমই তার ইন্ধন ছিল।

এ কথা আমরা বেদনার সঙ্গে মনে না করে পারি না যে কবির আশ্চর্য সঙ্গীতে জেগেছে যত বেদনা, যত সৌন্দর্য, যত ভক্তি ও প্রেম তা কোথাও এমন দৃঢ়মূল হতে পারল না। সত্যকে জীবন থেকে জীবনান্তরে নিয়ে যাবার ঐতিহ্য, ভারতবর্ষের নিজস্ব একটি রূপ তা রবীন্দ্রনাথ এবং মহাত্মা গান্ধী কারোর জীবনেই সফল হল না।

বিবেকানন্দ যা পেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ তা পান নি বলেই তাঁর আরব্ধ কর্মগুলির মধ্যে কারও চিত্ত ভাবৈকরসঃ হয়ে নেই। তা ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছে। কোনও জীবন থেকে উত্থিত হয়ে রবীন্দ্রনাথের জীবনবোধ, 'সেই অজেয় আত্মার রশ্মি', পরবর্তী কালের মানুষের কাছে প্রত্যক্ষ হয়ে উঠতে পারল না।

এ রবীন্দ্রনাথের এবং দেশের একটি বড় ক্ষতি। কিংবা যে যুগ এসেছে এখানে সূক্ষ্ম সুকুমার জীবন-সঙ্গীত 'জাজ' নৃত্যে পরিণত হয়ে যায়, প্রেম ভক্তি ও আত্মদানের পরম দীপ্তিকে ঊর্ধ্বমুখে জ্বালিয়ে তোলা অসম্ভব, তাকে যজ্ঞের শিখা না করে উনুনের আগুন করতে হয়—'শুধু অন্ন আর কিছু নয়'—তাই কবির বিজয়মাল্য থেকে একটি পুষ্প দাবি করতে পারে এমন কোনও কৃতাঞ্জলি এগিয়ে এল না।

রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজী

একই সময়ে একই দেশে দুজন এমন বিরাট যুগস্রষ্টার আবির্ভাব অভাবনীয় ঘটনা, তা ছাড়া পরস্পরের খুব নিকটে এসেছিলেন এঁরা, দেশের জাতীয় জীবনকে যুগোপোযোগী রূপ দিতে দু'জনের সাধনা ও মননা যুক্ত হয়েছিল সামাজিক, আধ্যাত্মিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে। এঁদের কর্ম ও জীবনের তুলনা সহজেই মনে আসে। কি ভাবে এই দুই পুরুষোত্তম পরস্পরকে প্রভাবান্বিত করেছিলেন—তাঁদের মধ্যে ঐক্য বা বিরোধ কতখানি তা নিয়ে কিছু কিছু আলোচনা হয়েছে—সেই আলোচনায় তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্যকেই লক্ষ্য করেছেন বিশিষ্ট চিন্তাবিদ্‌রা। গান্ধীজীবনী লেখক লুই ফিশার লিখেছেন—গান্ধী যদি হন ধান্যক্ষেত্র, রবীন্দ্রনাথ গোলাপ বাগান—কেউবা বলেছেন এঁরা দু'জনে জীবনের দুই দিকে দাঁড়িয়েছেন যে দুটি পরস্পরের পরিপূরক, এথিকস্‌ ও এসথেটিকস্‌—কিন্তু মঙ্গল ও সুন্দর দুটি পৃথক দিক নয়। একই সত্যের দুই ভাব। গান্ধীজী রাজনীতির মধ্যে এনেছেন কবিত্ব আর রবীন্দ্রনাথের কবিতায় রাজনীতি অনুস্যূত। যদি এই দুই সমসাময়িক ব্যক্তির দুখানি ফোটোগ্রাফ একত্র দেখা যায় তাহলেও মনে হবে যেন তাঁদের মধ্যে পার্থক্য অলঙ্ঘ্য। যেন তাঁরা দুইমুখী ভাবের দ্যোতক। যেন শিক্ষা সংস্কৃতি মূল্যবোধ ও মানসিকতায় দু'জনে বিপরীত।

একথাও মানতে হবে যে কোনো কোনো সমস্যার সম্মুখে দু'জনে একমত হতে পারেন নি। সেই মতপার্থক্যগুলি বিভিন্ন ঘটনার তৎকালীন পরিপ্রেক্ষিতে বিচার্য। কিন্তু মূল গান্ধী নীতি—বলতে আমাদের মনে যে কতগুলি মূল্যবোধ স্থির হয়ে আছে তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে—সত্যের জন্য সংগ্রামে অহিংস সাহসের প্রয়োগ। যুগ যুগ ধরে মানুষের ইতিহাসে সাহসকে দৈহিক বলের সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়েছে। বীর যোদ্ধার বীরত্ব প্রয়োগের ক্ষেত্রে দৈহিক বলই প্রযোজ্য—"অহিংস সাহসের" ব্যাপক প্রয়োগ ও "অহিংস বীরের" যুদ্ধ কাহিনী পৃথিবীর ইতিহাসে প্রায় নূতন ঘটনা। এ যুগে নৈতিক সাহসের দৃষ্টান্ত গান্ধীজীর একটি প্রধান দান।

দ্বিতীয় দান জীবনের সর্ব ক্ষেত্রে অহিংসার ব্যাপক পরীক্ষা। তৃতীয়ত সামাজিক পরিস্থিতিতে এই অহিংসারই প্রকাশ রূপে অসাম্য দূর করবার কার্যক্রম গ্রহণ—অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে আপসহীন সংগ্রাম। দারিদ্র্য ও অশিক্ষার বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য গঠনমূলক বিবিধ কর্মপ্রবাহ ও সংগঠন গড়া। মানুষের মুক্তির জন্য সর্বাঙ্গীণ প্রচেষ্টায় গ্রামকেন্দ্রিক পরিকল্পনা। এই সমস্ত কাজই নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে বিবেকচেতনায় বিধৃত

যে কতগুলি পরম ও চিরন্তন মূল্যবোধের দ্বারা, তার সঙ্গে দেশের ও সর্বমানব সমস্যার বিষয়ে তাঁদের উভয়ের চিন্তাধারার পার্থক্য ও সাজুয্য আলোচনা করলে তবেই এই দুই পুরুষোত্তমের চিন্তা ও বাক্যের গভীর ঐক্য বাগার্থের মতই সম্পৃক্ত বলে বোঝা যাবে।

অনেকে একথাও বলেন যে গান্ধীজী মূলত কর্মী, রবীন্দ্রনাথ কবি, সেখানেই তাঁদের প্রধান পার্থক্য—এটাও বিচার্য—রবীন্দ্রনাথ কবি হয়েও কর্মী, তাঁর কর্ম দেশ ও বিদেশে পরিব্যাপ্ত। তিনি সাহিত্য ও কবিতা নিয়ে তুরীয়ানন্দে বিভোর হয়ে দিন কাটান নি। দেশের বিচিত্র সমস্যা, কি রাজনৈতিক কি সামাজিক তাঁকে উদ্বেজিত করেছে—তিনি নির্দ্বিধায় হিত অথচ অপ্রিয় বাক্য বলেছেন। তাই এক্ষেত্রেও তাঁদের পার্থক্য আপাতদৃষ্টিতে বহিরঙ্গ ভাবে লক্ষ্য হলেও পূর্ণ সত্য নয়।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে গান্ধীজীর প্রথম যোগাযোগ ঘটে দীনবন্ধু এণ্ড্রুজের মাধ্যমে। এই ইংরেজ পাদ্রী সেই ঘোর ইংরেজ বিরোধিতার দিনে যে দুজনের মধ্যে একটি সেতু হয়েছিলেন এও তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গীর গভীর ঐক্যেরই দ্যোতক।

১৯১৩ সালে গান্ধীজী প্রবর্তিত দক্ষিণ আফ্রিকায় অভিনব সত্যাগ্রহ আন্দোলনের অভিঘাত সারা বিশ্বের সাধুজনের মনে এক নূতন পথের নির্দেশ দেয়। শান্তিনিকেতন থেকে এণ্ড্রুজ ও পিয়ার্সন দক্ষিণ আফ্রিকায় ঐ কাজের সামিল হতে যান। সেই সময়ে রবীন্দ্রনাথ এণ্ড্রুজকে লেখেন।

'You know our best love was with you, while you were fighting our cause in Africa along with Mr. Gandhi and others.

এই নাকি গান্ধীজী সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের প্রথম উক্তি।

কিন্তু এর বহু পূর্ব থেকে প্রথম জীবনের রচনার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ যেন একজন তেমনি নেতার অপেক্ষায় ছিলেন যাঁর অন্তর সম্পদ, আত্মার শক্তি, পাশব বলের থেকে মানুষকে উত্তীর্ণ করে মনুষ্যত্বের পথে নেতৃত্ব দেবে।

রবীন্দ্রনাথের জন্মকাল থেকেই ভারতে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা নানা ভাবে রূপ নিচ্ছিল। হিন্দুমেলায় ভারতের জাতীয় চেতনার অভিব্যক্তি ও ক্রমে কংগ্রেসের বিবিধ কর্মেও রবীন্দ্রনাথের চিন্তা সক্রিয়ভাবে সংযুক্ত হয়েছে। এর মাঝে মাঝে বিস্ফোরকের মত সন্ত্রাসবাদী প্রচেষ্টা যার মধ্যে অরবিন্দ ব্রহ্মবান্ধব প্রভৃতি মনস্বী ব্যক্তিদের উত্তম ছিল তা তাঁকে উদ্বিগ্ন করেছে। যখন বাংলা দেশের হৃদয় ক্ষুদিরাম প্রভৃতির আত্মত্যাগ ও শৌর্যকে অবলম্বন করে উদ্বেলিত হয়েছে তখনও রবীন্দ্রনাথ তার প্রতিকূলে দাঁড়িয়ে যুক্তি প্রয়োগ করেছেন সেই যুক্তি তাঁকে যে পথ দেখিয়েছে তা হিংসার পথ নয়।

রবীন্দ্রনাথের অল্পবয়সে প্রথম যে চিন্তা পরশাসন সম্বন্ধে আমরা পাচ্ছি সে স্বদেশী বা বিদেশী শাসক সম্পর্কে নয়—শাসকের গাত্রবর্ণ সম্বন্ধে অন্যান্য সাধারণের মত উৎকণ্ঠিত তিনি প্রথম থেকেই ছিলেন না। শাসনের পদ্ধতি শাসক ও শাসিতের সম্বন্ধ সম্বন্ধেই তিনি ভেবেছেন। মূল থেকে গঠন অর্থাৎ মানব চরিত্রের বিশেষ মূল্যবোধগুলিকে উজ্জীবিত করে মানব সম্বন্ধকে কলঙ্কশূন্য স্বার্থশূন্য সম্প্রীতির উপর প্রতিষ্ঠিত করতে। কোনো সাময়িক প্রয়োজনে তিনি চিরন্তন সত্যগুলিকে খর্ব করতে রাজী নন।

তাই দেশে যখন রাজা প্রজার সম্বন্ধ নিয়ে অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা, সামাজিক ও অর্থনৈতিব স্বাধীনতা সম্বন্ধে চিন্তার উন্মেষ ঘটছিল তখন প্রথম থেকেই রবীন্দ্রনাথ এই স্বাধীনতার একটি পূর্ণরূপ কল্পনা করছিলেন—সেই পূর্ণরূপের প্রতীক রূপে একজন দেশনায়কের মূর্তি বারবারই তাঁর মনে আসা যাওয়া করেছে—সেই নেতা, যিনি নিজে কিছু চাননা, যিনি সকল প্রকার ক্ষুদ্র আসক্তি মুক্ত। যিনি তাঁর অন্তরস্থ নির্দেশ দৈববাণীর মত শোনেন আর নিঃসংশয়ে ঘোষণা করেন 'পেয়েছ সত্য লভিয়াছি পথ' বা দীর্ঘ সাধনার শেষে যিনি বলতে সক্ষম—"আমার জীবনে লভিয়া জীবন জাগোরে সকল দেশ"—অর্থাৎ যিনি গান্ধীজির মতই বলতে পারেন 'আমার জীবনই আমার বাণী'।

যখন ভারতবর্ষে কংগ্রেস নামক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে নানা জাতির ছোট বড় নেতার কোলাহল শোনা যাচ্ছিল বা সন্ত্রাসবাদের ক্রুদ্ধ রাজনীতি বহু লোককে প্রমত্ত করে তুলছিল তখনও রবীন্দ্রনাথের সুচিন্তিত আত্মস্থ-বিবেক বাণী যে পথের নির্দেশ করছে তা গান্ধীজীর পন্থারই পথিকৃৎ। রবীন্দ্রনাথের ভাগিনেয়ী সরলা দেবী ছিলেন তখনকার দিনের একজন তেজস্বিনী নেত্রী। তিলক ছিলেন তাঁর আদর্শ এবং সে সময়কার সন্ত্রাসবাদী যুবকবৃন্দের সঙ্গে, তাঁর যোগাযোগ ছিল শোনা যায়। শুনেছি মহর্ষি বলেছিলেন, আগেকার দিন হলে তলোয়ারের সঙ্গে এই কন্যার বিবাহ দিতাম। তাঁর বিবাহ হয়েছিল রামভুজ দত্ত চৌধুরীর সঙ্গে জালিওনালাবাগের দুর্যোগের সময় যাঁর বিরুদ্ধে মৃত্যুদণ্ড ঘোষিত হয়েছিল পরে অবশ্য তার নাকচ হয়ে যায়। এই তেজস্বিনী মহিলা সে সময়ে বাঙালীর শৌর্য বীর্য উদ্যমের প্রেরণা জাগাতে বীরাষ্টমী ব্রত পালনের উৎসব করেন ও প্রতাপাদিত্যকে বাঙালীর কাছে বীরত্বের আদর্শ রূপে ঘোষণা করেন সে সময় থেকেই প্রতাপাদিত্যকে দুই কারণে মহাবীর বলে পূজা করা হয়। প্রথমত তিনি দিল্লীর বাদশাকে অগ্রাহ্য করে তাঁর স্বাধীন সত্তার দৃঢ়ত্ব দেখিয়েছেন। দ্বিতীয়ত প্রয়োজন বোধে তিনি স্নেহ মায়া মমতা বিসর্জন দিয়েও কর্তব্য কর্মে অটল থেকেছেন। সন্ত্রাসবাদীদের কাছে তখন একটি বড় ধর্ম ছিল

বিনা দ্বিধায় ক্রূর কর্ম করবার ক্ষমতা অর্জন। কিন্তু শান্তি ও প্রেমের প্রতীক কবির বাণী অহিংসার মূল সত্য থেকে বিচ্যুত হতে রাজি নয়। উদ্বেল দেশপ্রেমের জোয়ার যখন এরকম নানা কাজে উদ্দীপিত তখন তিনি বৌঠাকুরাণীর হাট উপন্যাস অবলম্বনে প্রায়শ্চিত্ত নাটকখানিতে প্রতাপাদিত্যের পৌরষকে ক্রূরতারই প্রতিরূপ বলে নিন্দা করেন। ১৯০৯ সালে এই নাটক লেখা হয় ১৯০৫-এ বোমার মামলার পর সন্ত্রাসবাদীদের বীরত্বে সারা দেশে যখন বাহুবলের ও কার্যসিদ্ধির নীতি গৃহীত তখন প্রতাপাদিত্যের কর্মে ক্রূরতায় নিন্দা—রবীন্দ্রনাথের আত্মস্থ সত্য দৃষ্টির এবং সাহসের একটি বিশেষ পরিচয়।

প্রতাপাদিত্য খুড়া বসন্ত রায়কে গুপ্ত হত্যা করতে মন্ত্রীর দুর্বলতা দেখে বলছে :—

"তুমি শিশু! খুন করাকে তুমি জুজু বলে জান। তোমার বুড়ি দিদিমার কাছে শিখেছ খুন করাটা পাপ! খুন করাটা যেখানে ধর্ম সেখানে না করাটাই পাপ। এটা তোমার এখনও শিখতে বাকী আছে যে মুসলমান আমাদের ধর্ম নষ্ট করেছে। তাদের যারা মিত্র তাদের বিনাশ না করাই অধর্ম। পিতৃব্য বসন্ত রায় নিজেকে ম্লেচ্ছের দাস বলে স্বীকার করেছেন। ক্ষত হলে নিজের বাহুকেও কেটে ফেলা যায়।"

বলা বাহুল্য গান্ধীজী ও রবীন্দ্রনাথ উভয়েই কোনো অবস্থাতেই খুন করাটা ধর্ম বলে মানতে রাজি নন।

রবীন্দ্রনাথের কাছে তিনিই নেতা যাঁর মধ্যে মানবোচিত সবগুলি গুণই সমাহৃত হয়েছে। প্রয়োজনের খাতিরে যে নিষ্ঠুর হতে পারে নিষ্ঠুরতা তার চরিত্রে যে বিকার ঘটাবে তা তার সর্বাঙ্গীণ মনুষ্যত্বের পরিপন্থী—এমন মানুষের হাতে অন্য মানুষের ভার থাকা বিপজ্জনক। ন্যায় অন্যায়ের একটি ধ্রুবত্ব ছাড়াও এই নাটকের ধনঞ্জয় বৈরাগী যিনি প্রজাদের মধ্যে জীবন সঞ্চার করেছেন তিনি যেন গান্ধীজীরই প্রতিরূপ। সম্পূর্ণ অহিংস, সত্যে দৃঢ় ও মানবসত্যের অনুসন্ধানী এই রকম কতকগুলি চরিত্র রবীন্দ্রনাথের রূপক নাট্যগুলিতে বার বার দেখা দিয়েছে। রাজর্ষি উপন্যাসে বিল্বনঠাকুরও এই ধরণেরই একটি চরিত্র।

গান্ধীজী নানা উপলক্ষে বলেছেন তাঁর কোনো শত্রু নেই তিনি ইংরেজের শত্রু নন—বরং তাঁর কাজ ইংরেজেরও মঙ্গল সাধন—ইংরেজের পরশোষণ নীতির তিনি সংশোধন চান। কিন্তু ইংরেজের অনিষ্ট করতে চান না। প্রায়শ্চিত্ত নাটকে বসন্ত রায়ের মুখে রবীন্দ্রনাথ তাঁর বক্তব্য বলেছেন—"তলোয়ার যে এমন ভয়ানক জিনিস তাতেও শত্রুর শত্রুত্ব নাশ করা যায় না। কেমন করে বলব নাশ করা যায়?

রোগীকে বধ করে যে রোগ আরোগ্য করা সে কেমনতর আরোগ্য, কিন্তু সঙ্গীত যে এমন মৃদু জিনিস তাতে শত্রু নাশ না করেও শত্রুত্ব নাশ করা যায়।"

বস্তুত যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ গান্ধীর সংগ্রামই ছিল শত্রুত্বের বিরুদ্ধে। শত্রুত্ব বা বৈরীভাব নাশ করাই ছিল তাঁর মূল নীতি। তিনি এমনই সংগ্রামের পদ্ধতি নিয়েছিলেন যেখানে প্রতিপক্ষ আছে কিন্তু শত্রু নেই।

এই 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটক পরে যা 'পরিত্রাণ' নামে আবার লেখা হয়েছিল এই দুইটিতেই এমন অনেক বর্ণনা আছে যা লবণ আইন আন্দোলনের মেদিনীপুরের অহিংস সত্যাগ্রহীদের কথা মনে পড়ায়।

প্রতাপাদিত্য হচ্ছেন সেই প্রভুত্ব শক্তিরই প্রতীক 'গান্ধারীর আবেদন' নাটকে দুর্যোধনেরই মত—যিনি প্রজার হৃদয়ে প্রীতির আসন চান না তিনি বলদর্পে সন্ত্রাস সৃষ্টি করতে চান—দুর্যোধন বলছে—"প্রীতি দান স্বেচ্ছার অধীন, প্রীতি ভিক্ষা দিয়ে থাকে দীনতম দীন সে প্রীতি বিলাক তারা পালিত মার্জারে, দ্বারের কুক্কুরে আর পাণ্ডব ভ্রাতাবে, আমি চাহি ভয়—সেই মোর রাজপ্রাপ্য।"

প্রতাপাদিত্যও এই চণ্ডশক্তির দ্বারাই রাজপ্রাপ্য আদায় করতে চান তখন ধনঞ্জয় প্রজাদের বলেন, "রাজাকে গিয়ে বলবে—ঘরের ছেলেমেয়েকে কাঁদিয়ে যদি তোমাকে টাকা দিই তাহলে আমাদের ঠাকুর কষ্ট পাবে।"··· অহিংস সত্যাগ্রহের একটি পূর্ণ চিত্র রয়েছে ধনঞ্জয় বৈরাগী ও মাধবপুরের প্রজাদের বিদ্রোহের বর্ণনায়।

শুধু এ দুটি নাটকেই নয় ১২৯২ সালে লেখা রাজর্ষি উপন্যাসের মূল কাহিনীও অহিংসারই বাণী। বাংলাদেশ শক্তি সাধনার ক্ষেত্র আর গান্ধীজীর চারপাশে ছিল জৈন আবহাওয়া। বাংলাদেশে বৈষ্ণবরাও মাংসাহারী না হলেও মৎস্যাহারী। পশুবলি বন্ধে সে সময় বাঙালীর কোনো দ্বিধা ছিল না—ব্রাহ্ম সমাজের পরিবেশে ধর্মের নামে পশুবলি অবশ্যই রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে আপত্তিজনক। ত্রিপুরার রাজ-পরিবারের কাহিনী অবলম্বনে একটি স্বপ্ন দেখে রচিত এই উপন্যাসে মন্দিরে পশুবলির বিরুদ্ধে রাজা গোবিন্দমাণিক্যের চরিত্রে রবীন্দ্রনাথ যে অহিংস, সংকল্পে দৃঢ়, কায়িক আঘাতের সামনে আত্মার শক্তিতে বিজয়ী মানুষটিকে রূপ দিয়েছেন সেই আদর্শ পুরুষের মধ্যে এক সঙ্গে রাজনীতি, সমাজনীতি ও ধর্মের যে অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ প্রকাশ পেয়েছে, পরবর্তীকালে মহাত্মার জীবনেও আমরা তাই দেখছি। গোবিন্দমাণিক্য দেখলেন পশুবলির রক্ত ও একটি বালিকার বেদনা। সেই বেদনাই তাঁকে চিরাচরিত ধর্মানুষ্ঠানের মধ্যে—অধর্ম কোথায় তা দেখিয়ে দিল। এই কাহিনী অবলম্বনে রচিত বিসর্জন নাটকে গোবিন্দমাণিক্য একলা যুদ্ধ করছেন বহু শত্রুর সঙ্গে—এই শত্রুরা কে? আর নয় কেহ "নীচ স্বার্থ, নিষ্ঠুর ক্ষমতাদর্প, অন্ধ

অজ্ঞানতা, চির রক্তপানে স্ফীত হিংস্র বৃদ্ধ প্রথা।" যে প্রথা ছাগ রক্তপাত বন্ধ হলে নর রক্তপাত ঘটাতে দ্বিধা করে না তারই দিকে ইঙ্গিত করে মনে পড়িয়ে দিলেন ধর্মের নামে কত রক্তস্রোত মানুষ বহিয়েছে—তাই প্রেমময়ী অপর্ণার আহ্বান "ও মন্দির ছেড়ে চলে আয়"—ধর্মের নামে সম্প্রদায়ের নামে যে রক্ত ধর্মের অভিভাবকরা পাত করেছেন সেই রক্তপাতের অমোঘ যুক্তি—রঘুপতি মুখে শোনা গেল—"পাপপুণ্য কিছু নাই। কেবা ভ্রাতা, কেবা আত্মপর! কে বলিল হত্যা-কাণ্ড পাপ! এ জগৎ মহা হত্যাশালা। জানো না কি প্রত্যেক পলক পাতে লক্ষকোটি প্রাণী চির আঁখি মুদিতেছে।......হত্যা অরণ্যের মাঝে, হত্যা লোকালয়ে হত্যা বিহঙ্গের নীড়ে কীটের গহ্বরে......হত্যা জীবিকার তরে হত্যা খেলাচ্ছলে...

...চলেছে নিখিল বিশ্ব হত্যার তাড়নে ঊর্ধ্বশ্বাসে প্রাণপণে, ব্যাঘ্রের আক্রমে মৃগসম। মুহূর্ত দাঁড়াতে নাহি পারে মহকালী কাল স্বরূপিণী রয়েছেন দাঁড়াইয়া তৃষাতীক্ষ্ণ লোল জিহ্বা মেলি।"

শক্তিপূজক মহাকালীর উপাসক বাঙালীর রাজনীতি ক্ষেত্রে এই যুক্তি বার বার নানা ভাবে প্রকাশ পেয়েছে। মানবধর্ম ভ্রষ্ট এই স্বার্থ সাধনের কুযুক্তি এমন একটা আইডিয়া বা ভাব হয়ে উঠেছিল যে তা অনেক সদ্‌গুণ বিভূষিত অনন্য শক্তিশালী মানুষেরও বিভ্রান্তি ঘটিয়েছে। রবীন্দ্রনাথও 'আইডিয়া'র উপাসক কিন্তু তাঁর স্পষ্ট স্বচ্ছ দৃষ্টি দেখেছে যে জবরদস্তির দ্বারা যে জয়, সে ভাবের বা আইডিয়ার জয় নয়।

"In my worship of ideas I am not a worshipper of Goddess Kali."

এই মতে তিনি চিরকাল অটল—

রাজর্ষি উপন্যাস ও বিসর্জন নাটকে তাই রঘুপতির যুক্তির সত্যকে উচ্চতর সত্য দিয়ে খণ্ডন করেছেন কবি। সে হচ্ছে স্নেহ, দয়া, ক্ষমা অর্থাৎ মানবতার যুক্তি। এখানে রাজশক্তি ও পুরোহিত শক্তির যে রাজনীতির খেলা চলেছে সেখানেও রবীন্দ্রনাথের আদর্শ পুরুষ গোবিন্দমাণিক্য অস্ত্রের বিরুদ্ধে অস্ত্রাঘাত না করে হত্যায় উদ্যত নক্ষত্ররায়কে প্রেমে পরাভূত করে তার বিবেক উদ্দীপ্ত করতে চেয়েছেন। গোবিন্দমাণিক্যের সেই আক্ষেপ—"জানিয়াছি দেবতার নামে মনুষ্যত্ব হারায় মানুষ।" ধর্মের নামে সম্প্রদায়ের নামে যে নরহত্যা মানুষের ইতিহাসে রক্তে কলঙ্ক চিহ্ন এঁকে চলেছে এবং ক্রমেই ভারতবর্ষের রাজনীতি ক্ষেত্রে যা চণ্ডমূর্তিতে দেখা দেবে, এখানে যেন সেই ভবিষ্যৎ বাণী শোনা যাচ্ছে—বিশেষ করে এ কাহিনীর শেষ দিকে সাধু চরিত্র অহিংস কর্মী বিল্বনের উক্তিতে "না মহারাজ মানব হৃদয়ই

প্রকৃত মন্দির। সেই খানেই খড়্গ শাণিত হয় এবং সেই খানেই শত শহস্র নরবলি হয়। দেবমন্দিরে তাহার সামান্য অভিনয় হয় মাত্র।"

এই বিল্বন ও গোবিন্দমাণিক্য দুই জনের একত্রিত রূপই এক আদর্শ পুরুষের মূর্তি। বিল্বন কর্মী—রবীন্দ্রনাথের সমস্ত নাটকেই আদর্শ চরিত্রগুলি বঞ্চিত হতভাগ্য মানুষদের সেবার ব্রত। তারা জাতিভেদের পরোয়া করে না। সম্প্রদায়ের উর্ধ্বে নিচের তলার মানুষদের মধ্যে নানা কর্মে অক্লান্ত থেকে মনুষ্যত্বের উদ্বোধনেই তাদের সার্থকতা, বিশেষ করে মুসলমানদের মধ্যে থেকে তাদের আনুগত্য লাভও এ সব কাহিনীতে বিশেষ উল্লেখযোগ্য "তিনি (বিল্বন) পীড়িত পাঠানদিগকে সেবা করিতে লাগিলেন—তাহাদিগকে পথ্য, পানীয় ঔষধ এব তাহাদের মৃতদেহ গোর দিতে লাগিলেন। হিন্দুরা হিন্দু সন্ন্যাসীর অনাচার দেখিয়া আশ্চর্য হইয়া গেল।"……

গান্ধী মহারাজকেও ভাঙ্গীপাড়ায় বাস করতে ও মুসলমানদের প্রতি তাঁর সপ্রীতি ব্যবহার দেখে হিন্দুরা কম আশ্চর্য ও ক্রুদ্ধ হয় নি।

বাল্মিকী-প্রতিভাতে (১৮২৭) ধর্মের নামে বাল ও ক্রুর বৃত্তির বিরুদ্ধে কবি' বাণী প্রথমে অস্ফুট কাকলীর মত শোনা গিয়েছিল তা ক্রমে পরিস্ফুট হয়ে বিভিন্ন নাটক ও কাহিনীতে যে রূপ নিয়েছে তা স্পষ্টত একাধারে মানব ধর্মের কাছে সাম্প্রদায়িক ধর্মের শূন্যত, সাম্য ভাবনা, অন্যায়ের বিরুদ্ধে অহিংস প্রতিবোধ প্রভৃতি ভাবগুলিকে প্রকাশিত করেছে। গীতাঞ্জলীর 'অপমানিত' কবিতাটিও তেমনি একটি উল্লেখযোগ্য কবিতা। গভীর আবেগে স্পন্দিত এই অমোঘ ভাবনা হিন্দুধর্মের একটি মূল আশ্রয় বর্ণাশ্রমের পরিণামের প্রতি ইঙ্গিত করেছে :

যারে তুমি নীচে ফেল সে তোমারে বাঁধিবে যে নীচে
পশ্চাতে রেখেছ যারে সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে

মানুষের প্রাণের ঠাকুরকে ঘৃণা করার অপরাধের প্রতি নির্দেশ করে কবির বাণী যেন অভিশাপের মত উত্থিত—'বিধাতার রুদ্ররোষে দুর্ভিক্ষের দ্বারে ব'সে ভাগ করে খেতে হবে সকলের সাথে অন্নপান।'

এই কবিতা বহু উচ্চারিত হলেও কোনো রাজনৈতিক নেতা, প্রথার বন্দীত্ব মোচনের অভিপ্রায়ে তাঁদের সংগ্রামকে সমাজের গভীরে প্রবেশ করান নি।

পরবর্তী কালে যত স্বাধীনতাকামী মানুষ নানা ভাবে স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন দেশের অগণিত পতিত বঞ্চিত অস্পৃশ্যদের জন্য এমনভাবে কেহ চিন্তা করেছেন তার প্রমাণ দেখি না। সকলেরই উদ্দেশ্য ছিল প্রধানতই ইংরেজ বিতাড়ন কারণ তাঁরা মনে করতেন তারপর সবই অনায়াস ও সহজলভ্য হবে

অর্থাৎ 'স্বাধীনতার' একটি খণ্ডিত অর্থই তারা ভেবেছিলেন। একমাত্র মহাত্মাজীই স্বাধীনতার পূর্ণ ছবিটিতে অগণিত অস্পৃশ্যের অনুপস্থিতির অসামঞ্জস্য অনুভব করেছিলেন। দুর্ভাগা দেশের সবচেয়ে গভীর ক্ষত যেখানে সেখানে তিনিই প্রথম সংগ্রামী যিনি আরোগ্যের প্রলেপ দিতে উদ্যোগী হলেন।

পরবর্তীকালে গান্ধীজীর যে স্বপ্নের ভারত তার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের স্বপ্নের ভারত এক। যখন একদিকে মুসলিম রাষ্ট্র অন্যদিকে হিন্দু রাষ্ট্রের সংকীর্ণ চিন্তা দেশের বহু মানুষকে পেয়ে বসেছে তখন মহাত্মা যে জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ঐক্য বদ্ধ ভারতের জন্য আপ্রাণ সংগ্রাম করে গেলেন সে রবীন্দ্রনাথেরই কল্পনার ভারত যেখানে আর্য অনার্য হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান সকলেরই স্থান আছে। এমন কি ইংরেজও সেখানে অনাদৃত নয়।

এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা যে সব কাব্যগ্রন্থগুলির আলোচনা করলাম এ সমস্তই গান্ধীজীর ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে কর্মযজ্ঞ সুরু হবার পূর্বে। আদর্শ মানুষের যে ভাবরূপটি কবির মনে ক্রমেই স্ফুট হয়ে উঠছিল গান্ধীজী যেন তারই বিগ্রহ হয়ে এলেন।

কর্মী রবীন্দ্রনাথ হলেন গান্ধীপন্থী বা গান্ধী হলেন রবীন্দ্রপন্থী। মহর্ষি তাঁর কবি-পুত্রকে জমিদারীর কার্যোপলক্ষে পাঠিয়েছিলেন বাংলাদেশের গ্রামে—জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের সুসংস্কৃত আবহাওয়া থেকে সেই ম্যালেরিয়া জীর্ণ মূঢ় মূক অর্ধভুক্ত স্বদেশবাসীর বড় কাছাকাছি এলেন কবি। সেখানেই জন্ম নিল তার গ্রামোন্নয়ন পরিকল্পনা, চাষীদের জন্য ব্যাঙ্ক স্থাপন সমবায় শিক্ষা ও বিবিধ কর্মের হল উদ্যোগ। সেখানেই প্রথম অনুভব করলেন যে চাষীদের অর্জিত সম্পদে জমিদারের কোনো অধিকার নেই। শ্রীনিকেতনে এই পরিকল্পনা যে রূপ নিল সে তাঁর গ্রামমুখী অর্থনীতিরই একটি রূপ—সেখানে তাঁত বসল, নানা রকম কুটীরশিল্পের পত্তন হল। গান্ধীজীর গঠনমূলক কর্মের সঙ্গে ব্যাপকতার দিক ছাড়া এর আর কোনো বিভেদ ছিল না। কেবল একটি মাত্র দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য দুইটি কর্মোদ্যোগের মধ্যে বৈপরীত্যের অনুভব ঘটাচ্ছে—সে রুচির প্রশ্নে। গান্ধীজী চান কঠোর বৈরাগ্যের শুভ্রতা, বাহুল্য বর্জিত রূপশ্রী—রবীন্দ্রনাথ বলেন প্রয়োজনকে ছাড়িয়ে উদ্বৃত্তের মধ্যেই ঘটে মানুষের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ, কাপড় তাঁতির হাতে বোনা হোক কিন্তু পাড়ের নক্সাটি একান্ত আবশ্যক। রাজপ্রাসাদ ছেড়ে রবীন্দ্রনাথ মাটির কুটীরে বাস করেছেন সানন্দে কিন্তু সেই কুটিরের গায়ে আলপনার কারুকার্য তাঁর একান্ত প্রয়োজন। দৃষ্টিভঙ্গীর এই পার্থক্য বহুদূর বিস্তৃত।

অবশ্য অন্যদিকে পরিচ্ছন্নতার প্রতি গান্ধীজীর সদাজাগ্রত দৃষ্টিও এক গভীর স্বচ্ছ সৌন্দর্য চেতনারই দ্যোতক।

বহুদিকে এই দুই বিরাট পুরুষের ঐক্য থাকা সত্ত্বে মাঝে মাঝে কর্মক্ষেত্রে যে মতদ্বৈধগুলি ঘটেছে সেগুলিও অসার্থক নয়—ভিন্ন কর্মক্ষেত্রে সমাজের ভিন্ন স্তরে তা কাজ করেছে এবং শেষের দিকে অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরে গান্ধীজীর মধ্যে ক্রমে আমরা উভয়কেই পেয়েছি।

গান্ধীজী একদিকে দেশের অজ্ঞ মূর্খ অগণিত মানুষের মনে স্বাধীনতার স্পৃহা, রাজনৈতিক চেতনা জাগাবার চেষ্টা করছিলেন অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথ চেষ্টা করছিলেন সংস্কার বিমূঢ় অজ্ঞানতা দূর করে বিচারবুদ্ধি জাগ্রত করতে—'যেথা তুচ্ছ আচারের মরু বালু রাশি বিচারের স্রোত পথ ফেলে নাই গ্রাসি'—সেই মুক্ত চিন্তার প্রবাহ বইয়ে দিতে- শিক্ষিতে ও অশিক্ষিতে যে দুই শ্রেণী তৈরী হচ্ছে সেদিকেও তিনি অবহিত ছিলেন।

প্রধান মতদ্বৈধ দেখা গেল অসহযোগ আন্দোলনের সময়। রবীন্দ্রনাথ বললেন, আজ সর্বমানবের সহযোগিতাই আমাদের কাম্য—অসহযোগ নয়। কারণ কবি ভুলতে পারেন না ইংরেজের আগমন ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক বিচিত্র ব্যাপার।

"মানুষ হিসাবে তারা রইল মুসলমানদের চেয়েও আমাদের কাছ থেকে অনেক দূরে—কিন্তু য়ুরোপের চিত্তদূতরূপে ইংরেজ এত ব্যাপক ও গভীরভাবে আমাদের কাছে এসেছে যে আব কোনো বিদেশী জাত এভাবে আসতে পারেনি। য়ুরোপীয় চিত্তের জঙ্গমশক্তি আমাদের স্থাবর মনের উপর আঘাত করল। যেমন দূর আকাশ থেকে আঘাত করে বৃষ্টিধারা মাটির 'পরে ভূমিতলের নিশ্চেষ্ট অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করে প্রাণের চেষ্টা সঞ্চার করে দেয়, সেই চেষ্টা বিচিত্ররূপে অঙ্কুরিত বিকশিত হতে থাকে।"...এইখানে গান্ধীজী ও রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারার কেন্দ্রটি একটু দূর ছিল—রবীন্দ্রনাথ যে পরিবেশে জন্মেছিলেন সেখানে হিন্দুসমাজের সঙ্কীর্ণ গণ্ডী, তার প্রথা সংস্কারের অচলায়তন, চিন্তার ক্ষেত্রে ভাঙ্গতে শুরু হয়েছিলো। এই মনো-বিপ্লবের হোতা ছিলেন রামমোহন—তাই বুদ্ধির মুক্তির জন্য রামমোহনের চিত্ত-মহিমায় রবীন্দ্রনাথ অভিভূত ছিলেন। এই মুক্তির কাজ সবে মাত্র শুরু হয়েছিল এবং এই কাজে সব দিক থেকে অগ্রসর হচ্ছিলেন ঠাকুরবাড়ির প্রতিভাধরেরা, বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথ। অপর দিকে মহাত্মাগান্ধী গোঁড়া রক্ষণশীলতার মধ্যে জন্মেছিলেন—রামমোহনের চিত্তশক্তির অভিঘাত সেখানে পৌছায়নি। অচলায়তনের পাথর একটি একটি করে সমাজের নানা ক্ষেত্র থেকে তাঁকেও সরাতে হয়েছে; সেটা করেছেন ক্রমে ক্রমে নিজ অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে। ১৯১২ সালেও তিনি বলেছেন, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির জন্য একত্রে আহার বা অন্তর্বিবাহের প্রয়োজন নেই। অর্থাৎ তাঁকে সশঙ্ক চিত্তে ধীরে ধীরে এগুতে হচ্ছে! এদিকে ১৯০৫

সালেও রবীন্দ্রনাথের পরিবারে 'ডোম' জাতির পাচক রয়েছে, সে সম্বন্ধে কোনো চিন্তারই অবকাশ নেই। দ্বিজেন্দ্রনাথের বহু পুরাতন বিশ্বস্ত ভৃত্য মুনীশ্বর ছিল জাতিতে ডোম।

গান্ধীজীর জীবনেও ইয়োরোপীয় চিত্তের জঙ্গমশক্তির প্রভাব কম নয়। রাস্কিন থুরো ও টলস্টয়ের প্রভাবের কথা তো তিনি নিজে বারবারে বলেছেনই, রাজনীতির ক্ষেত্রেও অসহযোগ বা 'বয়কট' বয়কটেরই অনুসরণ। উপবাসের প্রয়োগ রাজনীতির ক্ষেত্রে পশ্চিমেই প্রথম হয়েছে যদিও আত্মশুদ্ধির কারণে প্রায়োপবেশন ভারতেরই রীতি। গান্ধীজী নিজের অভিজ্ঞতার আলোকে ধীরে ধীরে পথ করে নিয়েছেন। অস্থূয়াশূন্য, স্বার্থশূন্য সত্যদৃষ্টির সামনে প্রতিপদে অচলায়তনের ইট একটি একটি করে খসে পড়েছে। প্রথম জীবনে যিনি হিন্দুসমাজের প্রথা-সংস্কারের একটিও বন্ধনগ্রন্থি খুলতে ইতস্তত করেছেন, তিনিই পরে শেষজীবনে অসবর্ণ বিবাহ, বিশেষত উচ্চবর্ণের সঙ্গে হরিজনের বিবাহ, একান্ত কাম্য বলেছেন। এমন কি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাহও তাঁর অভিপ্রেত মনে হয়েছে। কিন্তু সামাজিক ক্ষেত্রে এই যুক্তিবাদের প্রসার সুরু হবার আগেই রাজনৈতিক কারণে গান্ধীজীর কিছু কিছু পরিকল্পনা রবীন্দ্রনাথের পক্ষে গ্রহণযোগ্য হয়নি।

যে রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় চিত্তের অনড়ত্ব, প্রথাবদ্ধতা ও সংস্কার মূঢ়তাকে আঘাত হানতে সচেষ্ট ও সদা জাগ্রত, তিনি চরকাকে একটি নূতন প্রতীক হয়ে উঠতে দেখে শঙ্কিত হয়েছিলেন। শঙ্কার কারণও যে ছিল না তা বলি না। আজও দেখছি নানাবিধ দুষ্কর্ম করে ঠুঁটো খদ্দর পরে সাধুত্বের ভান কিংবা সর্বরকমের গান্ধী-অর্থনীতির বিরোধিতা করে সভাস্থলে চরকা কেটে রীতি রক্ষা চলছে। চিন্তা দিয়ে, যুক্তি দিয়ে যা করণীয় তা না করে প্রথার অনুসরণ মানুষের মুক্তির অন্তরায়, চরকার দ্বারা যতটুকু উপকার তার চেয়ে তাকে বড়ো করে তুললে সেই বিপদ ঘটবে এই ছিল রবীন্দ্রনাথের আশঙ্কা; অপরদিকে সমগ্র দেশকে অর্থনৈতিক সূত্র ধরে একটি তাৎপর্যপূর্ণ প্রতীক দিয়ে সংঘবদ্ধ করা রাজনৈতিক কারণে অপরিহার্য মনে হয়েছিল গান্ধীজীর। দৈনন্দিন জীবনে দরিদ্রতম মানুষের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট চরকা একটি সর্ব-ভারতীয় যোগসূত্র হিসাবে জাতীয় সঙ্গীতের মতই ঐক্যবোধ জাগাবে, একত্র কর্ম করবার শক্তি দেবে—"সংগচ্ছধ্বম্" এর ভাবটি বেগ পাবে। হয়েও ছিল তাই। অগণিত মূঢ় মূর্খ দরিদ্র মানুষ স্বাধীনতা-সংগ্রামে সহযোগী হবার একটি হাতিয়ার পেল যা একদিকে তাদের নিজ জীবনসমস্যার সঙ্গে অন্যদিকে একটি বৃহৎ দেশব্যাপী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করেছে। ব্যক্তিমানুষ তার ব্যক্তিগত লাভ-লোকসানকে যুক্ত করতে পারছে—দেশব্যাপী একটি মহৎ প্রচেষ্টার সঙ্গে এই শিক্ষা এক কার্যকরী

তালিম। স্বাধীনতা শব্দটা যা সহস্র সহস্র নর-নারীর কাছে একটা শব্দ মাত্র ছিল তা অর্থবহ ও সত্য হল—সে অর্থ যতই সঙ্কীর্ণ হোক। অন্যপক্ষে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গী যুক্তিনির্ভর। মহাত্মাজী যেখানে বারবার যুক্তির স্থলে 'সহজাত বিশ্বাসে' বেশী আস্থাশীল সেখানেই তাঁর সঙ্গে ঘটেছে রবীন্দ্রনাথের পার্থক্য। মহাত্মাজী তাঁর সহজাত বুদ্ধি দিয়ে চরকা-আন্দোলনের সংগ্রাম শক্তিকে বুঝেছিলেন, তাঁর প্রধান লক্ষ্য ছিল তখনও রাষ্ট্রীয় মুক্তি—দেশের স্বাধীনতা—অন্যপক্ষে রবীন্দ্রনাথ মানুষের সর্বাঙ্গীণ মুক্তির কথা ভাবেন। ভারতবর্ষের সম্পর্কে কুসংস্কার যুক্তিহীন প্রথা অন্ধভাবে শাস্ত্রবচনের অনুসরণ এগুলিই তাঁর কাছে মুক্তিপথের এক প্রধান অন্তরায়—তাই যখন গান্ধীজী বলেন যে, সকলে যদি এক বৎসর তাঁর উপদেশ পালন ক'রে সুতা কাটে তবে ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে স্বাধীনতা আসবে এবং দেশের লোক যখন সে কথা আক্ষরিক অর্থে বিশ্বাস করে তখন তিনি উদ্বিগ্ন হন। 'সত্যের আহ্বান' প্রবন্ধে তিনি তাঁর প্রতিবাদ স্পষ্টভাবে বল্লেও এই রচনার প্রতি ছত্রে গান্ধিজীর প্রতি তাঁর অনুরাগ ও বিশ্বাস প্রকাশ পেয়েছে। তিনি বলছেন, "স্বরাজ গড়ে তোলবার তত্ত্ব বহু বিস্তৃত। তার প্রণালী দুঃসাধ্য এবং কালসাধ্য; তাতে যেমন আশঙ্কা এবং হৃদয়াবেগ তেমনি তথ্যানুসন্ধান এবং বিচার-বুদ্ধি চাই। তাতে যারা অর্থশাস্ত্রবিদ্ তাঁদের ভাবতে হবে। যন্ত্রতত্ত্ববিদ্ যাঁরা তাদের খাটতে হবে। শিক্ষাতত্ত্ববিদ্ রাষ্ট্রতত্ত্ববিদ্দের কর্মে লাগতে হবে।......"

অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের মধ্যে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ও তথ্যানুসন্ধানপূর্বক পরিকল্পনা করা প্রয়োজন, তিনি বলছেন, "মহাত্মাজীর কণ্ঠে বিধাতা ডাকবার শক্তি দিয়েছেন কেননা তাঁর মধ্যে সত্য আছে, অতএব এইতো ছিল আমাদের শুভ অবসর। কিন্তু তিনি ডাক দিলেন একটি মাত্র সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রে। তিনি বললেন সকলে মিলে সুতো কাটো, কাপড় বোনো—এই ডাক কি নবযুগের মহাসৃষ্টির ডাক?"

রবীন্দ্রনাথের কাছে যুগবাণী—যুক্তি বিচারের পথে সত্যকে প্রকাশ করছে, অপ্রামাণ্য instinct-এর প্রতি তাঁর আস্থা নেই। অপরপক্ষে গান্ধীজী বার বার বলেছেন তিনি instinct-এ নির্ভর করেন। এই প্রসঙ্গে বলি instinct কথাটিকে কেউ কেউ অনুবাদ করেছেন 'দৈববাণী'—ও গান্ধীজী 'দৈববাণী'তে বিশ্বাসী ছিলেন এমন একটা কথা আলোচনা অনেকে করেছেন, গান্ধীজী যদি instinct শব্দটাই ব্যবহার করে থাকন তবে ওটি একটি বৈজ্ঞানিক শব্দ, ওর মধ্যে দেবতা কোথায়? 'সহজাত বুদ্ধি বা প্রবৃত্তি' যুক্তি দিয়ে বিচার্য না হলেও তার মধ্যে যুক্তি বা বিচার থাকে—মানুষের ক্ষেত্রে এই শক্তিই তার ক্রান্তদর্শনের ক্ষমতার উৎস। এটা কোনো অমানবিক অলৌকিক কাণ্ড নয়।

রবীন্দ্রনাথেরও যে কখনো কখনো এরকম 'ইনষ্টিংক্টের' অভিজ্ঞতা ঘটেনি তা বলব না। প্রথম মহাযুদ্ধের আসন্ন উপলব্ধি বলাকার কবিতায় কিভাবে প্রকাশ পেয়েছিল এন্‌ড্রুজের রচনায় তা উল্লেখিত হয়েছে।* সে অন্য প্রসঙ্গ।

রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, "বহুদিন ধরে আমাদের পোলেটিক্যাল নেতারা ইংরেজী পড়া দলের বাইরে তাকাননি......(এখানে উল্লেখযোগ্য রবীন্দ্রনাথই প্রথম এই ধরনের স্বদেশী চর্চার অসারত্বর দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। তিনিই প্রথম প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভায় বাংলায় ভাষণ দেন।) মহাত্মা গান্ধী এসে দাঁড়ালেন ভারতের বহুকোটি গরীবের দ্বারে—তাঁদের সঙ্গে কথা কইলেন তাদেরি ভাষায়।"

এই ভাষা সব সময় নিখাদ যুক্তির ভাষা হওয়া সম্ভব ছিল না। আসমুদ্রহিমাচল বিপুল জনসঙ্ঘকে উদ্বেলিত করে তুলতে গান্ধীজী আপন সহজাত-বুদ্ধির নির্দেশে বহু স্থানে চালিত হয়েছেন। তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য জীবনের শেষ প্রান্তে এসে দেশভাগের প্রারম্ভে ইংরেজের চাতুরীর সঙ্গে মোকাবিলা করার সময় দেখা গেছে। এই সহজাত-বুদ্ধিই তাঁকে সাবধান করেছিল আসন্ন চক্রান্ত সম্বন্ধে। কিন্তু তখন তিনি তাঁর সহকর্মীদের সে বিষয়ে বিশ্বাস উৎপন্ন করতে পারেন নি।

মহাত্মাজীর দু'টি কথায় রবীন্দ্রনাথের আপত্তি প্রবল হয়েছিল—বিদেশী কাপড় 'অপবিত্র' বা বিহারে অস্পৃশ্যতার পাপের শাস্তিরূপে ভূমিকম্প হয়েছে।

গান্ধী এখানে যে ভাষায় কথা বলছেন রবীন্দ্রনাথের কাছে এটা অর্থশাস্ত্রের ক্ষেত্রে ধর্মশাস্ত্রকে টেনে আনা।......

একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, এ-সব ক্ষেত্রে আধুনিক মানুষের মন রবীন্দ্রনাথের মতেই সায় দেবে। জওহরলালেরও সায় ছিল সেই দিকে—কিন্তু গান্ধীজী এমন অনেক কাজ করেছেন যেখানে যুক্তি পরাজিত হয়েছে কিন্তু তাঁর কর্মোদ্যোগ মোটামুটি সফল হয়েছে। ইংরেজের মত প্রচণ্ড শক্তির বিরুদ্ধে প্রায়োপোবেশন তেমনি একটি সার্থক অযৌক্তিক প্রয়োগ। এর বিপদ সম্বন্ধেও তিনি অজ্ঞ ছিলেন না যে-জন্য বারংবার যে-কোনো অজুহাতে অনুকরণস্পৃহায় উপবাসের অস্ত্র ব্যবহার করতে তিনি অন্যদের নিষেধ করেছেন।

বস্তুতঃ গান্ধীজীকে যে এ যুগের মানুষ তেমনভাবে গ্রহণ করতে পারেনি তার একটি কারণ এই ভাষার দূরত্ব। তাঁর ভাষা আবেগেরও নয় বিশ্লেষণেরও নয় সে তাঁর নিজস্ব চিন্তাধারার বাহক মাত্র—যে পরিবেষ্টনে যে ভাষায় তাঁর চিন্তা লালিত তারই আশ্রয়ে তাঁর বাক্য রূপ নিয়েছে—তিনি বার বার ঈশ্বরে বিশ্বাস স্থির রাখতে বলেছেন—আধুনিক যুক্তিবাদী মানুষ একজন সর্বময় সৃষ্টিকর্তার ব্যক্তিস্বরূপে

* এনড্রুজের রচনা দ্রষ্টব্য।

তাঁর মঙ্গলময়ত্বে আস্থা রাখতে পারে না—কিন্তু কার্যকালে তিনি যখন বলেন 'সত্যই আমার ঈশ্বর' এবং জীবনে সর্বক্ষেত্রে সেই সত্যে অটল থেকে তাঁর ঈশ্বর-বিশ্বাসের প্রমাণ দেন তখন তাঁর ভাষা যাই হোক, নাস্তিকও তাঁর কথার সত্যতা অস্বীকার করে না।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে গান্ধীজীর মতভেদের প্রসঙ্গ বহু আলোচিত, কিন্তু এই প্রসঙ্গ বেশী গুরুত্ব পেয়েছে তাঁদের বাহ্যিক পার্থক্যের কারণে, অন্তরের দিকে, অনুভবের দিকে, সাংগঠনিক কর্মের দিকে তাঁদের ঐক্যই গভীর, পার্থক্য শুধু প্রকাশভঙ্গীর—এ বিষয়ে সমগ্রভাবে বিশেষভাবে আলোচনার জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ বই লেখা যেতে পারে। কিন্তু বর্তমান রাজনীতির ক্ষেত্রে হিংসার প্রয়োগের পরিণাম সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের চিন্তা গান্ধীজীর সঙ্গে এক। উদ্দেশ্য ও উপায়, আদর্শ ও পথ উভয়ের সাম্য বিধান সম্বন্ধে উভয়েই নিঃসন্দেহ। বাংলাদেশের জনমত কোনো দিনই এমতের পোষক নয়। আজও নয়,—বিদেশী শাসকরা অন্তর্হিত, তবু সামান্য সামান্য দলগত স্বার্থে দেশ রক্তাক্ত ছিন্নভিন্ন, শুভবুদ্ধিবর্জিত গণশক্তির উদ্‌ভ্রান্ত তাণ্ডবের সামনে দাঁড়িয়ে আজও বাংলাদেশের রাজনীতিক্ষেত্রে অহিংসার সত্য অস্বীকৃত।

কিন্তু এ সম্বন্ধে গান্ধীজী ও রবীন্দ্রনাথের মত ছিল অভিন্ন। এবং গান্ধীজী রাজনীতিক্ষেত্রে অহিংসার প্রয়োগের বহু পূর্বেই (১৯০৮ সালে) রবীন্দ্রনাথ লিখছেন:

"একটি কথা আমরা কখনো ভুলিলে চলিবে না যে, অন্যায়ের দ্বারা অবৈধ উপায়ের দ্বারা কার্যোদ্ধারের নীতি অবলম্বন করিলে কাজ আমরা অল্পই পাই অথচ তাহাতে করিয়া দেশের সমস্ত বিচার-বুদ্ধি বিকৃত হইয়া যায়। তখন কে কাহাকে কিসের দোহাই দিয়া কোন্ সীমার মধ্যে সংযত করিবে? দেশহিতের নাম করিয়া যদি মিথ্যাকেও পবিত্র করিয়া লই এবং অন্যায়কেও ন্যায়ের আসনে বসাই তবে কাহাকে কোন্‌খানে ঠেকাইবে? দুঃস্বপ্ন যেমন দেখিতে দেখিতে অসংগত অসংলগ্ন ভাবে এক বিভীষিকা হইতে আর এক বিভীষিকায় লাফ দিয়া চলতে থাকে তেমনি মঙ্গলবুদ্ধির অরাজকতার দিনে নিতান্তই সামান্য কারণে চন্দননগরের মেয়রকে হত্যা করিবার আয়োজন হয়। কোথাও কিছু নাই, হঠাৎ কুষ্টিয়ার নিতান্ত নিরপরাধ পাদ্রীর পৃষ্ঠে গুলী বর্ষিত হয়···বিভীষিকা অত্যন্ত তুচ্ছ উপলক্ষ্য অবলম্বন করিয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতে থাকে এবং কাণ্ডজ্ঞানহীন মত্ততা মাতৃভূমির হৃদ্‌পিণ্ডকেই বিদীর্ণ করিয়া দেয়। এইরূপ ধর্মহীন ব্যাপারে প্রণালীর ঐক্য থাকে না, প্রয়োজনের গুরু-লঘুতা বিচার চলিয়া যায়। উদ্দেশ্য ও উপায়ের মধ্যে সুসংগতি স্থান পায়

না—একটা উদ্‌ভ্রান্ত দুঃসাহসিকতাই লোকের কল্পনাকে উত্তেজিত করিয়া তুলে। অতএব বার বার দেশকে স্মরণ করাইয়া দিতে হইবে······প্রশান্ত ধর্মের পথে চলাই নিজের শক্তির প্রতি সম্মান এবং উৎপাতের সঙ্কীর্ণ পথ সন্ধান করাই কাপুরুষতা ······এই বিকৃতিকে যে-কোনো উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই একবার আশ্রয় দিলে শয়তানের কাছে মাথা বিকাইয়া রাখা হয়······”

ক্ষুদিরাম প্রভৃতি তরুণের দল যখন প্রাণহরণ ও প্রাণত্যাগের দ্বারা সমস্ত দেশের চিত্ত আবেগে মথিত করে তুলেছিল তখনও রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই মত দ্বিধাহীনভাবে বলেছেন, “ফললাভ চরম লাভ নহে, ধর্মলাভই লাভ। একথা যদি কোন দেশহিতের বেলাতেই না খাটে তবে দেশহিত মানুষের যথার্থ হিত নহে।”······

অহিংসার পথ ও ধর্মের পথ পরিত্যাগ করে যে-কোনো প্রকারে স্বাধীনতার জন্য যে-সব স্বার্থত্যাগী বীর যুবক বালক অকৃতার্থ বাসনায় মৃত্যুর মুখে শেষ হয়ে গেল তাদের জীবনসত্যের প্রতি গভীর মমত্ব ও বেদনাবোধ ‘প্রশ্ন’ কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে, তা সত্ত্বেও কোনো দিনই এ পথের প্রতি তার সমর্থন বা আস্থা ছিল না। সমস্ত দেশ জুড়ে যখন “অগ্নিযুগের” অগ্নিদাহ জনমনকে উৎসাহিত উদ্দীপ্ত করেছে তখন তিনি লিখলেন উপন্যাস ‘চার অধ্যায়’। ঐ বইয়ের প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় তিনি যা লিখেছিলেন “জনমতের” উৎপাতে পড়ে তাঁকে পরের সংস্করণে তা বাদ দিতে হয়েছিল। চার অধ্যায় সাহিত্য হলেও তার অন্তর্নিবিষ্ট কাহিনীটি উল্লেখ-যোগ্য এ কারণে যে, একপক্ষে অনন্যসাধারণ সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের প্রতি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা রেখেও রবীন্দ্রনাথ মতপার্থক্যে অট ছিলেন—সুভাষচন্দ্র সম্বন্ধে গান্ধীজীরও তেমনি মনোভাব বাংলাদেশে তাঁকে অপ্রিয় করেছে।

চার অধ্যায়ের ভূমিকায় আছে—

তিনি (ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়) ছিলেন রোমান ক্যাথলিক সন্ন্যাসী। অপরপক্ষে বৈদান্তিক তেজস্বী নির্ভীক, ত্যাগী, বহুশ্রুত ও অসামান্য প্রভাবশালী।···তিনি আমার সঙ্গে আলোচনাকালে যে-সকল দুরূহ তত্ত্বের গ্রন্থিমোচন করতেন আজও তা মনে করে বিস্মিত হই।···এমন সময় লর্ড কর্জন বঙ্গব্যবচ্ছেদ ব্যাপারে দৃঢ়সংকল্প হলেন···সেই সময়ে দেশব্যাপী চিত্তমন্থনে যে আবর্ত আলোড়িত হয়ে উঠল তারই মধ্যে একদিন দেখলুম এই সন্ন্যাসী ঝাঁপ দিয়ে পড়লেন; স্বয়ং বের করলেন ‘সন্ধ্যা’ কাগজ। তীব্র ভাষায় যে মদির রস ঢালতে লাগলেন তাতে সমস্ত দেশের রক্তে অগ্নিজ্বালা বইলে দিল। এই কাগজেই প্রথমে দেখা গেল বাংলাদেশে আভাসে ইঙ্গিতে বিভীষিকা পন্থার সূচনা। বৈদান্তিক সন্ন্যাসীর এতবড়ো প্রচণ্ড পরিবর্তন আমার কল্পনার অতীত ছিল। এই সময়ে দীর্ঘকাল তাঁর সঙ্গে আমার দেখা সাক্ষাৎ

হয় নি। মনে করেছিলুম হয়তো আমার সঙ্গে তাঁর রাষ্ট্রআন্দোলন প্রণালীর প্রভেদ অনুভব করে আমার প্রতি তিনি বিমুখ হয়েছিলেন অবজ্ঞাবশতই। ……নানাদিকে নানা উৎপাতের উপসর্গ দেখা দিতে লাগল। সেই অন্ধ উন্মত্ততার দিনে একদিন যখন জোড়াসাঁকোর তেতালার ঘরে একলা বসেছিলাম, হঠাৎ এলেন উপাধ্যায়।

কথাবার্তার মধ্যে আমাদের সেই পূর্বকালের আলোচনার প্রসঙ্গও কিছু উঠেছিল। আলোচনার শেষে তিনি বিদায় নিয়ে উঠলেন, চৌকাঠ পর্যন্ত গিয়ে একবার মুখ ফিরিয়ে দাঁড়ালেন—বললেন, "রবিবাবু, আমার খুব পতন হয়েছে"—স্পষ্ট বুঝতে পারলুম্ এই মর্মান্তিক কথাটি বলবার জন্যই তাঁর আসা।"

বলাবাহুল্য ব্যক্তিমানুষের প্রতি সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ এ 'বিভীষিকা পন্থা' বা 'সন্ত্রাসবাদের' আশ্রয়গ্রহণকে 'পতন' বলেই মনে করতেন। 'চার অধ্যায়' গল্পটি এই ঘটনার সূত্র ধরেই লেখা।

হিংসা ও অহিংসার প্রশ্নে উদ্দেশ্য ও উপায়ের সামঞ্জস্যবিধানে রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজীর মতে ছিল সম্পূর্ণ সঙ্গতি। তাঁদের মত-পার্থক্যের যে সূক্ষ্ম ভাবরেখা তা রাজনৈতিক ঘটনার মধ্যে অপ্রাসঙ্গিক। বস্তুত রাজনীতির কাজে ধর্ম ও নীতিকে অনাবশ্যক বোধ করার বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের সমস্ত যুক্তিগুলিই গান্ধীজীর গৃহীত পন্থায় প্রযোজ্য। গান্ধীজী যেন তাঁরই মানস-নায়কের প্রতিরূপ, সে কারণে রবীন্দ্রনাথ অনায়াসে ঘোষণা করলেন—"আমরা গান্ধী মহারাজের শিষ্য" আর গান্ধীও বললেন তাঁকে, 'গুরুদেব' যিনি জাগ্রত প্রহরীর মত সদা অনিমেষ দৃষ্টিপাতে রক্ষা করেছেন সত্যকে, ধর্মকে।

জীবনের শেষদিকে এসে দু'জনে হলেন সহকর্মী—গান্ধীজী যখন হরিজন আন্দোলন করছেন রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, চণ্ডালিকা, শুচি, প্রথম পূজা।

এই দুই পুরুষশ্রেষ্ঠের চিন্তার সাজুয্য আরও বহুতর ক্ষেত্রে আলোচনা করা যেতে পাবে। এখানে সংক্ষেপে যা বলা গেল তার শেষ কথাটি প্রথমে যা বলেছি তারই অনুরূপ। গান্ধীজীবনের মহত্তম অধ্যায় শেষ কয়েকবৎসর—রবীন্দ্রনাথ তা দেখেন নি—কিন্তু এবারও ভবিষ্যতের পদধ্বনি বেজেছে তাঁর মধ্যে—খৃষ্টের উদ্দেশ্যে লেখা 'শিশুতীর্থে' সেই বাণী রেখে গেছেন—'সংশয়ে তাকে আমরা অস্বীকার করেছি, ক্রোধে তাকে আমরা হনন করেছি, প্রেমে এখন আমরা তাকে গ্রহণ করব।'

কালজ্ঞ ক্রান্তদর্শী কবির আশায় আলোকিত এই বাণী একাধারে অতীত ও ভবিষ্যতের কথা বলেছে।

কবির ধর্ম

ব্রাহ্ম সম্মিলন সমাজের সম্পাদিত রবীন্দ্রশতাব্দী-উৎসব উপলক্ষ্যে প্রকাশিতব্য সঙ্কলনগ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের ধর্ম সম্বন্ধে কিছু লিখতে অনুরুদ্ধ হয়েছি শুনে ঐ সম্প্রদায়ভুক্ত আমাদের এক প্রাজ্ঞ বন্ধু ঈষৎ হাস্য করে বলেছিলেন 'ঠিক ধার্মিক লোক জোগাড় করেছে বটে!' কথাটি কিঞ্চিৎ নিষ্করুণ হলেও এর ব্যঞ্জনা এত সত্য যে, এর পরে কলম ধরতেই হৃদ্‌কম্প হত যদি না সেই সঙ্গে সঙ্গেই আরো দু'একটি কথা মনে পড়ে যেত। প্রায় পঁচিশ ছাব্বিশ বছর আগে উত্তর-প্রদেশবাসী একজন ব্রাহ্মণ কলকাতায় এসে পূজায় পশুবলি বন্ধ করবার জন্য উপবাসে সত্যাগ্রহ সুরু করেন। তা নিয়ে বাদ-প্রতিবাদ হওয়ায় বোঝা গিয়েছিল পশুবলি সমর্থক শিক্ষিত হিন্দুর সংখ্যা তখনও কম নয়। এই ঘটনা কবিকে বিশেষভাবে বিচলিত করেছিল ও সেই প্রসঙ্গে 'ধর্মমোহ' নামে একটি আশ্চর্য কবিতা লিখেছিলেন। ঐ কবিতায় শুধু পশুবলি নয়, ধর্মের নামে জগতে যত নরবলি, যত রক্তস্রোত প্রবাহিত হয়েছে তারই প্রতি সঙ্কেতে ইঙ্গিত রয়েছে। ধর্মের নামে, সম্প্রদায়ের স্বার্থে চিরকাল ধবেই বারেবারে মনুষ্যত্ব লাঞ্ছিত, পরাজিত ও পশুত্ব উদ্যত হয়েছে, যজ্ঞে বলি তার সামান্যই একটু অংশ মাত্র।

যদিও তখন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার চূড়ান্ত বিভীষিকা ঘটেনি, তবু মানুষের ইতিহাস জুড়ে সে দৃষ্টান্তর তো অন্ত নেই। ঐ কবিতার ক'টি লাইনে তাই ছিল—

"ধর্মের বেশে মোহ যারে এসে ধরে
অন্ধ সে জন মারে আর শুধু মরে।
নাস্তিক সেও পায় বিধাতার বর
ধার্মিকতার করে না আড়ম্বর!...

"...যে দেবে মুক্তি তারে খুঁটিরূপে গাড়া
যে মিলাবে তারে করিল ভেদের খাঁড়া
যে আনিবে প্রেম অমৃত উৎস হতে
তারি নামে ধরা ভাসায় বিষের স্রোতে ..
...হে ধর্মরাজ ধর্মবিকার নাশি
ধর্মমূঢ় জনেরে বাঁচাও আসি
যে পূজার বেদী রক্তে গিয়েছে ভেসে

ভাঙ্গো ভাঙ্গো আজি ভাঙ্গো তারে নিঃশেষে
ধর্মকারার প্রাচীরে বজ্র হানো
এ অভাগা দেশে জ্ঞানের আলোক আনো।”

পশুবলি-সমর্থক ধার্মিক হিন্দুর প্রাণে সে সময়ে এ লাইনগুলি শেলের মত পতিত হয়েছিল। একজন নিষ্ঠাবান হিন্দু বহুপৃষ্ঠাব্যাপী একটি সমালোচনাপ্রবন্ধে পরিশেষে লিখেছিলেন :

“ভাঙ্গো ভাঙ্গো, একি কবির বাণী না মামুদ গাজনীর বাণী ?” বোধহয় তিনি মানসচক্ষে দেখছিলেন সোমনাথ মন্দিরের মত সনাতন ধর্মের চূড়া ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়েছে !

একজন গোঁড়া ব্রাহ্মের সঙ্গেও কবির ধর্মমত সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন, “নাস্তিক সেও পায় বিধাতার বর” এ লাইনটি ঐ কবিতার প্রসঙ্গে ছাড়া সমর্থনযোগ্য নয়। এবং যে-সব দেশে বিদ্যালয়ে ধর্মশিক্ষা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে কবি নানাস্থানে তার অনুমোদন করেছেন। রাশিয়ার ধর্মশূন্যতাও তাঁকে ক্ষুব্ধ করে না, এ কি করে সম্ভব হয় তিনি বুঝতে পারেন না। সমবেত প্রার্থনা ও ঈশ্বরের করুণা সম্বন্ধে বাল্যকাল থেকে অবহিত হওয়া অর্থাৎ ধর্মশিক্ষা আধ্যাত্মিক জীবনকে উদ্বুদ্ধ করবার পক্ষে অত্যাবশ্যক। রবীন্দ্রকাব্যে প্রেয়োবোধের আতিশয্য তাঁর মতে শ্রেয়োবোধকে কিছু খণ্ডিত করেছে। গোরাতে ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে অনেক মতামতও গ্রহণযোগ্য নয়।

অল্পদিন পূর্বেই একজন ক্রিশ্চান পাদরীর সঙ্গেও আমার রবীন্দ্রসঙ্গীতে ধর্মসাধনা সম্বন্ধে আলোচনা করবার সুযোগ হয়েছিল। এই পাদরী বঙ্গসাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত এবং রবীন্দ্রসঙ্গীতের রসে তিনি আনন্দ পান, তথাপি আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি আমাকে বলেছিলেন, রবীন্দ্রনাথের ঔপনিষদিক ধর্মে ধর্ম নাই—ধর্মভাব আছে মাত্র। অর্থাৎ একটা প্রেরণা আছে কিন্তু আসল বস্তু নাই। পাপীর প্রতি কি কি নির্দেশ আছে ঐ ধর্মে ? অনুতপ্ত পাপী যখন ত্রাণ চায় তখন সে কি নির্গুণ ব্রহ্মের কাছে যাবে, না রবীন্দ্রনাথের রসধর্ম তাকে আশ্রয় দেবে ?

তিন সম্প্রদায়ের এই সমালোচনা আজ বিশেষ করে মনে পড়ায় ধার্মিক না হয়েও রবীন্দ্রনাথের ধর্মমত সম্বন্ধে চিন্তা করতে ও কলম ধরতে সাহসী হয়েছি।

আমাদের ভাষায় এবং ভাবে ধর্ম ঠিক religion শব্দের সমার্থক নয়—এর সংজ্ঞা আরো ব্যাপক ও বিস্তৃত, religion তার একটি অংশ মাত্র। ধর্ম আমাদের স্ব-ভাব, ধর্ম সেই অমোঘ নিয়ম যা আমাদের চরিত্রকে নিয়ন্ত্রিত করে। আগুনের ধর্ম যেমন দহন প্রক্রিয়া, প্রাণের প্রক্রিয়া যেমন নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস, আত্মার স্বাভাবিক

প্রক্রিয়া তেমন ধর্ম বা তার মনুষ্যত্ব। সেই মনুষ্যত্বর উদ্বোধন, প্রকাশ ও পূর্ণতাতেই ধর্মের সার্থকতা। সম্প্রদায়ের গণ্ডী থেকে মুক্ত মানুষের সেই শুদ্ধ ধর্মই রবীন্দ্রজীবনে কাব্যে কর্মে এবং ধ্যানে অঙ্গাঙ্গীরূপে প্রকাশিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের ধর্মমতকে তাই তাঁর জীবনদর্শন, এমন কি তাঁর বিপুল কর্মপ্রবাহ থেকে পৃথক করে দেখা যায় না, কারণ তাঁর ধর্ম তাঁর জীবনের প্রতি পদক্ষেপে দিনে দিনে বিকশিত হয়ে উঠেছে।

সাধারণভাবে ধর্মের দু'টি দিক আছে; এক তাঁর বহিরঙ্গ আর এক তার অন্তরবৃত্তি। বহিরঙ্গের আকৃতিতে বলা যায় creed এইখানেই সাম্প্রদায়িকতা চলমান জীবনধর্মকে ও সম্প্রদায়ের ধর্মকে মাঝে মাঝে পৃথক করে ফেলে। Creed-এর আয়তনে ধর্ম অচল হয়ে যায়। তখন যুগে যুগে নূতন নূতন মানুষ প্রাণের মহাশক্তির আবেগ নিয়ে আসেন, ভাবের রসসমুদ্রের তরঙ্গে ভেঙ্গে ফেলেন অচলায়তনের প্রাচীর।

যুক্তিতর্ক বাক্‌বিতণ্ডার প্রতিরোধ অতিক্রম করে মহামানবের বোধে আনন্দরসে দীপ্যমান হয়ে চিরপুরাতন সত্যগুলি বারবার নূতন হয়ে আসে। ভারতবর্ষে এ দৃষ্টান্ত অনেক আছে— যজ্ঞপ্রথাবদ্ধ আনুষ্ঠানিক ধর্মকর্মের বিপুল জটিলতার মধ্যে অচলায়তনের দরজা খুলে এসেছিলেন বুদ্ধদেব। তাঁর অষ্টমার্গ আজও মনুষ্যত্বের মানদণ্ড। জাতিভেদের কণ্টকাকীর্ণ আচারপরায়ণ ব্রহ্মণ্যসমাজ যখন ভেদকেই ধর্মের অঙ্গরূপে ধরে মানুষে মানুষে বিরোধ ঘনিয়ে তুলেছে, দেশকে করেছে পঙ্গু, মানুষের ঘটিয়েছে অপমান তখন এসেছেন চৈতন্যদেব জাতিধর্মনির্বিশেষে প্রাণের মিলনবাণী নিয়ে। তাঁর কৃষ্ণপ্রেমের মধ্যে বিশ্বমানব এসে মিশেছে। ক্রীড্‌এর চেয়ে বোধ হয়েছে সত্যতর, ভক্তির আনন্দরসের স্রোতে ভেঙ্গে পড়েছে অচলায়তনের দেয়াল। দাদু, নানক, কবীর সকলের মধ্যেই আমরা ধর্মের সঙ্কীর্ণতা বা 'ধর্মকারার প্রাচীর" ভেঙ্গে ফেলবার প্রয়াস দেখতে পাই। সে প্রসাস মামুদ গাজনীর বিকল্প নয়, সেখানে জবরদস্তি নেই। গভীর অনুভূতিসঞ্জাত সে আনন্দ-সমুদ্রের কুলপ্লাবনী ধারার প্রবাহে অর্থহীন অনুষ্ঠানের, মতবিরোধের সঞ্চিত জঞ্জাল ধৌত করে দেয়। তা সত্ত্বেও সাধারণ হিন্দুসমাজ রবীন্দ্রনাথের জন্মকালে যে নিরর্থক যুক্তিহীন আচার-অনুষ্ঠানে লিপ্ত, জাতিতে বর্ণে খণ্ডিত, পদে পদে বাধাগ্রস্ত হয়ে যুক্তিবাদের মুক্ত ভূমিতে প্রবেশ করতে পারছিল না, ভাবের রসধারা শীর্ণ হয়ে প্রথার মরুভূমিতে ছিল দিশাহারা, ভাগ্যক্রমে রবীন্দ্রনাথকে তার দুর্ভোগ ভোগ করতে হয়নি। রামমোহন রায় মুক্ত মন নিয়ে যুক্তিবাদের প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং তাঁর পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ উপনিষদের ঋষির উচ্চারিত চিরসত্যগুলি ধ্যানে ও অনুভবে প্রাণবন্ত করে ক্রিয়াকর্মের বাধা কতকপরিমাণে শিথিল করে আত্মিক সাধনার পথ মুক্ত

করেছেন। বলা বাহুল্য, হিন্দুসমাজের চূড়ান্ত পরিণতি অধ্যাত্ম বোধের গভীরতম বাণী বহন করে এই উপনিষদ বা বেদান্ত যুগে যুগে ভারতবর্ষের মানুষের কাছে নূতন নূতন সত্য উদ্‌ঘাটিত করেছে। আধ্যাত্মিক সত্য আকাশের মত, অতল এবং অপার, সূর্যালোকের মত চিরনবীন, তা কখনো ফুরিয়ে যায় না, ক্ষয়িত হয় না। যুগে যুগে নূতন নূতন মানুষের চেতনায় সংযুক্ত হয়ে তা নূতন রূপে অভিব্যক্ত ও সত্যতর হয়ে ওঠে। তাই এই বেদান্ত থেকেই শঙ্করাচার্য পেয়েছিলেন এক পথ, আর রবীন্দ্রনাথ পেয়েছেন তার বিপরীত নির্দেশ। কারণ অধ্যাত্মিক সতাই সেই চতুর্মুখ ব্রহ্মা যিনি চতুর্দিক থেকে আলোক আহরণ করেন অর্থাৎ তা দিকশূন্য, কালশূন্য, অনন্ত।

পিতার প্রতি গভীর শ্রদ্ধাবশতঃ প্রথম জীবনে ব্রাহ্মসমাজের সমাজনির্দিষ্ট ধর্মসাধন-পদ্ধতি, উপাসনা ইত্যাদির সঙ্গে যুক্ত থাকলেও কবির অন্তরাত্মা ধীরে ধীরে নিজেকে মুক্ত করে নিচ্ছিল। ব্রাহ্মধর্মের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই হিন্দুধর্মের অনুষ্ঠান ও ক্রিয়াকর্মগুলির নূতন নূতন ব্যাখ্যা দেশাত্মবোধী জাতীয়তাবাদী মানুষের মনকে পুরাতন বিশ্বাস ও সংস্কারের প্রতি প্রত্যাবর্তিত করছিল। সমসাময়িক চিন্তার দাবি আধ্যাত্মিক চেতনাকে বারেবারেই আচ্ছন্ন করে মূর্তিপূজার যুক্তিসঙ্গত কারণ নানা মূর্তি কল্পনার আধ্যাত্মিক অর্থ খুঁজে স্বদেশপ্রেমিকের ধর্ম-গর্ব পুষ্ট ও স্ফীত করতে পেরেছিল। দেশের জনমতের সঙ্গে সংযুক্ত ও স্বাদেশিকতায় উদ্বুদ্ধ হলেও কিন্তু ধর্ম সম্বন্ধে কোনো দুর্বলতা রবীন্দ্রনাথের লেখনী ও চিন্তাকে আচ্ছন্ন করতে দেখা যায় না। শাস্ত্রমতকে শাস্ত্র বলেই তিনি গ্রহণযোগ্য মনে করেন না বা আচার-অনুষ্ঠানের যুক্তিহীন প্রথাগুলি কোনো তত্ত্বব্যাখ্যার সঙ্গে যুক্ত করে দিয়ে শোধন করে নেয়া যায় এও তাঁর বিশ্বাস নয়। জনসাধারণের জন্য, স্বল্পশক্তির জন্য ধর্মাচরণের বা পূজার কোনো সুলভ সংস্করণেও তাঁর আশ্বাস নেই। তিনি জানেন মানুষের অন্তরের মধ্যে অদেখা-অজানা কোন বিরাটের জন্য আকাঙ্ক্ষা আছে—সেই ভূমার লিপ্সা পশুর নেই, অন্য কোনো জীবের নেই, সেই আকাঙ্ক্ষাই পশুর জগতে মানুষের বিশেষ স্থান নির্দেশ করেছে। ভূমার প্রতি সেই আকাঙ্ক্ষা তাকে ঊর্ধ্বমুখী করেছে, তার দৃষ্টিকে ব্যাকুল করে তার অন্তরাত্মাকে জ্যোতির্ময় অনন্তলোকে আহ্বান করছে। যে গভীরকে সে জানতে চায় গভীর বলেই, তার প্রতি তার আকর্ষণ সহজ বলে নয়। ধর্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াম্—তাকে সুলভ করে দিলে তার মূল্য নষ্ট হয়। বস্তুত তার অর্থই ভ্রষ্ট হয়।

"মানুষের মধ্যেও একটি সত্তা আছে যেটি গুহাহিত, সেই গভীর সত্তাটিই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যিনি গুহাহিত তার সঙ্গেই কারবার করে।...

মূঢ় যদি বলে 'না, আমি সাধনা করতে রাজি নই, আমাকে তুমি এ সমস্তই চোখে দেখা কানে শোনার মত সহজ করে দাও'…এই আব্দার মিটিয়ে দিতে পারেন এমন গুরুকে আমরা অনেক সময় খুঁজে থাকি, কিন্তু যদি কোনো গুরু বলেন, আচ্ছা বেশ, তাকে সহজ করে দিচ্ছি, এই বলে সেই যিনি নিহিতং গুহায়াং তাঁকে আমাদের চোখের সমুখে যেমন খুশি একরকম করে দাঁড় করিয়ে দেন তাহলে বলতেই হবে তিনি অসত্যর দ্বারা গোপনকে আরো গোপন করে দিলেন।"

এই তো গেল ভাবের দিকের কথা। আবার তার ব্যবহারিক দিকও আছে। শুধু আন্তরিক নয়, জীবনের প্রয়োগক্ষেত্রে হিন্দুধর্মে নির্দেশ ও অনুশাসন কি ফল দিচ্ছে তা দিয়েও তার মূল্য বিচার্য। তাই ক্ষুব্ধচিত্তে প্রচলিত হিন্দুধর্মের গুণগ্রাহী কাউকে তিনি লিখছেন : "আমরাই ভগবানের নাম করে পরস্পরকে ঘৃণা করেছি, স্ত্রীলোককে হত্যা করেছি, শিশুকে জলে ফেলেছি, বিধবাকে নিতান্তই অকারণে তৃষ্ণায় দগ্ধ করেছি, নিরীহ পশুদের বলিদান করেছি এবং সকলপ্রকার বুদ্ধি-যুক্তিকে একেবারে লঙ্ঘন করে এমন সকল নিরর্থকতার সৃষ্টি করেছি যাতে মানুষকে মূঢ় করে ফেলে।……আমরা ধর্মকে আমাদের চেয়ে নেবে যেতে দিয়েছি ; আমরা কেবলি বলেছি আমরা নিকৃষ্ট অধিকারী, আমরা পারিনে। বিশুদ্ধ সত্য, বিশুদ্ধ মঙ্গল আমাদের জন্য নয়, অতএব আমাদের পক্ষে এই সব মুগ্ধ কল্পনাই ভালো……। ধর্মকে যে উপরে রেখেছে, ধর্ম তাকে উপরে টেনেছে, কিন্তু হিন্দু কেবল বলেছে মেয়েদের জন্য, সর্বসাধারণের জন্য এইরকম মোটা ধর্মই দরকার।……আর যাই হোক, সাধনাকে নীচের দিকে নামতে দিলে কোনো মতেই চলবে না। কল্পনাকে, হৃদয়কে, বুদ্ধিকে, ধর্মকে কেবলি মুক্তির অভিমুখে আকর্ষণ করতে হবে……আমি নিজের জন্য এবং দেশের জন্য সেই মুক্তিই চাই।……

আমাদের দেশে যাঁরা মহাপুরুষ জন্মেছিলেন আধ্যাত্মিক সাধনায় তাঁরা আশ্চর্য সিদ্ধিলাভ করেছিলেন, এ সমস্তই আমি জানি, কিন্তু আমার মনের সমস্ত শ্রদ্ধা সত্ত্বেও দেশব্যাপী দুর্গতি এবং তার কারণের কথা যখন ভাবি তখন কল্পনার ইন্দ্রজাল দিয়ে নিজেকে এবং অন্যকে ভোলাবার প্রবৃত্তি একেবারেই চলে যায়।"

কবি কল্পনার মোহজাল দিয়ে বাস্তব সত্যকে আবৃত করেন না—তাঁর গভীর কবিত্বের সঙ্গে বাস্তবজীবনের কোনো বিরোধ নেই। ব্যবহারিক জীবনে যে-সমস্ত তত্ত্ব খণ্ডিত তার কাব্যিক মূল্য দিয়ে সাধারণ মানুষের কতটুকু উপকার ? শক্তি-সাধনার তত্ত্ব যাই হোক, দৈনন্দিন জীবনে মানুষের সমাজ তার থেকে কি পেয়েছে কবির তাই বিচার্য। বস্তুত, যে ধর্মসাধনা, যে আরাধনা পদ্ধতি বিশ্বের দিক থেকে সম্প্রদায়ের দিকে অভিনিবিষ্ট কবির মন সেখানে রস পায় না। শুধু প্রচলিত হিন্দু

পূজা রীতি নয়, যেখানেই সৃষ্টি এবং স্রষ্টাকে পৃথক করে দেখে স্রষ্টার আরাধনার বিশেষ কোনো রীতির প্রবর্তন প্রচেষ্টা দেখা গেছে কবির মন সেখানে সায় দেয় নি। সাকার আরাধনার একটিই মাত্র প্রকার নেই, মনের মধ্যে মূর্তি গড়ার যে কারখানা আছে, বহু বিচিত্র ভাবে নানা দিক থেকে তা অভ্যাসবশতঃই নানা প্রতীক গড়ে তুলে আপন সত্তাকে তার কাছে বিক্রীত করতে চায়, চলনশীল প্রাণধর্মকে শৃঙ্খলিত করতে চায়। এ একটা আদিম অভ্যাস। সেই জন্যই ধর্ম প্রচার বা নির্দিষ্টভাবে ধর্মশিক্ষা পদ্ধতির দ্বারা মানুষের ধর্মবোধকে জাগ্রত করে, না তাকে অসাড় করে ফেলে সে সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের সংশয় জাগে।

…"আমরা ধর্মনীতির সর্বজনবিদিত সত্যগুলি এবং ঈশ্বরের শক্তি ও করুণা প্রত্যহ পুনরাবৃত্তি করিয়া সত্যকে কিছুমাত্র অগ্রসর করি না, বরঞ্চ অভ্যস্ত বাক্যের তাড়নায় বোধশক্তিকে আড়ষ্ট করিয়া ফেলি। যে-সকল কথা অত্যন্ত জানা তাহাদিগকে একটা নিয়মে বাঁধিয়া বারবার শুনাইতে গেলে হয় আমাদের মনোযোগ একেবারে নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়ে; নয় আমাদের হৃদয় বিদ্রোহী হইয়া উঠে।" ধর্মলাভের জন্য সমাজবদ্ধ কোনো বিশেষ রীতি অবলম্বন করতে থাকলে ক্রমে সেই রীতিই ধর্মের স্থান অধিকার করে বসে এবং দলাদলি সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টি হয়ে পড়ে, ফলে যথার্থ ধর্মই ধর্মসমাজের হাতে পীড়িত হয়। মনে হয় এই কারণেই ব্রাহ্মধর্মের গভীর বাণীও ভারতবর্ষের বিপুল জনসমাজে কোনোও সত্যবোধ উদ্দীপ্ত করতে, রসের আবেগ সঞ্চারিতে করতে পারল না, আপন আভিজাত্যর গণ্ডীর মধ্যে বদ্ধ হয়ে এ দেশের অসংখ্য sect-এর মধ্যে আর একটি মাত্র হয়ে ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্র হয়ে যেতে লাগল।

"মানুষের ইতিহাসে এমন অনেক ধর্মসম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়েছে যারা কাঠ-পাথর পূজাকে বলেছে হীনতা।……স্বীকার করি কাঠ পাথর বাইরের জিনিস, সেখানে সর্বকালের সর্বমানবের পূজা মিলতে পারে না……কিন্তু তাদের বিরুদ্ধ সম্প্রদায়েরও দেবতা প্রতিমার মতই বাইরে অবস্থিত। নানা প্রকার অমানুষিক বিশেষণে লক্ষণে সজ্জিত………এই পৌত্তলিকতা সূক্ষ্মতর উপাদানে রচিত বলেই নিজেকে অ-পৌত্তলিক বলে গর্ব করে। বৃহদারণ্যক এই বাহ্যিকতাকেও হীন বলে নিন্দা করেছেন। তিনি বলেন যে, দেবতাকে আমার থেকে পৃথক করে বাইরে স্থাপন করি, তাকে স্বীকার করার দ্বারাই নিজেকে নিজের সত্য থেকে দূরে সরিয়ে দিই।"

রবীন্দ্রনাথের ধর্মভাবনার মধ্যে এই কথাটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। স্রষ্টা ও সৃষ্টিকে পৃথকরূপ দেখার দ্বারা, স্রষ্টাকে তার সৃষ্টির বাহিরে কল্পনা করায় অসীম অনন্তকে খণ্ডিত করা হয় মাত্র। যে দু'টি ভাব রবীন্দ্রকাব্যে জীবনে কর্মে সাধনায়

পরিব্যাপ্ত, সুদীর্ঘ জীবনের চিন্তার নানা স্তরে ঊর্ধ্ব থেকে ঊর্ধ্বে উঠেও কখনো খণ্ডিত হয় নি, যে মূল দু'টি সত্য তাঁর সমস্ত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম চিন্তাজাল ও অনুভবের আনন্দ-বেদনাকে বিধৃত করে রেখেছে তা সংক্ষেপে এই যে, স্রষ্টাকে পৃথক দেবতারূপে কল্পনা করে স্তবে পূজায় নানা বিশেষণে ভূষিত করে নির্দিষ্ট সময়ে বাক্‌বিস্তার করার চেয়ে চিন্তায় কর্মে জীবনের বিন্যাসে মানবের পরমত্ব উপলব্ধি করার সাধনা করা চাই। যে গভীরতর মানব সত্য সংসার ও জীবনকে পরিব্যাপ্ত করেও সংসারকে অতিক্রম করে আছে কবির মতে দ্বৈতবাদের খণ্ডিত দৃষ্টি বা অদ্বৈতবাদের কুহেলিকাচ্ছন্নতা কোনওটিই সেই বোধকে জাগ্রত করার পক্ষে পর্যাপ্ত নয়। সেই কারণেই তাঁর কাছে বৈরাগ্য বা চিত্তবৃত্তিনিরোধের দ্বারা জগৎ-সংসারকে মায়ারূপে কল্পনা করা বা অনিত্য বলে বিসর্জন দেওয়া ব্রহ্মের প্রকাশকেই অস্বীকার করা। বৈদান্তিক মতে যেখানে নেতিবাদ, যে ব্রহ্ম অস্পর্শ অজ্ঞাত সে রবীন্দ্রনাথের কেহ নয়। এ বিশ্ব মায়া নয়, মিথ্যা নয়—এই প্রকৃতি তার রূপ রস গন্ধ নিয়ে, এই মানুষ তার স্নেহ প্রেম বুদ্ধি মন নিয়ে তাঁর কাছে অসীমের সংবাদ বহন করে আনে। ছিন্নপত্রে লিখছেন :—

"বেদান্ত পাঠে বিশ্ব এবং বিশ্বের আদি কারণ সম্বন্ধে অনেকেই নিঃসংশয় হয়ে থাকেন কিন্তু আমার তো সংশয় দূর হয় না। এক হিসাবে অন্য অনেক মত অপেক্ষা বেদান্ত মত সরল। সৃষ্টি ও সৃষ্টিকর্তা কথাটা শুনতে সহজ কিন্তু অমন সমস্যা আর নেই। বেদান্ত তারই গর্ডন গ্রন্থি ছেদন করে বসে আছেন—সৃষ্টি একেবারেই নেই, আমরাও নেই, আছেন কেবল ব্রহ্ম আর মনে হচ্ছে—যেন আমরা আছি।"...

অর্থাৎ আমি আর কিছুই নয়—আমিই সেই ব্রহ্ম, আর সবই মায়া, এই হচ্ছে 'সোঽহং' মন্ত্র। বেদান্তর মায়াবাদ কবির চিত্ত স্পর্শ করে না। এ সংসারকে মায়া মোহরূপে পরিত্যাগ করে বৈরাগ্যের দ্বারা আনন্দময় ভুবন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়াই তিনি সমস্যা সমাধানের সোজা পথ বলে মনে করেন না। জগৎ সংসারের সমস্ত আকর্ষণ পাশই তাকে নিরন্তর আপনার দিক থেকে বিশ্বের দিকে টানছে। এই বিশ্বকে বিশ্বাস করে, এই বিশ্বকে গ্রহণ করে এরই ভিতর দিয়ে বিশ্বাতীতকে তিনি উপলব্ধি করেন। তিনি বলেন, "জগতের সৌন্দর্যর মধ্য দিয়া, প্রিয় জনের মাধুর্যর মধ্য দিয়া ভগবানই আমাদের টানিতেছেন, আর কাহারো টানিবার ক্ষমতাই নাই। পৃথিবীর প্রেমের মধ্য দিয়াই সেই ভূমানন্দের পরিচয় পাওয়া, জগতের এই রূপের মধ্যেই সেই অপরূপকে প্রত্যক্ষ করা, ইহাকেই তো আমি মুক্তির সাধনা বলি।" "সোঽহং" মন্ত্রের এক নূতনতর ব্যাখ্যা করেছেন রবীন্দ্রনাথ। "আমিই

সে"—শুধু তাই নয়, আমিই যে সে—এই জানার চেষ্টাই মানবধর্মের চরম অভিব্যক্তি। এই জানা বাইরে থেকে যুক্তিতর্কের দ্বারা বাহ্যজ্ঞান নয়। আমিই সে হয়ে ওঠার দ্বারাই মুহূর্তে মুহূর্তে জানা। সাগরগামিনী নদী যেমন করে সমুদ্রকে জানে। সে সমুদ্রের থেকে পৃথক নয় বলেই সমুদ্র হতে হতে সমুদ্রকে পায়। দিগন্তপ্রসারী অপার অনন্ত সমুদ্রের আহ্বানে নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গের মত, জীবন-প্রত্যুষের এক আশ্চর্য অনুভূতি তাঁকে প্রচলিত সমস্ত ধর্মতন্ত্র সমাজ ও মতবাদ থেকে স্বতন্ত্রপথে ক্ষণিকজীবন থেকে বিশ্বজীবনের অভিমুখে আকর্ষণ করে নিয়ে গেছে। কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিক্ষণে এক প্রত্যুষে আধ্যাত্মিক একটি গভীর অনুভূতি আশ্চর্যভাবে তাঁর সারাজীবনের মধ্যে জ্ঞানে কর্মে ভাবে যে বিশেষ প্রভাব ফেলেছিল সে কথা তিনি বারংবার নানাস্থানে বলেছেন। তবু সে কথাটি বর্তমান আলোচনা-প্রসঙ্গের সঙ্গে এতই যুক্ত যে, এখানে "মানুষের ধর্ম" গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত করছি—"সেই ভোরে উঠে একদিন চৌরঙ্গীর বাসার বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিলুম। তখন ওখানে 'ফ্রী-স্কুল' বলে একটা ইস্কুল ছিল। রাস্তাটা পেরিয়েই ইস্কুলের হাতাটা দেখা যেত। সে দিকে চেয়ে দেখলুম গাছের আড়ালে সূর্য উঠচে। যেমনি সূর্যের আবির্ভাব হল গাছের অন্তরাল থেকে অমনি মনের পর্দা খুলে গেল। মনে হল মানুষ আজন্ম একটা আবরণ নিয়ে থাকে—সেটাতেই তার স্বাতন্ত্র্য। স্বাতন্ত্র্যের বেড়া লুপ্ত হলে সাংসারিক প্রয়োজনের অনেক অসুবিধা। কিন্তু সেদিন সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে আবরণ খসে পড়ল। মনে হল সত্যকে মুক্তদৃষ্টিতে দেখলুম। মানুষের অন্তরাত্মাকে দেখলুম। দু-জন মুটে কাঁধে হাত দিয়ে হাসতে হাসতে চলেছে। তাদের দেখে মনে হল কী অনির্বচনীয় সুন্দর।...সেদিন তাদের অন্তরাত্মাকে দেখলুম যেখানে আছে চিরকালের মানুষ।"

আঠার উনিশ বছর বয়সে যে অভিজ্ঞতা প্রত্যক্ষবৎ তাঁর জীবনে উদ্ভাসিত হয়েছিল—৭৩ বছর বয়সে লেখা এই প্রবন্ধের রচনাকালেও সেই অভিজ্ঞতার সত্যতা তাঁর অনুভূতিকে স্পর্শ করে আছে, তাঁর জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ হয়ে চিন্তা-মননা ও কর্মকে ঐশ্বর্যে ভরে দিচ্ছে। এই যে সুন্দরকে দেখার কথা কবি বল্লেন এর সঙ্গে মেলে সেই ব্রহ্মবাদী ঋষিদের বাণী যাঁরা বলেছেন, 'বেদাহমেতং পুরুষম্ মহান্তম্ আদিত্যবর্ণম্ তমসঃপরস্তাৎ'—এই জানা বা দেখার প্রত্যক্ষবৎ অনুভূতির মধ্যে সত্যের যে অব্যবহিতবোধ সেখানেই কবি দেখছেন ব্রহ্মের প্রকাশ। শিল্পের অভিজ্ঞানের মতই তা যুক্তিতর্কের অতীত। মানুষের যে অংশ জৈবিক প্রয়োজনে অন্নবস্ত্রের সন্ধানে আত্মআবর্তনে রত সে অংশ সুন্দরকে চায় না, ধর্মকেও চায় না। কিন্তু মানুষের যে অংশ আশু প্রয়োজনের সীমাকে অতিক্রম করে আছে, কবি বলেন,

সেই অংশেই মনুষ্যত্বের লীলাভূমি, সেইখানেই তার নৈতিকবোধ, আত্মবিসর্জনকারী প্রেম সৌন্দর্য ও মাধুর্যের বিকাশ। পদ্মফুল যেমন শুধু তার পাপড়ি, রং বা মৃণালের যোগফল নয়, এ সকলকে অতিক্রম করে তার সৌন্দর্য, তেমনি মানুষ কেবলমাত্র তার জীবদেহের নানা প্রয়োজনের সমন্বয়েই পূর্ণ হয় না; তার প্রতিদিনের জীবনকে অতিক্রম করে তার বিরাট মানসভূমি ক্রমাগতই তার চারিদিককে তার প্রবৃত্তি ও বাসনাকে ছাড়িয়ে দূরে চলে যাচ্ছে। জাগছে তার দেশপ্রেম যার জন্য ক্ষণে ক্ষণে সে জৈব দেহকেও ত্যাগ করতে প্রস্তুত হয়। শিল্পী বা স্রষ্টারূপে আধপেটা খেয়েও সে দেহমন সমর্পণ করে দেয়, যে উচ্চতায় দাঁড়িয়ে যে মৃত্যুর সম্মুখীন হয়েও বলতে পারে শত্রুকে ক্ষমা কর। আলোছায়াভরা বিশ্বসৌন্দর্য তার অন্তরাত্মাকে সুরে ভরে দেয়। তখন সে যা কিছু করে তা কেবলমাত্র নিজের জন্যই করে না, সমগ্র মানবজগতের জন্য করে। দেশে কালে জাতিতে সম্প্রদায়ে বিভক্ত তার ক্ষনিক জীবন এইসব বিচিত্র কর্মের মধ্য দিয়ে কোন দূরপ্রসারী এক বিরাট সত্তার সঙ্গে সংযুক্ত হয়। কবি বলেন, একই দেহে এই 'আমি' বাস করচে; একজন আত্মপ্রয়োজন সাধনে লিপ্ত আর একজন প্রয়োজনের অতিরিক্ত ভূমিতে নিজেকে প্রসারিত করে সকল মানুষের সঙ্গে মিলিত হতে যাত্রা করে বের হয়। নানা সুখ-দুঃখ-ভোগত্যাগের মধ্য দিয়ে এই বড় মানুষের উপলব্ধিকে বিচিত্রভাবে জীবনে সত্য করে তোলাই মানুষের ধর্ম। তা সে কাব্যের পথে, শিল্পের পথে, ধর্ম বা অনুভূতির যে-কোন পথ দিয়ে ঘটতে পারে।

বালকবয়সে সেই প্রত্যুষের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা কবির জীবনে মহামানবের আহ্বান শুনিয়ে দিল। নির্ঝর যেমন সমুদ্রের আহ্বানে তার পাথরের কারাগার ভেঙ্গে ছুটে চলে তেমনি ক্ষুদ্র আমিত্বের জড়তা ও স্বার্থের কারাগার ভেঙ্গে কবির জীবন বিচিত্র অভিজ্ঞতার স্পর্শে সমৃদ্ধ হতে হতে মহামানব-সাগরে মিশবার জন্য ব্যাকুল হল। এ ব্যাকুলতা কাব্য বা শিল্পের উৎকর্ষর মধ্যেই সমস্ত শক্তি নিঃশেষ করে দিল না। ছোট বড় নানা কর্মের মধ্যে প্রতিদিনের নিরলস চেষ্টার দ্বারা সার্থক হতে লাগল। বিশ্বমানবের অভিমুখে নিজেকে প্রসারিত করবার এই যে প্রয়াস এ কোনো পরহিত ব্রত বা পুণ্যকর্মের মত নয়...লৌকিক বা পারলৌকিক মুনাফালাভের প্রশ্ন সেখানে নেই। শিল্পের মত, কাব্যের মত তার সার্থকতা তার আপন আনন্দেই। গান্ধারীর আবেদনে গান্ধারী তাই বলছেন:—'ধর্ম নহে সম্পদের হেতু, সে নহে সুখের ক্ষুদ্র সেতু। ধর্মই, ধর্মের শেষ। এ কথাটি 'art for art's sake' এর সমভাবাপন্ন।

শুনেছি কবির মূলমন্ত্র ছিল—আনন্দরূপমমৃতম্ যদ্বিভাতি। ঈশ্বর আনন্দরূপেই

প্রকাশিত। এই আনন্দ থেকেই বিশ্বসৃষ্টি। মানুষের অন্তরাত্মায়ও আনন্দর অখণ্ড গতিবেগ চঞ্চল করে তোলে সৃষ্টির প্রয়াস। মানুষ অকারণ পুলকে গড়ে রূপ, লাগায় রং, বাঁধে গান। রূপে প্রকাশ হয় তার আনন্দ, আবার সেই সৃষ্টিরূপ আমাদের চৈতন্যকে আনন্দে উদ্বুদ্ধ করে। বিশ্বের মধ্যেও এই আনন্দলীলা নানা বিচিত্ররূপে ও ভাবে সৃজ্যমান হয়ে উঠছে। সুখদুঃখের ভিতর দিয়ে গড়ে উঠছে যে মানবাত্মা, জড় প্রকৃতি ও বিশ্বের সকলের সঙ্গে তার আন্তরিক সংযোগ, কেহই তার পর নয়, অনাত্মীয় নয়।

"আমার সমস্ত জীবন দিয়ে যে-জিনিসটি সম্পূর্ণ আকারে গড়ে তুলতে পারব, সেই আমার চরম সত্য। জীবনের সমস্ত সুখ-দুঃখকে যখন বিচ্ছিন্ন ক্ষণিকভাবে অনুভব করি, তখন আমাদের ভিতরকার এই অনন্ত সৃজনরহস্য ঠিক বুঝতে পারিনে —প্রত্যেক কথাটি বানান করে পড়তে হলে যেমন সমস্ত পদটির অর্থ এবং ভাবের ঐক্য বোঝা যায় না। কিন্তু নিজের ভিতরকার এই সৃজনীশক্তির অখণ্ড ঐক্যসূত্র যখন একবার অনুভব করা যায় তখন এই সৃজ্যমান অনন্ত বিশ্বচরাচরের সঙ্গে নিজের যোগ উপলব্ধি করি। বুঝতে পারি যেমন গ্রহ নক্ষত্র চন্দ্র সূর্য জ্বলতে জ্বলতে ঘুরতে ঘুরতে চিরকাল ধরে তৈরী হয় উঠবে, আমার ভিতরেও তেমনি করে একটা সৃজন চলেছে ; আমার সুখ-দুঃখ বাসনা বেদনা তার মধ্যে আপনার আপনার স্থান গ্রহণ করছে।"

এই সৃষ্টিলীলার বিপুল সমারোহে বিশ্বপ্রকৃতি ও মানব-প্রকৃতি দুই-এর মধ্যে এক অবিচ্ছিন্ন যোগে বিশ্বেশ্বরের যে রূপ রবীন্দ্রনাথের চেতনায় মূর্ত হয়েছে সে তাঁর সৃষ্ট বিশ্ব থেকে পৃথক রূপ নয়। তিনিই মানুষের অন্তরমত সত্তা যিনি জগৎচরাচরের মধ্যে মানুষের স্নেহে প্রেমে বিকশিত হয়ে অপূর্ব সৌন্দর্যের সৃষ্টিলীলা উপভোগ করছেন। তিনি তাঁর বিশ্ব থেকে বিযুক্ত শাসক পালক বা নিগুর্ণ অজ্ঞেয় ব্রহ্ম নন। সেই চিরপ্রবহমান বিশ্বসত্তা মানুষের সুখে-দুঃখে প্রবেশ করে তাকে সুখ-দুঃখ পার করে নিয়ে অসীমের পথে চলেছে—সে যাত্রায় সৃষ্ট হয়ে উঠছে অরূপ থেকে রূপ, অভিব্যক্ত হচ্ছে অসীম সীমার মধ্যে—"এঁকেবেঁকে আকার এঁকে এঁকে চলছে নিরাকার।" তাই কবি তাঁর জীবনদেবতাকে প্রশ্ন করছেন আমাকে অবলম্বন করে তোমার যে শিল্প সৃষ্ট হয়ে উঠছে তাতে তুমি তৃপ্ত হয়েছ ত? "লেগেছে কি ভালো হে জীবননাথ, আমার রজনী আমার প্রভাত, আমার নর্ম, আমার কর্ম তোমার বিজন বাসে?"

ঈশাবাস্যম্ ইদম্ সর্বম্ ঈশ্বরকে সমস্ত বিশ্বব্যাপারের মধ্যে ওতোপ্রোত জানলে তখন কোনো কর্মই ক্ষুদ্র বা অনাদৃত থাকে না, সমস্তই অনির্বচনীয় আনন্দে পূর্ণতায়

অভিমুখে প্রবাহিত হয়। ডাকঘরের অমল সেই আনন্দের স্পর্শ সঞ্চারিত করলে তার আপন অন্তর থেকে চারপাশের মানুষের মধ্যে ; তখন দৈ-ওলা তার দৈ বিক্রীর মত অকিঞ্চিৎকর কাজেও পেল কি আনন্দ। জীবনদেবতার সঙ্গে জীবনকে পৃথক করে না দেখলে পূজানুষ্ঠান বা উপাসনার বাক্‌বিস্তাররীতির কোনো প্রয়োজনই থাকে না। শান্তিনিকেতন আশ্রমের মন্দিরে পঠিত শান্তিনিকেতন প্রবন্ধাবলী যতখানি ব্রহ্মবিজ্ঞান ততখানি স্তব বা ঈশ্বরের গুণকীর্ত্তন নয়। রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক সঙ্গীতগুলি এবং অনেকগুলি প্রেমের গান একই ভাবে মানুষের মনকে অনুভবের তীব্রতার উদ্দীপ্ত করে তোলে। ফলে শ্রোতার মনে ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতা, বা তাঁর অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোনও সুনিশ্চিত ধারণা জাগুক বা না জাগুক, জাগে প্রেম, তার অন্তরের গভীরে ক্ষণিকের জন্য হলেও এক বড় জীবনের আস্বাদ ঘটে। চিন্তা করে দেখলে রবীন্দ্রজীবনের এই বাণী যথার্থই religion নয়, অর্থাৎ কোনো সম্প্রদায়-নির্দিষ্ট নিয়ম ও পদ্ধতির দ্বারা তার আচরণ নিবদ্ধ নয়। কিন্তু তা religiosity বটে। তিনি তাঁর আশ্রমজীবনে প্রকৃতির সমাবেশে, গানের সুরে ও ভাবে, কাব্যে গভীর নিহিতার্থে এমন পরিবেশ সৃষ্টি করেন যাতে ধর্মভাব উদ্দীপ্ত করে তোলে। সেইজন্যই রবীন্দ্র-সঙ্গীতের বাণী মর্ম স্পর্শ করলে আর সকলপ্রকার অনুষ্ঠান নিরর্থক বোধ হয়। রবীন্দ্রনাথ বলেন, ধর্মশিক্ষা, বা প্রচার সম্ভব নয়। যে মুহূর্তে প্রচারক সে চেষ্টায় প্রবৃত্ত হন সে মুহূর্তেই তা গণ্ডীবদ্ধ হয়ে প'ড়ে অসীমের বোধকে খণ্ডিত করে—এবং যে মুক্তি দেবে তাকেই বন্ধনের যূপকাষ্ঠ করে তোলা হয়। একজন নবীন খৃষ্টান মিশনারীকে একটি পত্রে তাই রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন : "ঠিকাদার যেমন তার প্রভুর চা-বাগানের জন্য কুলী সংগ্রহে প্রবৃত্ত হয় তুমিও তেমনি ঈশ্বরের মজুরসংগ্রহে প্রবৃত্ত হয়ো না।"

স্নেহে প্রেমে ভক্তিতে ত্যাগে সৌন্দর্যবোধে জ্ঞানের শুদ্ধ আনন্দে বিচিত্র ভাবতরঙ্গ মানুষের মিলনগানের যে সুর ক্ষণে ক্ষণে ধ্বনিত করে তোলে তারই ভিতর থেকে বিশ্বাতীত বাণী শোনবার জন্য কান পেতে থাকা চাই। দেহে দেহে জীব স্বতন্ত্র, সেই দেহ রক্ষার খাতিরে তার যুদ্ধবিগ্রহ, সংসারের বিপুল আয়োজন তা সত্ত্বেও সে মনে মনে মানবসমাজের সঙ্গে সংযুক্ত, নিজের অন্তরে সে সত্য উপলব্ধি করা ও সেই পথে আপনাকে নিয়ন্ত্রিত করাতেই তার মূল্য এবং মর্যাদা। সকলের সঙ্গে সহযোগিতার মধ্যে মানুষ সার্থকতা পায়, তার সভ্যতা গড়ে ওঠে, পূর্ণতা পায়।

"কারণ মানুষও আপন অন্তরের গভীরতর চেষ্টার প্রতি লক্ষ্য করে অনুভব করেছে যে, সে শুধু ব্যক্তিগত মানুষ নয়, সে সেই বিশ্বগত মানুষের একাত্ম, সেই বিরাট মানব "অবিভক্তঞ্চভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্।"

রবীন্দ্রনাথের সমগ্র জীবন ও কর্মের মধ্যে এই বিশ্বমানবের আবির্ভাব কেমন করে সত্য হয়েছিল তার পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করার সাধ্য আমাদের নেই। তবু যেমন রবীন্দ্রকাব্যে ও জীবনে কোনো বিরোধ নেই এবং তাঁর সমগ্রজীবন ও রচনা কাব্যের মতই সৌন্দর্যরূপে প্রভাসিত তেমনি মানবের নিত্যধর্মও তাঁর জীবনের কর্মের মধ্যে প্রকাশিত। ধর্মকে কোনো বিশেষ সময়ে, বিশেষ স্থানে না রেখে তা তাঁর দৈনন্দিন কর্মে জুগিয়েছে আনন্দরস। তাই নিজের সন্তানের শিক্ষা দিতে গিয়ে যা চিন্তা করেন তা শুধু নিজের সন্তানের মঙ্গলসাধনেই পরিসমাপ্ত হতে চায় না। ব্রহ্মবিদ্যালয় স্থাপনা হয়। নিজের জাতির মঙ্গলসাধনপ্রয়াস বিশ্বমানবের কল্যাণ-সাধনে উদ্বুদ্ধ করে। তখন ক্ষুদ্র জাতীয়তার বন্ধন খুলে শক্তিমত্ত পাশ্চাত্ত্য জাতির সামনে দাঁড়িয়ে নেশনতন্ত্রের কাছে নরবলি দিতে নিষেধের বাণী উচ্চারণ কবেন। শান্তিনিকেতনের গ্রামের ক্ষুদ্র প্রাঙ্গণে বিশ্বের মানুষকে ডাক দিয়ে আনেন, ঘোষণা করেন এক পরম সত্য যে, মানুষের যা শ্রেষ্ঠ দান তা যে দেশে যে কালেই সৃষ্ট হোক তাতে সকল মানুষের অধিকার :—"যেখানেই যে তপস্বী করেছে দুষ্কর যজ্ঞযাগ, আমি তার লভিয়াছি ভাগ"…

এই মহামানবের আহ্বানে কবির জীবন শিলাইদহের পল্লীছায়াময় শান্ত সৌন্দর্যের ধারা বয়ে জনাকীর্ণ কোলাহলময় কর্মক্ষুব্ধ দেশদেশান্তর পার হয়ে, বিচিত্র কর্ম ও অভিজ্ঞতায় বিস্তৃত হয়ে কাব্যে সঙ্গীতে জ্ঞানে কর্মে পূর্ণ থেকে পূর্ণতর হয়ে গতিপথকে ঐশ্বর্যশালী করে মহাসমুদ্রের মোহনার দিকে চলে গেছে যেখানে :— "সম্মুখে অকূল সিন্ধু নিঃশব্দ রজনী"…বিচার করে দেখতে গেলে বাংলাদেশের বর্তমান শিক্ষিত মানুষের জীবনে রবীন্দ্র-সঙ্গীত এক নূতন ধর্মচেতনার আভাস দিয়েছে। ধর্মই হোক বা ধর্মভাবই হোক, সৌন্দর্যলোকের এক নিগূঢ় অনুভূতির ভিতর দিয়ে এই সূর্যসনাথ জ্যোৎস্নামোদিত সুন্দরী পৃথিবী, জ্যোতিষ্কখচিত মহাশূন্য তার কাছে আশ্চর্য সংবাদ নিয়ে এসেছে। রবীন্দ্র-সঙ্গীতেব বাণীতেই তার বিশ্ব অব্যক্ত আনন্দ মথিত হয়ে বিশ্বাতীত কোন আনন্দলোকের স্পর্শ পেয়েছে, তখন তার কাছে শাস্ত্র নিয়ম অনুষ্ঠান কৃত্য ইত্যাদির চেয়ে সত্যতর কোনো ধর্মের আবেগ "মর্ত্যের বুকে অমৃত পাত্রে"র ঢাকা খুলে দিয়েছে। এ দিক থেকে দেখলে রবীন্দ্রনাথকে এক নূতন ধর্মপ্রবর্তকও বলা চলে, কিন্তু তিনি নিজে সে কথা স্বীকার করেন না। এমন কি, যদিও তাঁর মননশীল মন, অতলস্পর্শ প্রজ্ঞা, সর্ববিষয়ে নূতন মত ও পথের নির্দেশ দিয়েছে তবু কোনও মতকেই তিনি অন্যের উপর আরোপ করতে চান না।

তর্ক ও বিচারের দ্বারা মতামতের প্রাধান্য স্থাপনা করেই তো বাক্য ও মনের

অতীতকে পাওয়া যায় না—'ন মেধয়া ন বহুধা শ্রুতেন।' তর্কের জয়-পরাজয় আছে—সত্য অপরাজেয়। আধ্যাত্মিক সত্য তাই বোধের দ্বারাই লভ্য, বিচারের দ্বারা নয়। প্রত্যহের কর্মের ভিতর দিয়ে পাপপুণ্য সুখদুঃখ গ্রথিত চলমান সংসারের ভিতর দিয়ে সেই আশ্চর্য বাণী ক্ষণে ক্ষণে আমাদের অন্তরের দরজায় এসে দাঁড়ায়, কিন্তু বহু সময়েই আমাদের চিত্তের অসাড়তা, ক্ষুদ্রতা তাকে আড়াল করে, ক্ষুদ্র কেরোসিনের বাতি যেমন আকাশভরা জ্যোৎস্নাকে আড়াল করে রাখে। কবি তাই সারাজীবন ধরে শান্তিনিকেতনের আশ্রমে সেই পবিবেশ, সেই আবেষ্টন সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন যেখানে কোনে পুঁথির মধ্যে নয়, বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে অনির্বচনীয়ের স্পর্শলাভ করবার আনুকূল্য ঘটবে। ছন্দে গানে সুরে ও সৌভ্রাত্রবন্ধনে প্রবাহিত হয়ে সেই পরম সত্য স্বার্থের কঠিন ভূমিকে রসসিক্ত, দ্রব করবে। এই ভাবকে যদি তাঁর নিজস্ব কোনো ব্যক্তিগত ভাব বলেও ধবা হয় তাতেও তাঁর আপত্তি নেই —কিন্তু বিশ্বদেবতা তাঁর জীবনদেবতারূপে যেভাবে অভিব্যক্ত হয়েছেন তাব মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। সংসার ও স্বর্গ অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধে যুক্ত হয়েছে, স্বদেশ ও বিশ্ব পরস্পবকে খণ্ডিত করেনি—কর্মের উৎস ক্রমাগতই আত্মকেন্দ্র থেকে বিশ্বের দিকে উৎক্ষিপ্ত হয়েছে। বিশ্বের মানুষকে একনীড় করেছেন, আবার ক্ষুদ্র গৃহাশ্রয় ছেড়ে ব্যোমচারী বিহঙ্গের মত দূবদূরান্তরে করেছেন যাত্রা। অসীমের দ্যোতনা এনেছেন সীমার মধ্যে। ছোট ছোট কবিতার ছত্রে ছত্রে কখনো বা সুরে সুরে কখনো বা রঙে রেখায় অসীম অনির্বচনীয়কে প্রত্যক্ষবৎ প্রতিভাত করেছেন মানুষের চেতনায়। মানবলোকে মহামানবের প্রতিষ্ঠা করেছেন। রবীন্দ্রনাথের ধর্মভাবনা সকলের পক্ষে গ্রহণযোগ্য বা সকলের চেতনাগম্য হোক বা না হোক, ঐ মত তাঁর নিজের জীবনে এত সত্য ছিল বলেই তাঁর প্রতি কর্মের মধ্যেই তা পূর্ণ হয়ে উঠেছে। তিনি যা বলেছেন, তিনি নিজে তাই হয়েছেন। এইখানেই তাঁর জীবন সাধনার চরম সার্থকতা। নদী যেমন সমুদ্র হতে হতে সমুদ্রকে পায় তেমনি তিনি ব্যক্তিগত মানুষ থেকে উত্তরোত্তর মহামানব হওয়ার দ্বারাই বিশ্বমানবের সত্তা উদ্ভাসিত করেছেন আমাদের জ্ঞানে। তাঁর সমসাময়িক যে-কেহ তাঁকে হৃদয়ের পূর্ণদৃষ্টিতে দেখেছে আজ তারা অন্তরের অন্তস্তল থেকে উচ্চারণ করতে পারে—

বেদাহমেতৎ পুরুষম্ মহান্তম্
আদিত্যবর্ণম্ তমসঃ পরস্তাৎ—

শুনেছি রবীন্দ্রনাথকে কোনো বালক তার অটোগ্রাফের খাতায় কতকগুলি প্রশ্নের উত্তর লিখে দিতে বলেছিল—তার একটি প্রশ্ন ছিল, "আপনার হিরো কে?" রবীন্দ্রনাথ উত্তর দিয়েছিলেন, "রামমোহন রায়।" রামমোহন রায়ের চিন্তায় মননায় ও কর্মে যে বাণীটি রূপ নিয়েছে সে হচ্ছে মানব-ঐক্যের বাণী, সাম্যের বাণী, সেই বাণীই রবীন্দ্র-সাধনা ও সাহিত্যের মূল সুর, প্রেরণা ও পরিণতি। ভারতের ধর্মীয় সাধনায় উপনিষদের দর্শনে মাঝে মাঝেই এই 'একের মন্ত্র' শোনা গিয়েছে বটে কিন্তু ভারতীয় সমাজ-জীবনে এই আদর্শ যেমন খণ্ডিত এমন আর কোথাও নয়। ভারতবর্ষের সমাজে যে সর্বনাশা ভেদবুদ্ধি মানুষকে মানুষ বলে না দেখে, তাকে জাতিধর্মের গণ্ডীতে বেঁধে, পরস্পরকে বিযুক্ত বিরুদ্ধ করে রেখে দেশকে অশক্ত করে ফেলেছে তারই আত্মক্ষয়ী রূপ রবীন্দ্রনাথ বিচারে বিশ্লেষণে তাঁর লেখনীর সমস্ত শক্তি দিয়ে আমাদের কাছে উপস্থিত করেছেন।

বিদেশের অধিকাংশ গীতিকাব্যেই আমরা প্রণয়সঙ্গীত সুকুমার ললিত বিরহের সুর শুনি, কখনো বা যৌনরসঘন গীতিকাব্যই আমাদের পরিচিত। রবীন্দ্রনাথের বিচিত্রগামী কবিতা ও সাহিত্যে এইসব ললিত সুরের অন্তরে অন্তরে প্রবাহিত হচ্ছে একটি স্পষ্ট দ্ব্যর্থহীন বাণী—সে হচ্ছে, চিরকালের মানুষের কাছে তাঁর প্রার্থনা "পরিত্রাণ করো ভেদচিহ্নের তিলকপরা সঙ্কীর্ণতার ঔদ্ধত্য থেকে।"

যে ভেদবুদ্ধি সর্বজনের স্বাধীন বুদ্ধি, স্বাধীন শক্তির বিকাশের পক্ষে অন্তরায় তার সর্বনাশা রূপ তিনি দেশের মধ্যে দেখেছিলেন। হরিজন আন্দোলনের বহু পূর্বে লেখা তাঁর কবিতা 'অপমানিত' দেশের সামনে যে দারুণ নিয়তির নির্দেশ করেছিলো তা আজও আমাদের মধ্যে মানবমূল্যবোধ সম্পূর্ণ জাগ্রত করতে পারেনি 'যারে তুমি নিচে ফেল, সে তোমারে টানিছে যে নিচে।' কারণ মানুষ একলা নয়, বহু মানুষের মিলনে তৈরী সমাজের পূর্ণতার মধ্যেই তার পূর্ণতা—সেই সমাজ যত বিভক্ত, যত পৃথক, তত দুর্বল, ব্যক্তি-মানুষের দুর্বলতাও ততই প্রবল। ভারতীয় সমাজে এই পার্থক্যের মূল রয়েছে জাতিভেদ, শাস্ত্রবাক্যে অন্ধবিশ্বাস, যা তার বিচারবুদ্ধিকে আচারের মরুবালুর মধ্যে শীর্ণ করেছে। গুরু-পুরুৎ গনৎকার শীতলা ওলাবিবি দক্ষিণরায় কত গল্প-কাহিনীতে ভয়ধরানো অলৌকিক বিশ্বাসে তার মন আবদ্ধ সংকীর্ণ, ভীত হয়ে রয়েছে। যা বাহ্যিক কতকগুলি আচার বা অভ্যাসমাত্র তাকে সে ভেবেছে ধর্ম এবং সেই ধর্মের দোহাই দিয়ে মানুষকে রেখেছে পর করে—'সম্মুখে

দাঁড়ায়ে রেখে তবু কোলে দাও নাই স্থান' কবির ইনডিকমেণ্ট তাঁর স্বদেশকে লক্ষ্য করে—"ঘৃণা করিয়াছ তুমি মানুষের প্রাণের ঠাকুরে" এবং এই ঘৃণাতেই রয়েছে তার সর্বনাশের মূল।

রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার সৌধ এই ঘৃণার ভিত্তির উপর কখনও দৃঢ় হতে পারে না। তাই সমগ্র দেশ যখন রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের উপরই সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দিয়েছিল তিনি তাঁর সমস্ত কর্মোদ্যোগকে নিযুক্ত করেছিলেন মানুষ গড়ার কাজে। যে দেশের ব্যক্তি-মানুষ আচারে প্রথায় সংস্কারে জাতিতে ধর্মে এত বদ্ধ, শৃঙ্খলিত, কেবল মাত্র রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতাই তাকে স্বাধীন করতে পারে না, এই ছিল কবির বক্তব্য। কবি তাই খুঁজছিলেন সেই ধর্ম যা মানুষের ধর্ম অর্থাৎ যা মানুষকে মেলাবে, তাকে বিচ্ছিন্ন করবে না।

এই মানব-ঐক্যের বাণী শুধু যে তাঁর গদ্যপ্রবন্ধগুলিতে বিচারে বিশ্লেষণে দেশের শিক্ষিত সমাজের কাছে উপস্থিত করেছেন তা নয়—এই বাণী তাঁর বহু কবিতায় গল্পে গানে উৎসারিত হয়ে রবীন্দ্র-সংস্কৃতির ধারা রূপে রসিকজনের চিত্তে গভীর অনুভূতি জাগিয়েছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইয়োরোপে যে সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতায় সর্বমানবের অধিকার ঘোষণা করা হয়েছিল, যে বিজ্ঞানপ্রচেষ্টা মানুষের জিজ্ঞাসাকে যুক্তি-বিচারের অভিমুখী করে সংস্কার ও শাস্ত্রবিশ্বাসের খুঁটিগুলি নড়িয়ে দিয়েছিল, সেই মুক্তির বাতাসই এনেছিলেন রামমোহন রায়। এদেশের অচলায়তনের জানালা খুলে দিয়ে এদেশে নবযুগের উদ্বোধন করেছিলেন। এই যুগের বাণীতে প্রত্যেক মানুষের জন্য একটি আশ্বাস ছিল যে, তার ভাগ্য, তার জন্ম, একটি নিরেট কবরের দেয়ালের মত নয়—সে তার জন্মের পরিচয় থেকে বেরিয়ে আপন ভাগ্য আপনি সৃষ্টি করতে পারে। এই এক নূতন সত্য ইংরেজী শিক্ষার ধারা বেয়ে এদেশে এসে পৌঁছল—রবীন্দ্রনাথ পশ্চিমের এই নব-উদ্ভূত চেতনাকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেছেন, এ যুগ পশ্চিমের সঙ্গে সহযোগিতারই যুগ, অসহযোগিতার নয়—"সম্প্রতি পশ্চিম হইতে ইংরেজ আসিয়া ভারতবর্ষের ইতিহাসের একটি প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে। এই ঘটনা অনাহূত আকস্মিক নহে। পশ্চিমের সংশ্রব হইতে বঞ্চিত হইলে ভারতবর্ষ সম্পূর্ণতা হইতে বঞ্চিত হইত। য়ুরোপের প্রদীপের মুখে এখন যে শিখা জ্বলিতেছে সেই শিখা হইতে আমাদের প্রদীপ জ্বালাইয়া লইয়া আমাদিগকে কালের পথে আর একবার যাত্রা করিতে হইবে।"

রবীন্দ্রনাথের স্বদেশচিন্তা তাই কোনো গণ্ডীবদ্ধ ভৌগোলিক চিন্তা নয়—যেখানেই তিনি দেশের কোনো গঠনমূলক পরিকল্পনা করেছেন, কোনো কর্মোদ্যোগ

করেছেন, তার মধ্যে এমন কিছুই নেই যা মানুষে মানুষে মিলনের পথে বিঘ্ন আনতে পারে। অসহযোগিতার পথ তাঁর নয়—সর্বমানবের সহযোগিতাই তাঁর কাম্য। সেইজন্য তাঁর জাতীয়তা সর্বদাই আন্তর্জাতিকতার সঙ্গে গ্রথিত। সাময়িকের চেয়ে চিরন্তনের দিকে তাঁর দৃষ্টি সর্বদাই প্রসারিত। অতি অল্প বয়সের লেখা 'বৌ-ঠাকুরানীর হাট' যা পরে 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটক করা হয়েছে সেখানেও আমরা এই বিশ্বভাবনাই দেখতে পাই। পরিণত বয়সে বহু চিন্তা মননা ও অভিজ্ঞতার পথে রবীন্দ্রকাব্যে যে বিশ্বমানবতা স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়েছে, অতি অল্প বয়সে কাঁচা হাতের রচনা এই কাহিনীটিতে আমরা তারই সূচনা দেখছি। প্রতাপাদিত্যের রাজদর্পর চেয়ে সাম্প্রদায়িক গর্বের চেয়ে প্রাদেশিক বুদ্ধির দৌরাত্ম্যের চেয়ে যে বসন্তরায়ের মানবপ্রেম অনেক বড় এবং নিষ্ঠুর ক্রুরকর্মের চেয়ে দয়াতেই যে বীরত্বের বেশি প্রকাশ এই গভীর সত্যটি শুনতে যত সহজ কাজে তত হয় না। বিশেষতঃ সেই স্বাদেশিকতার যুগে যখন বুদ্ধির চেয়ে উত্তেজনা প্রবল হয়ে উঠেছিল তখনও রবীন্দ্রনাথ বিরুদ্ধ সমালোচনার সম্মুখে দাঁড়িয়েও স্থিরবিশ্বাসে একথাই বারবার বলেছেন যে, গর্বিত বলদৃপ্ত আত্মাভিমান দেশপ্রেমের ছদ্মবেশে এসে যে পূজার অর্ঘ্য দাবি করে সে তার প্রাপ্য নয়। তার মধ্যে মানবতার চিরন্তন সত্যটি নেই। সর্বত্যাগী আত্মগরিমাশূন্য সর্বমানবের কল্যাণে রত যে দেশপ্রেম মানব-প্রেমেরই একটি অংশ রবীন্দ্রনাথ ধনঞ্জয় বৈরাগীকে প্রতাপাদিত্যের বিপরীতে রেখে তারই মহিমা প্রকাশ করেছেন। তখনকার রাজনৈতিক আবহাওয়ায় এভাব আনুকূল্য পায়নি, কারণ তখন প্রতাপাদিত্যকে বাঙালী বীরত্বের প্রতীক রূপে ধরে ক্ষুদ্র জাতীয়তা তৃপ্ত করেছিল।

চিরন্তন মানবতার এই বাণীই আছে ঘরে বাইরে উপন্যাস-কাব্যে। পরবর্তী-কালে লেখা 'গোরায়' যে গোরা স্বাজাত্যবোধের উদ্দীপ্ত প্রতীক যে দেশের ভালো মন্দ সমস্ত ভাবকেই দেশপ্রেমের আলোয় উজ্জ্বল করে দেখে গৌরবান্বিত—যার কাছে হিন্দু শাস্ত্রের সকল বিধানই অর্থবহ, যে ব্রাহ্মণ্য সাধনাকেই জীবনের পরম সাধনা বলে গ্রহণ করেছে, প্রেম ভালবাসা প্রভৃতি সমস্তই হৃদয়বৃত্তি যে সেই শাস্ত্র-নির্দেশিত বিধিনিষেধের কাছে তুচ্ছ করতে প্রস্তুত, সেই গোরা সহসা জানতে পারল যে, সে ব্রাহ্মণই নয়। এমনকি হিন্দুও নয়, সে ম্লেচ্ছ, খৃষ্টান। অন্তরের মধ্যে ব্রহ্মতেজ বলে সে যা কিছু কল্পনা করেছিল, যার জন্য সে তার পালিকা ধাত্রী খৃষ্টান লছমিয়ার হাতের জল খায় নি, সে আর কিছুই নয়, একটা সংস্কার মাত্র—যে সংস্কার কতকগুলি অলীক বিশ্বাসের উপর স্থাপিত। এই কথাই আছে 'কুয়াশা' গল্পের বত্রাওনের রাজকুমারীর মুখে যে ব্রাহ্মণ্যর কাছে সে তার অমূল্য হৃদয়ের

ভালোবাসা ভক্তি সমর্পণ করেছিল, সে তো জানত না যে, সে কতকগুলি অভ্যাস মাত্র। সে ভেবেছিল তা ধর্ম, তা অনাদি অনন্ত। আচার-অনুষ্ঠানের ধর্ম যেমন অনাদি অনন্ত ধর্মের কেহ নয়—বিংশ শতাব্দীর জাতীয়তার দর্পে দর্পিত ইয়োরোপের দিকে তাকিয়ে রবীন্দ্রনাথ বুঝলেন তেমনি আর এক ভাব যা দেশপ্রেমের নামে আজ সভ্য শিক্ষিত বিজ্ঞানী মানুষকে ছলনা করছে—তাও শাশ্বত মানবতার কেহ নয়।

যেমন ধর্মের নামে ভেদ সৃষ্টি করে মানুষ নিজের হাতে নিজের কারাগার তৈরী করে, বৃহৎ মানবসমাজের সঙ্গে বিযুক্ত হয়েছিল তেমনি দেশপ্রেমের নামে এই বিরোধমূলক আদর্শ, ধর্মতন্ত্রের মতনই এই নেশান তন্ত্র, নেশনে নেশনে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করে মহামানবেব মিলনক্ষেত্রেব পথে দুস্তর বাধা সৃষ্টি করছে। বিশেষ কবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আবহাওয়ায় যখন ইয়োরোপের মধ্যে মনুষ্যত্বের প্রকাশ ক্ষুণ্ণ হচ্ছে তখন কবিব কাছে জাতীয়তার বিপদটি স্পষ্ট হয়ে উঠল। ইয়োরোপে এই সংঘাত যা ইম্পিরিয়ালিজমের দৌরাত্ম্যেব মধ্যে বলবীর্যেব সার্থকতা খুঁজছিল, যা অন্য দেশকে লুণ্ঠিত করে নিজের দেশেব স্ফীতিকে জাতীয়তা মনে করছিল সেই উদ্ধত স্বার্থ চেষ্টা যে মানবতার কেহ নয় তা যে মনুষ্যত্বের অপমান, সে কথা সেদিন রোমা রোঁলা বা বার্ট্রণ্ড রাসেল প্রমুখ দু-চাবজন ইয়োরোপীয় মনীষী বলবার চেষ্টা করেছিলেন তাঁদেব সঙ্গে যোগ দিলেন পরাধীন দেশের কবি রবীন্দ্রনাথ—তাঁর আবেগপূর্ণ সত্যবাণী তাঁর প্রতিভার সমস্ত শক্তি ও তেজ বহন করে বিশ্বে মন্দ্রিত হল। যে বই বিশ্বেব দরজায় জাতীয়তার সঙ্কীর্ণ বুদ্ধিকে নিন্দিত করে মানবতার বাণী ঘোষণা করেছিল সেই বইটিব নাম 'ন্যাশনালিজম'।

১৯১৬ সালে রবীন্দ্রনাথ ইয়োরোপেব পথে জাপানে গিয়েছিলেন। জাপান তখন পাশ্চাত্ত্যের কাছ থেকে যোদ্ধভাবের দীক্ষা নিয়েছে তাই সেদিন তার জাতীয়তার আদর্শের কাছে আন্তর্জাতিকতার ভাব অলস-কল্পনা মাত্র বোধ হয়েছে। যুদ্ধের উন্মাদনা তাব রক্তে প্রবেশ করেছে। সেই সময়ে জাপানের দু'টি ভাব তাঁকে ব্যথিত করেছিল, এক—তিনি দেখেছিলেন, জাপানেব সৌন্দর্যবোধ চরিত্রলাবণ্য বিদেশের উগ্র ভাবের প্রভাবে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আব এক—তার যোদ্ধভাব। তখনকার জাপানের আধুনিক পত্রপত্রিকাগুলি কবির শান্তির বাণী জনসাধারণের পক্ষে বিপজ্জনক বলে সাবধান করছিল। বলা হচ্ছিল এই শান্তিব বাণী হচ্ছে পরাজিত জাতির কবির বাণী। রবীন্দ্রনাথ তখন 'পরাজিতের গান" বলে একটি অপূর্ব কবিতা লিখেছিলেন। জাপানে থাকাকালে তিনি একটি শিশুবিদ্যালয় দেখতে গিয়েছিলেন। সেই সময়ে তাঁর সঙ্গে ছিলেন, সি. এফ, এনড্রুজ। যে দু'টি কারণে

জাপানে তাঁর মন বিমুখ বিষণ্ণ হয়েছিল তার দ্বিতীয়টি সেইদিন ঘটল। সি. এফ. এনড্রুজ লিখছেন, "আমিও তাঁর সঙ্গে ছিলাম, আমি অস্বাভাবিক কিছু লক্ষ্য করিনি, কিন্তু কবি ফিরে এলেন ভারাক্রান্ত চিন্তাগ্রস্ত মনে। তিনি দেখছেন, শিশুরা সব যোদ্ধবেশে সজ্জিত, আর বিদ্যালয়ের দেয়ালে রক্তচিহ্নিত যুদ্ধের (ট্রফি) লুটের মাল ঝুলান রয়েছে।...ঐ দৃশ্যে সেদিন তাঁর মনে প্রবল ধিক্কার এসেছিলো। তিনি তখনই প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, উদ্ধত স্বাজাত্য-অভিমান জগৎ-জোড়া পাগলামি জাগিয়ে তুলেছে তীব্রতম ভাষায় তার নিন্দা করবেন, এই সময় ন্যাশনালিজম গ্রন্থে তিনি নেশনতন্ত্রের যে সংহারক রূপ ফুটিয়ে তুললেন তাতে বিশ্বব্যাপী তুমুল আলোচনা সুরু হল। রোমা রোঁলা এই বই ফরাসীতে অনুবাদ করলেন। নোবেল প্রাইজ পাবার তিন বছর পর ঐ গ্রন্থ লেখা হয়েছিল—তখন ইয়োরোপে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগুন জ্বলছে। এই গ্রন্থ অল্পবয়স্ক ছেলে-মেয়েদের মন যুদ্ধবিমুখ করবে এই আশঙ্কায় ইংলণ্ডে ও এমেরিকায় এ বই বিষবৎ পরিত্যাজ্য বলে কাগজে কাগজে লেখালেখি চলল। শান্তির মদ্যপান করিয়ে তিনি যৌবনের তেজকে ঘুম পাড়িয়ে দেবেন এই ছিল ভয়—তবু বইটি নিষিদ্ধ হলেও ট্রেঞ্চে ট্রেঞ্চে সৈন্যদের হাতে হাতে ঘুরেছে। ঐ বই পড়ে ব্যক্তিগতভাবে কেহ কেহ যুদ্ধ থেকে, হননকর্ম থেকে, বিরত হয়ে শাস্তি বরণ করেছে এমন খবরও আছে। সে সময়ে প্রাচ্যে ও চীনে, জাপানে, ভাবতে অনেকেই জাতীয়তার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ শুনতে প্রস্তুত ছিল না। ন্যাশনালিজম হচ্ছে দেশপ্রেম—যে দেশপ্রেমের নামে কত ত্যাগ কত জীবনোৎসর্গ! তার মধ্যে যে কোন খাদ থাকতে পাবে, স্বদেশ প্রীতির মধ্যে যে কোন পাপ থাকতে পারে, তা সেদিন সাধারণ মানুষ ভাবতে পারেনি। কবি যখন নিঃসংশয়রূপে দেখিয়ে দিলেন স্বজাতিপ্রীতির উল্টোদিকে পরজাতিপীড়নের ছবিটি কেমন, দেখিয়ে দিলেন দেশপ্রেমের মুখোশপরা লোভের বিকট মূর্তি, ঘোষণা করলেন, 'এই অপদেবতার কাছে নরবলি দিও না' তখন মানুষ চমকে উঠল। তবু 'ন্যাশলালিজম' শব্দটির উপর যত ভক্তি অর্পণ করেছে, একদিন তাকে যে সিংহাসনে বসিয়েছে সেখান থেকে তাকে নামানো শক্ত, তাই ইয়োরোপের পত্রপত্রিকা উষ্মা প্রকাশ করতে লাগল। দ্বিতীয়বার ১৯২১ সালেও ইয়োরোপে কবি এই নেশান-তন্ত্রের বিপজ্জনক কীর্তি নানা উদাহরণে প্রমাণ করে চলেছেন। ফরাসী ব্যবসায়ী কর্তৃক আফ্রিকানদের শোষণের প্রকৃতি, দক্ষিণ আফ্রিকার কমপাল্‌সারি লেবার—প্রভৃতি বিষয়ে শ্বেতকায়দের স্বার্থগন্ধী যুক্তিগুলি বিশ্লেষণ করে বলেছেন, "মানুষের তো আত্মা আছে, মানুষ তো কেবল টাকার বস্তা নয়, যে মুনাফা থেকে মুনাফান্তরে লম্ফ দিয়ে দিয়ে অন্য মানুষের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে চালাতেই সার্থকতা হবে।"

ভারতে জালিয়ানওয়ালাবাগের ঘটনাও এই মেরুদণ্ড ভাঙ্গারই এক দৃষ্টান্ত। আমেরিকায় নিগ্রো-লাঞ্ছনা থেকে সুরু করে যেখানেই মানবতার কোনো লাঞ্ছনা সেখানেই কবির রসনায়, "সত্য বাক্য ঝলি ওঠে খর খড়্গ সম।" আর যেখানেই মানবতার কোনো শ্রেষ্ঠ প্রকাশ সেখানেই এনেছেন তাঁর অভিনন্দন।

মানুষের যা শ্রেষ্ঠ দান তারই আদানপ্রদানের জন্য তিনি বিশ্বভারতীর পরিকল্পনা করলেন। এমন একটি কেন্দ্র, যা হবে সহযোগিতায়, যেখানে একত্র হবে, একনীড় হবে, সারা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ চিন্তা—এই মহাভারতের সাগরতীরে হবে সেই ভৌগোলিক কেন্দ্র। জানি না বিশ্বভারতীর প্রারম্ভে এই কল্পনা যে রূপ নিয়েছিল দেশ-বিদেশ থেকে যে-সব জ্ঞানীগুণী, স্বাধীনচিত্ত মনীষীদের যাতায়াত ঘটে একটা 'বিশ্বভাব' মূর্তি নিচ্ছিল তার কোনো পরিণততর অবস্থা সেখানে গড়ে উঠছে কি না—কিন্তু কোনো আইডিয়ারতো ভৌগোলিক সীমা নেই—ভুবনচারী তার রূপ। সে অলক্ষ্যে থেকে দেশকালাতীত ভাবে নিজের কাজ করে যায়। ক্রমে সারা বিশ্বের মধ্যেই আজ এই বিশ্বভাব বহু মানুষকে ভাবিত করেছে—। যে এমেরিকায় কবির শান্তির বাণী একদিন '।৭৭৭'.' (মেণ্টল পয়জন) বলে পরিত্যজ্য হয়েছিল—আজ সেই এমেরিকার আকাশ জুড়ে শত শত যুবকের কণ্ঠে যুদ্ধের অবসানেব ইচ্ছা ও শান্তির আশ্বাসের বাণী ধ্বনিত হয়ে উঠছে। এদিকে সোভিয়েত দেশগুলির উদ্যোগে জগৎজুড়ে 'পিস কাউনন্সিল' গঠিত হয়েছে। সেদিনের চেষ্টার সার্থকতার পরিমাপ আজ শান্তিচিন্তার বিশ্বব্যাপকতায়। সর্বমানবের ঐক্যের বাণী আজ থেকে প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব থেকে আমৃত্যু রবীন্দ্রনাথ সারা পৃথিবীর নগরে নগরে প্রচার করে ফিরেছেন—জীবনাবসানের মুহূর্তে সেই "কাল্ট অফ্ ন্যাশানালইজম্"-এর বীভৎস রূপ নাৎসি জার্মানীর অভ্যুত্থান দেখে কী অপরিসীম বেদনাই পেয়েছিলেন কবি। ১৯২৬ সালে জার্মানীতে যুদ্ধের আয়োজন দেখে সোফিয়াতে কবি বলেছিলেন যে, আমার মনে হচ্ছে যে, ইয়োরোপ যেন একটা পাগ্লা গারদ, যেখানে উন্মাদরা তাদের পুত্রদের কবরের উপর সহর্ষে নৃত্য করছে।"

উনিশশো ত্রিশ সালে কবির শেষ ইয়োরোপভ্রমণ। নাৎসি জাতীয়তায় বিকট মূর্তির পাশে কমিউনিজমের মানবতা—সর্বমানবের মঙ্গলের অভিমুখী জীবনদর্শন, তাঁর কাছে হয়েছিল গভীর আশ্বাসবহ।

রবীন্দ্রনাথ একজায়গায় লিখেছেন, "মানব-ইতিহাসের প্রধান সমস্যাটা কোথায় ? যেখানে কোনো অন্ধতায়, কোনো মূঢ়তায় মানুষে মানুষে বিচ্ছেদ ঘটায়। মানব-সমাজের সর্বপ্রধান তত্ত্ব মানুষের ঐক্য। সভ্যতার অর্থই হচ্ছে মানুষের একত্র হবার অনুশীলনা।"

মৃত্যুর পূর্বে "সভ্যতার উপর রক্তসিক্ত লুব্ধ নখরে"র আঘাত তাঁকে গভীর দুঃখ দিয়েছিল। এমেরিকার বণিকবৃত্ত সভ্যতার কেন্দ্র থেকে মার্টিন লুথার কিং-এর কণ্ঠে তাঁর স্বপ্নের সেই সভ্যতার নূতন অনুশীলনা তিনি দেখে যান নাই। তবু তাঁর শেষ কথায় মানুষের উপর বিশ্বাস রেখে গেছেন।

বিদেশে রবীন্দ্র-সাহিত্য চর্চা

শুনেছিলাম একটি সাহিত্যসভায় কোনও সাহিত্যিক বলেছেন যে, সত্যই যদি বিদেশে রবীন্দ্রনাথকে জানবার ইচ্ছা প্রবল হয়ে থাকে তা'হলে তাদের এসে বাঙ্গালীর সঙ্গে একাসনে বসে রবীন্দ্রসাহিত্যের বর্ণপরিচয়ের পাঠ নেয়া কর্তব্য। এই আত্মগৌরবমূলক দম্ভোক্তি শুনে অবধি ভয়ে ভয়ে আছি, যদি সত্যই বিদেশের ববীন্দ্রজিজ্ঞাসু ব্যক্তিরা এই উপদেশ পালনে তৎপর হয়ে ওঠেন! রবীন্দ্রনাথ দৈবক্রমে বাংলাদেশে জন্মেছিলেন ও বেশীরভাগ রচনা বাঙ্গলাভাষায় লিখেছিলেন বলেই রবীন্দ্র চিন্তার প্রকৃতি বুঝতে বাঙ্গালীর কাছ থেকেই পাঠ নিতে হবে একথা বোধহয় অবিসংবাদী নয়। বাঙ্গালী মানসিকতার পরিধি দিয়ে রবীন্দ্রনাথকে মাপা যায় কি না, রবীন্দ্রনাথের আকৃতি ও প্রকৃতির মধ্যে বাঙ্গালীত্ব কতটুকু সেকথা তাঁরাই বলতে পারেন যাঁরা দীর্ঘদিন ধরে রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত সান্নিধ্যে থেকে তাঁকে বাঙ্গালী হয়ে জন্মানোর জন্য খেদোক্তি করতে শুনেছেন। কে অস্বীকার করবে যে, একদিকে যেমন জন্ম-জয়ন্তীর সমারোহ হয়েছে অন্যদিকে শেষদিন পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছেন, দোহাই তোমাদের, আমি কেবলমাত্র বাঙ্গালী নই—একথা সত্য কি না তা আজও জীবিত বহু ব্যক্তি সাক্ষ্য দিতে পারেন—যদিও, 'সার্থক জনম আমার জন্মেছি এদেশে' প্রভৃতি গানগুলি ভিন্ন সাক্ষ্য দেয তবু ভেবে দেখলে সেগুলি বঙ্গদেশের যতটা প্রাকৃতিক ততটা মানবিক গুণ বর্ণনা নয়। কিছু দিন পূর্বে সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর ভাষণে বলেছিলেন যে, নানা বিচিত্র-ভাবের সঙ্গীতের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের জাতীয় সঙ্গীতগুলিই নিরেস, এদের কবিত্বের জোর কম। যাঁরা ঐ সব গানে প্রেরণা পেয়ে বহু দুঃখ-কষ্টের তুফান পার হয়েছেন তাঁরা এ অভিযোগ স্বীকার করবেন না, তবু যদি এর মধ্যে একটু সত্য থাকে তবে তার গূঢ় কারণ বাংলাদেশের মানবিক সম্পদের উপর আস্থার অভাব।

রবীন্দ্রনাথের জীবিতকালে যোগ্য ও অযোগ্য এত কণ্ঠের নিন্দাবাদ, কুশ্রী ইঙ্গিত, ভৎর্সনা, লাঞ্ছনা তাঁকে নিত্যান্তই অকারণে শুনতে হয়েছে যে, স্বদেশপ্রীতির গাঢ়তা মাঝে মাঝেই সেই অম্লসংযোগে বিনষ্ট হওয়া আশ্চর্য নয়। 'সার্থক জনম আমার জন্মেছি এ দেশে' বলতে গিয়ে শুধুই তো বঙ্গভূমির মধুর মুরতি মনে পড়ে নি, যে হীন কটূক্তিগুলি শুনেছেন যার ফলে 'রাঙ্গা ফুল হয়ে উঠেছে ফুটিয়া হৃদয় শোণিতপাত'—সেগুলোও মনে পড়েছে—তখন একটি মাত্র আশা বাকি থেকেছে "তোমার এমন শাণিত বচন সেই কি অমর হবে?"

মনে তাই আশঙ্কা জাগে বাঙ্গালীর মন দিয়েই রবীন্দ্রনাথের পূর্ণ মূল্যায়ন সম্ভব কিনা। বিদেশী যাঁরা আজ রবীন্দ্র-সাহিত্য পড়েছেন ও সেজন্যই বাংলা শিখছেন তাঁদের অনেকের সঙ্গেই ব্যক্তিগত সৌহার্দ্য থাকায় এ সম্বন্ধে দু'-একটি কথা বলা উচিত মনে করি। কিছুদিন পূর্বে রবীন্দ্র-সাহিত্য চর্চায় উৎসুক একজন বিদেশিনী* কিছুদিনের জন্য কলকাতায় এসেছিলেন তাঁর স্বল্পকাল কলকাতায় বাসের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত চরিত্র, অভিরুচি ও কর্ম সম্বন্ধে যত নিন্দা যত দোষারোপ যত অসঙ্গত ও অমূলক কথা শুনে গেছেন বাঙ্গালীর সান্নিধ্যে ছাড়া আর কোন মতেই এই গভীর জ্ঞানলাভ তাঁর হতে পারত না এবং অবশ্যই রবীন্দ্র-সাহিত্যে অনুরাগ বৃদ্ধি করার পাঁচন সেগুলি নয়। রবীন্দ্রনাথের পারিবারিক কুৎসা যিনি তাঁকে শুনিয়েছিলেন তিনি একজন রবীন্দ্র-শাস্ত্রপারগ অধ্যাপক—আজকের পাঠকদের অনেকেরই হয়ত জানা নেই যে, অধ্যাপকদের ভয়ে রবীন্দ্রনাথ কিরকম সদা-শঙ্কিত থাকতেন। বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্র থেকে বিদেশীদের প্রতি যে অনুশাসন ঘোষিত হতে শোনা গেল ঐ বিদেশিনী সেই আদেশই পালন করতে অর্থাৎ বাঙ্গালীর কাছে শিক্ষার্থিনী হয়ে এসেছিলেন। কিন্তু ফলে প্রায় প্রতিদিনই রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে নানা "তথ্য" এইসব গুণীজনমুখে শুনে এসে আমাদের প্রশ্ন করতেন, অবশ্য আমরা যে অন্ধভক্তের দলে অতএব আমাদের ক্রিটিক্যাল ওপিনিয়ন নেই তাও তিনি শুনেছিলেন। ভদ্রমহিলা বাংলা কথা ভালই বলেন কিন্তু ক্রুদ্ধ হলে তার মুখ থেকে অজ্ঞাতসারেই শুদ্ধ বঙ্কিমী বাংলা নির্গত হয়, আমাদের যেমন হিন্দী ও ইংরেজী হয়ে থাকে। একদিন এমনি উত্তপ্ত ও অভিভূত মন নিয়ে তিনি ঝড়ের বেগে প্রবেশ করলেন :—"আজ আমি বুঝিতে পারিয়াছি রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে এত নিন্দা কেন শুনিলাম—আপনারা এই মহাকবির যোগ্য সম্মান দেন না।" "বলেন কি?" "আজ আমি নিমতলায় গিয়েছিলাম।" উত্তপ্ততর কণ্ঠে তিনি স্বগতোক্তি করলেন —"সেখানে গিয়া কি দেখিলাম? দেখিলাম দুইটি পাগলিনী ও তিনটি কুক্কুরী এই মহামানবের স্মৃতি-ক্ষেত্রে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।" প্রত্যুত্তরে আমরা বুঝিয়েছিলাম যে, ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গী দার্শনিক, পৌত্তলিকতায় প্রশ্রয় আমরা দেই না, স্থান-মাহাত্ম্যের অযৌক্তিক চিন্তা ত্যাগ করে মহাপুরুষদের আদর্শই জীবনে গ্রহণ করি আমরা। তিনি কোথায় বাস করেছেন, কোথায় সমাহিত হয়েছেন সে সব কথা, এহ বাহ্য। ভদ্রমহিলা চিন্তাযুক্ত হয়ে পড়লেন—ঠিক কথা। তবে রাজঘাটে এমন সুন্দর ব্যবস্থা হলঁ কেন? এর উত্তরে অবশ্য তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিতে হল যে, এসব বিষয়েও আমার ক্রিটিক্যাল ওপিনিয়ন নেই।

* ভেরা নভিকভা।

রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর বিশবছর পর পর্যন্ত তাঁর নামে; তার উপর গবেষণার জন্য কোনো প্রতিষ্ঠান তৈরী হয়ে ওঠেনি।*

রবীন্দ্র শতবার্ষিকী উপলক্ষে বহু অর্থ ব্যয় হয়েছে—তাতে ইমারৎ উঠেছে প্রচুর, তার মধ্যে নাট্যশালা প্রদর্শনী গৃহই সংখ্যায় অধিক, ছোট-খাটো মফস্বল শহরেও এই রকম বহু ব্যয়ে রবীন্দ্রনাথের নামে গৃহনির্মাণ ব্যবস্থার কথা প্রত্যহই কাগজে দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু এ পর্যন্ত এমন কোন প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠেনি যেখানে রবীন্দ্রানুশীলন চলেছে বা রবীন্দ্রসাহিত্য পাঠের উপযোগী ব্যবস্থা হয়েছে। এমন প্রতিষ্ঠান কোথাও নেই যেখানে রবীন্দ্র-কাব্যে বিধিমত ওয়াকিবহাল দু'চারজন ব্যক্তি তাঁর সম্পর্কে বিবিধ জ্ঞানদানে নিযুক্ত আছেন বা রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে একটি পূর্ণাঙ্গ লাইব্রেরী সকল তথ্যের পসরা নিয়ে সাধারণের জন্য সুগম হয়ে আছে। শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রসদন একটি বিশেষ স্থানের মধ্যে সীমিত। সেখানকার বাসিন্দা ছাড়া ঐ প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে গবেষণা বা পঠনপাঠনের সুযোগ কলকাতাবাসীদেরই মেলা ভার। এমন স্থলে বিদেশীদের যদি 'আমাদের' কাছে রবীন্দ্র-কাব্যে পাঠ নিতে হয় তাহলে 'আমাদের' কাউকে বেশ মোটা মাইনের প্রাইভেট টিউটর রাখা ছাড়া আর কি উপায়ে তাঁরা এ কর্ম সাধন করবেন তা ভেবে পাই না।

শান্তিনিকেতনেও যে-সমস্ত বিদেশী ছাত্রছাত্রী কোনও বিশেষ বিষয়ে পড়তে আসেন তাঁরাও রবীন্দ্রনাথের আকর্ষণেই আসেন কিন্তু তাঁরা বাংলাও শেখেন না বা রবীন্দ্রকাব্যের রসাস্বাদনও করবার সুযোগ পান না—সেখানকার আবহাওয়াতে রবীন্দ্র-চিন্তার যে প্রবাহ ছড়িয়ে আছে তার দ্বারা যেটুকু পুষ্টি হয় তা ছাড়া আর বিশেষ করে রবীন্দ্রজ্ঞ তাঁরা হন না। নানা লোকের মুখে টুকরো খুচরো খবর সংগ্রহ করে নেন এবং বহু ক্ষেত্রে তার ফলে ভুল ধারণাই নিয়ে যান। এরকম ভুল ধারণার ভুরি ভুরি হাস্যকর দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করা যেতে পারে সেগুলো শুনতে হাস্যকর হলেও ভেবে দেখলে দুঃখজনক। শোনা যাচ্ছে বহু রবীন্দ্র চেয়ার হবে। কিন্তু সেখানে থেকে উত্থিত রবীন্দ্র কাব্য ব্যাখ্যা না শোনা পর্যন্ত তার উপযোগিতা সম্বন্ধে কিছু বলা অনুচিত, তবে আশা করা যায় ঐ চেয়ারে উপবেশনের পূর্বে অধ্যাপকেরা সমগ্র রবীন্দ্র-কাব্য ও চিন্তাপ্রবাহ অনুশীলন করে নেবেন।

যে কথা নিয়ে শুরু করেছিলাম সে কথাতেই ফিরে আসা যাক। আজকাল নানা পত্র-পত্রিকায় নানা প্রবন্ধে অনেকেই সন্দেহ প্রকাশ করছেন যে, দেশ-বিদেশে রবীন্দ্রনাথের যে সমাদর হচ্ছে তার মধ্যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যই প্রধান কি না। রাশিয়াতে এই সমাদরের ব্যাপক সংবাদ পাওয়ায় যাঁরা কমিউনিষ্টবিরোধী, বলা-

* সম্প্রতি কলকাতার টেগোর রিসার্চ ইনষ্টিটুট এ অভাব পূরণ করেছে।

বাহুল্য তাঁরাই নানাছলে নানাভাবে কখনো মৌখিক বক্তৃতায় কখনো লিখিত প্রবন্ধে এ সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। এঁদের মধ্যে অনেকেরই এই সমাদর সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ কোন জ্ঞান নেই—রবীন্দ্র-কাব্য সাধনায় নিরত ব্যক্তিদের বিশেষ কাউকেই জানেন না, রুশ ভাষাও জানেন না, শেখবার বয়সও গেছে, কাজেই এঁদের সমালোচনাটা অনেকটা রাজনীতি প্রসূত।

রুশ দেশে রবীন্দ্র-সাহিত্য আলোচনা সম্বন্ধে বর্তমান প্রবন্ধের লেখিকাই বোধ হয় সবপ্রথম ১৯৫৫ সালের "বিশ্ব-ভারতী" পত্রিকায় লিখে থাকবে। ১৯৫৫ সালের লৌহ-যবনিকা উত্তোলনের অব্যবহিত পরেই রাশিয়ায় যাবার সুযোগ ঘটে। ১৯৫৪ সালে শ্রীমতী সুচেতা কৃপালনী রাশিয়া ঘুরে এসে মেয়েদের একটি ঘরোয়া সভায় সে দেশে রবীন্দ্রনাথের জনপ্রিয়তা সম্বন্ধে একটি মনোজ্ঞ বক্তৃতা করেন এবং সে প্রসঙ্গে বার-বার বিস্ময়ের সঙ্গে উল্লেখ করেন যে, রুশীয়রা মহাত্মা গান্ধী সম্বন্ধে কোনো কৌতূহল বা উৎসাহ প্রকাশ করে না। অর্থাৎ মহাত্মা গান্ধী রাশিয়ায় জনপ্রিয় নন। সে সময় থেকেই মনে করেছি যে, রাষ্ট্রনৈতিক উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষের মনোরঞ্জনই যদি উদ্দেশ্য হয় তবে ভারতবর্ষের আধুনিক যুগের দু'জন শ্রেষ্ঠ পুরুষের মধ্যে রবীন্দ্রনাথকে বেছে নেবার সার্থকতা কোথায়? বিশেষতঃ স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে দিল্লীতে যে 'এশিয় সম্মেলনে' আন্তর্জাতিকতা ও বিশ্ব-মৈত্রীর বাণী মহাসমারোহে ঘোষিত হয় তখন তার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের নাম একবারও উল্লেখিত হয় নি এবং এই বিস্ময়কর বিস্মৃতিতে সারা ভারতবর্ষই ছিল নীরব। একমাত্র ক্ষিতিমোহন সেন পরিতাপের সঙ্গে এ যুগে বিশ্বমৈত্রীর বাণীর প্রথম উদ্‌গাতা রবীন্দ্রনাথের নামের উল্লেখ না হওয়ার কথা লিখেছিলেন। তাঁর সেই লিখিত প্রতিবাদের মারফৎ তখনই আমরা জেনেছিলাম যে, এশীয় সম্মেলনে রবীন্দ্রনাথের নাম উল্লেখ না হওয়া ও দিল্লীতে কোনো পাঠযোগ্য বই না পাওয়া যাওয়া, এই দু'টি ব্যাপারেই রুশ অভ্যাগতরা হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিল। সেই সময়ে বর্তমান প্রবন্ধের লেখিকাও কাগজে একটি প্রতিবাদ ক'রে নানা বিদ্রূপভাজন হয়েছিল।

আজ সেই পুরানো কথার উল্লেখ করবার উদ্দেশ্য এই যে, রাজনৈতিক মতলবের জন্য রবীন্দ্র-প্রীতি দেখাবার প্রয়োজন কী? তার জন্য আরো উপযুক্ততর পন্থা আছে। রবীন্দ্রনাথ তো সমগ্র ভারতবর্ষের নয়! এই সেদিনও শুনেছি অসমীয়া ভাষায় রবীন্দ্রনাথের তুল্য কবি আছেন বা ছিলেন! রবীন্দ্র-কাব্য পড়বার জন্য অন্য প্রদেশবাসী ভারতীয়রা বাংলা শিখতে উৎসাহিত হয়েছেন ক'জন? অপর-পক্ষে মহাত্মা গান্ধী সমগ্র ভারতের রাজনৈতিক নেতা নিশ্চয়ই। এবং বর্তমানের

সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় রাষ্ট্রনৈতিক দলের শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার। সে ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের মনোরঞ্জন বা কাজ হাসিলের জন্য তাঁকে বাদ না দেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ হোতো। (বর্তমানে অর্থাৎ ১৯৬২তে অবশ্য পরিবর্তন হয়েছে এ মতের, গান্ধীজী এখন স্বীকৃতি পাচ্ছেন রুশ দেশে)।

যাঁরা কেবলই বলেন যে, রাজনৈতিক মতলবে আজ বিশ্বজন রবীন্দ্রনাথের সমাদর করছে তাঁদের মনের কোণে হয়ত এ বিশ্বাসও লুকিয়ে আছে যে, ঐ রকম একটা মোটা রকমের স্বার্থগত হেতু ছাড়া রবীন্দ্রনাথের বিশ্বব্যাপী সমাদরের আর কোনো যোগ্যতর কারণ নেই। আরও একটা কথা এঁরা দল বেঁধে ক্রমাগতই বলে চলেছেন, রবীন্দ্র-কাব্যের উপযুক্ত অনুবাদ হয়নি, অতএব তাঁর পরিচয় জগৎ পেল কি করে বা কোনও দিনও পাবে কি করে! এই কথার উত্তরে বর্তমানে সোস্যালিষ্ট জগতে রবীন্দ্রনাথের সমাদরের যে প্রকাশ দেখেছি তার যতটা কারণ নির্ণয় আমার যুক্তিগত মনে হয়েছে তারই একটি ধারাবাহিক বর্ণনা করব। এ প্রসঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন যে, আজও ইওরোপে রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত প্রভাব, তাঁর ভাবমূর্তি, সম্পূর্ণ বিলুপ্ত নয়। এবং বিস্ময়ের কথা এই যে, ১৯২২ সালে জার্মানীতে যখন রবীন্দ্রনাথ সমাদৃত হয়েছেন তখন ক্ষুব্ধ ইংল্যাণ্ড বারে বারেই বলেছে—এ সব পোলেটিক্যাল চাল কিংবা জার্মানী ভারতবর্ষের বাজার দখল করতে চায় বলেই রবীন্দ্রনাথের এত সমাদর সে দেশে। কাজেই আজ যে কথা স্বদেশে শোনা যাচ্ছে তেমনি অনুযোগ চল্লিশ বছর পূর্বে বিদেশেও শোনা গিয়েছিল। এ হয়ত রবীন্দ্রনাথেরই ভাগ্যলিপি।

সাহিত্য যে বিশ্বের জিনিস, এক দেশের মন থেকে উদগত হলেও দূর-দূরান্তরে বিভিন্ন স্থান-কাল ও পাত্রের উদ্দেশে সে বিশ্ববার্তা বহন করে চলেছে এ কথা আমরা জানি কিন্তু বিশ্বাস করি না; কারণ স্থান-কালের সীমা উত্তীর্ণ তেমন সত্যবস্তুর নাগাল পাবার মত মনের সীমানা আমাদের সর্বদা খোলা থাকে না। অনুবাদের যোগ্যতা নিয়ে বহু তর্ক-বিতর্ক হচ্ছে। কবিতা ভিন্ন ভাষায় অনূদিত হতে পারে কি না তাও বিচার্য। কিন্তু যদি কেহ মনে করেন গীতাঞ্জলির কয়েক পৃষ্ঠার মধ্যেই ইয়োরোপে রবীন্দ্রনাথের মূর্তি ঘেরা আছে তাহলে তা অবশ্য ভুল হবে। এই সেদিন পর্যন্ত ইয়োরোপে রবীন্দ্রনাথের কম বইই পাওয়া যেত, কিন্তু তাঁর উচ্চারিত কতগুলি অমোঘ সত্য, যে সত্যের প্রতীকরূপে তাঁর আপন জীবন বিশ্বের সামনে উদ্ভাসিত হয়েছিল তার পরিচয় বিশ্বজনের সামনে বিধৃত আছে, যেমন আছে আমাদের সামনে বুদ্ধের মূর্তি। ক'জন ত্রিপিটক পড়েছে? ক'জনই বা শূন্যবাদের বিশ্লেষণ করেছে? আর ক'জনই বা শূন্যবাদে আস্থা রাখে? কিন্তু সাম্য মৈত্রী

করুণা ও তিতিক্ষার প্রতীকরূপে সেই 'সদয় হৃদয় দর্শিত পশুঘাতম্' বুদ্ধের করুণাময় মূর্তি আমাদের পরিচিত। তেমনি যুদ্ধ-বিক্ষুব্ধ পরস্পর-হননরত ইয়োরোপের মর্মে রবীন্দ্রনাথ আজ একটি বিশেষ আদর্শের প্রতীক। যাঁর সারা জীবনের কর্ম ও কবিতার ভাবে বর্তমান যুগের মহত্তম বাণী ঘোষিত বিশ্বমৈত্রী ভাবনার একটি বিগ্রহরূপে তাঁর দিব্যমূর্তি ইয়োরোপের স্মৃতিতে বিধৃত। সেজন্য তাদের রবীন্দ্রনাথের সবগুলো কবিতা পড়বার দরকার হয়নি। বস্তুত যে-সব পাঠক মাতৃভাষায় তার সব কবিতা পড়বার আশ্চর্য সৌভাগ্য নিয়ে জন্মেছেন তাঁদের অনেকেরই মনের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের সেই ব্যাপকরূপ বুঝবার উপযুক্ত পরিপ্রেক্ষিত নেই সোস্যালিষ্ট দেশে রবীন্দ্রনাথের সমাদরের কারণ অনুসন্ধান করতে গেলে আগে সে দেশের অবস্থাটা আলোচ্য। রবীন্দ্রনাথের মননা যে কত ব্যাপকভাবে, গভীরভাবে, সর্বকালের মানবেব জন্য উচ্চারিত তা বুঝতে হলে আমাদের অন্য দেশের মানুষদের সংস্পর্শে এসে, তাঁদের বিশেষ সমস্যাপীড়িত জীবনেব ভিতর দিয়ে, তাদেব দৃষ্টি দিয়ে দেখলে তবেই পূর্ণরূপে বুঝতে পারি।

একথাও অনেকে অনুমান করে প্রচার করেছেন যে, হয়ত সোস্যালিষ্ট দেশে রবীন্দ্র-রচনা বিকৃত করে অনুবাদ করা হচ্ছে। 'হয়ত' ছাড়া এঁদের অন্য পন্থা নেই। কারণ অনুবাদ এঁরা কেউই পড়েন নি। অনুবাদে ভুল থাকা অসম্ভব নয় —কিন্তু বক্তব্য বিকৃত করার প্রয়োজনীয়তা কোথায়? রবীন্দ্রনাথের রচনায়, বক্তব্যে ও জীবনে এমন কিছুই নেই যা সোস্যালিষ্ট মতবাদের পরিপন্থী। "রাশিয়ার চিঠি" নামে যে আশ্চর্য গ্রন্থের ইংরেজী অনুবাদ পরাধীন ভারতবর্ষে প্রকাশ হতে পারে নি ও স্বাধীনতার পরও ১০।১১ বছর চাপা ছিল তার প্রতিটি ছত্র এমন কি তৎকালীন রুশীয় সরকারের সমালোচনা পর্যন্ত আজকের সোভিয়েট ইউনিয়নেব পক্ষে গ্রহণযোগ্য সত্য। শুধু ঐ বই বা কেন, ছিন্নপত্র ও সাধনার যুগ থেকে রবীন্দ্রনাথের সমগ্র চিন্তাধারাই নূতন বাণীর ঘোষণা বহন করে এসেছে। রাশিয়া থেকে ফিরে তিনি লিখেছিলেন "তাই জমিদারী ব্যবসায়ে আমার লজ্জাবোধ হয়।" শ্রীযুক্ত অমিয় চক্রবর্ত্তীর কাছে শুনেছি, তখন তিনি বিশেষভাবে পুত্রকে সেই মতানুবর্তী করতে ও জমিদারীর সত্ত্ব প্রজার স্বার্থে সম্পূর্ণ ত্যাগ করাতে চেষ্টা করছিলেন। কৃতকার্য হন নি। জমিদারী চলে গেল কিন্তু এতবড় একটা সংকল্প পূরণ হল্‌না। যদি হত তাহলে নাইটহুড্ ত্যাগের তুল্য রবীন্দ্র-জীবনে সেই কীর্তি একটি বিশেষ দিগ্‌দর্শন চিহ্ন হয়ে থাকত।

রবীন্দ্রনাথের- সমগ্র কাব্য, জীবন, ধর্ম, কর্ম, তাঁর প্রতিপাদ্য দর্শন 'মানুষের ধর্ম'র ভিতর এমন কিছুই নেই যা সোস্যালিষ্ট সমাজের অনুমোদনযোগ্য নয়।

বলাই বাহুল্য, যে দেশের সরকার কোনও একটি বিশেষ মতবাদের দ্বারা প্রভাবিত তারা সে মতের বিরোধী কিছু প্রচারে উৎসাহী হবেন না। গান্ধীজীর জীবন-দর্শন বহুলাংশে তাদের বিরোধী, তাদের মতবাদের সঙ্গে অসঙ্গত, রবীন্দ্রনাথের তা নয়। বস্তুতঃ যে মতের কাঠামোর উপর তাদের কর্মকাণ্ড, রবীন্দ্রনাথের জীবনে ও কাব্যে তারই বৃহত্তর ও পূর্ণতর আস্বাদ পেয়েই তারা সে সম্বন্ধে আগ্রহী। অবশ্য সামান্য আস্বাদই তারা পেয়েছে—তাদের পথের প্রতি রবীন্দ্রনাথের কতখানি আশা তার পুরো সংবাদ তারা আজ পর্যন্ত জানে না। ধরা যাক, ৭।৩।১৯৩৫ তারিখে শ্রীযুক্ত অমিয় চক্রবর্তীকে লেখা যে পত্রখানি কবিতা পত্রিকার ১৩৪৯-এর চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে সে চিঠিখানি যদি আজ কোনো অল্পবয়সী রবীন্দ্রনাথ লিখতেন তবে তিনি যে কমিউনিষ্ট বলে ভর্ৎসিত হতেন এতে কোন সন্দেহই থাকে না, তাঁকে দেশদ্রোহী বলে একঘরে করা হত এবং কোন কোন প্রসিদ্ধ দৈনিক তাঁর লেখাই ছাপত না। নানা পরীক্ষা ও আত্ম-বিরোধের বন্ধুর পথে সোস্যালিষ্ট মতবাদ প্রয়োগের যে কর্মযজ্ঞ তাতে ভুল-ত্রুটি ও দুর্ভোগ অনেক আছে। সেই যজ্ঞের ধূম ও অগ্নিদাহের প্রাত্যহিক নৈকট্যে তার তত্ত্বমহিমা বহু সময়ে বহুলোকের কাছে আবৃত হয়েছে কিন্তু রবীন্দ্রনাথের গল্প-কবিতা দর্শন ও সাহিত্যের সুধা-নির্ঝরে তারই এক শুদ্ধ সত্যরূপ আজ সত্যসন্ধানী বিশ্ব-জনের সামনে প্রকাশ পেয়েছে। একথা যে কত সত্য তা বিদেশে রবীন্দ্র-সম্বর্ধনার আকৃতি-প্রকৃতি দেখে নিঃসন্দেহ হয়েছি।

হাঙ্গেরীর রাজধানী বুডাপেষ্ট শহরে দানিউব নদীর তীরে হোটেল গালার্ড। দুধারে বাঁধান তীরের শাসনের মধ্যে খালের মত স্থির স্রোতা নদী দানিউব। আমি সামান্য মধ্যবিত্ত ঘরের গঙ্গাতীরবাসী বাঙ্গালীর মেয়ে। আমার কাছে সে যেন পাঠ্য বইয়ের ধারা বেয়ে সুদূর দেশকালের ইতিহাস থেকে প্রবাহিত হয়ে আসছে। অপেক্ষা করে আছি নিয়ে যাবে বালাতন হ্রদের তীরে রবি দ্রাক্ষোৎসবে। দোভাষীর সঙ্গে দুটি বৃদ্ধ-বৃদ্ধা এলেন, বৃদ্ধার একদা সুন্দর মুখ বহু দুঃখ-কষ্টের বলিরেখাঙ্কিত। কম্পিত কণ্ঠে তিনি বললেন—এই হোটেলের ১২৩নং ঘরে রবীন্দ্রনাথ ১৯২৬ সালে বাস করেছিলেন—দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে হোটেলটি বিচূর্ণীকৃত হয়েছিল। আবার নূতন করে তৈরী হয়েছে। ১৯২৬ সালে এই বৃদ্ধা ছিলেন অষ্টাদশী তরুণী। তিনি ফুল নিয়ে কবির সম্বর্ধনা করতে এসেছিলেন, যেমন এসেছিল আরো অনেকে। তবে এঁর বিশেষ আনন্দ এই যে, প্রচণ্ড ভীড় ঠেলে তিনি কবির কাছে পৌঁছতে ও স্বহস্তে পুষ্পোপহার দিতে পেরেছিলেন। বিস্ময়ে তাকিয়ে ছিলাম ভদ্রমহিলার ভঙ্গুর শীর্ণ বৃদ্ধ দেহের দিকে, এত বৃদ্ধ হবার বয়স তো নয়। তখন মনে পড়ল ভয়াবহ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, গৃহযুদ্ধে কত বিপর্যয় ঘটে গেছে এঁদের জীবনে।

"আপনার আজও মনে আছে, যে ঘরে তিনি ছিলেন তার নম্বর কত?"

"থাকবে না? সে কি সামান্য ঘটনা?"

"বালাতন হ্রদ বা বালাতন ফ্যুরেড্ বুডাপেষ্ট থেকে বেশ কিছু দূর—প্রায় দেড়শ মাইল। সেখানে একটি স্বাস্থ্যনিবাস। অনেকেই জানেন ১৯২৬ সালে য়ুরোপভ্রমণ-ক্লান্ত রবীন্দ্রনাথ সেখানে কিছুদিন বিশ্রাম করেন—সে সময়ে তাঁর নিরাময়ের স্মৃতিচিহ্নরূপে স্বাস্থ্যনিবাসের উদ্যানে একটি বৃক্ষ রোপণ করেছিলেন। যতদূর মনে হয় সেটি লিন্ডন্ গাছ, লেবুজাতীয় উদ্যান-শোভা ইয়োরোপের পথের দুধারে থাকে। সেই ছোট চারা আজ সতেজ বৃক্ষ, শাখাপ্রশাখায় বিস্তারিত হয়ে ঝলমল করছে' ঐ চারাটি যে দিন পোতা হয় সেদিন একটি কবিতা লিখেছিলেন। সে কবিতাটিও একটি ফলকে মুদ্রিত করে গাছের নিচে রাখা ছিল কবিতাটি এই—

When I am no longer on the earth my tree
Let the ever renewed leaves of thy spring
mur mur to the way farers,
The poet did love while he leaved.

তারই নীচে স্থাপিত হয়েছে ব্রঞ্জের একটি মূর্তি। মূর্তিটি কার তৈবী তা জানি না—শুনলাম কোনো ভারতীয় শিল্পীর। রবীন্দ্রনাথের মূর্তিব নিচে খোলা বাগানে স্মৃতি-উৎসব হল। যখন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে দলে দলে পুষ্পোপহার সাজিয়ে স্যালিউট করতে লাগল, অপরিচিত দুর্বোধ্য ভাষায় জয়ধ্বনি করতে লাগল, তখন সেই সুদূর দেশে ভিন্ন ভাষাভাষী লোকের মধ্যে দাঁড়িয়ে মন আনন্দে অশ্রুধৌত হতে লাগল। একজন অধ্যাপক হাঙ্গেরীয় ভাষায় কবির জীবনী পড়ছিলেন, দোভাষী অস্ফুট কণ্ঠে তার অনুবাদ শোনাচ্ছিলেন। বক্তার একটি কথা আমার বড় ভাল লাগল—তিনি বলছিলেন, "একদিন এই উদ্যানে রবীন্দ্রনাথ যে ছোট চারাটি পুঁতেছিলেন তা আজ সতেজ, সুন্দর সবল বৃক্ষ হয়েছে তেমনি তিনি এ যুগে নূতন করে তাঁর দেশের মর্মে একটি শান্তির বীজ বপন করেছিলেন, সেই বীজ আজ পরিপূর্ণ শোভায় পল্লবিত হয়ে উঠেছে। তাই আজ এই দ্বন্দ্বক্ষুব্ধ, যুদ্ধক্লান্ত শাণিত হননবৃত্তি পৃথিবীর মাঝখানে দাঁড়িয়ে ভারতবর্ষ শান্তির বাণী, পঞ্চশীলের ধর্ম, সহঅবস্থানের কথা এমন প্রবল শক্তিতে বিশ্বাসযোগ্যভাবে বলতে পারছে।"

জানিনা বিশ্বজনের এ প্রশংসা কতখানি আমাদের প্রাপ্য। তবে সেই দূরদেশে অজানা পরিবেশে, অজ্ঞাত ভাষায় উচ্চারিত গুরুর প্রতি এ শ্রদ্ধাঞ্জলি ও স্বদেশের প্রতি অর্পিত এ বিশ্বাস আমার সমস্ত সত্তাকে আবেগে মথিত করে তুলেছিল।

সেদিন উৎসবে একটি যুবক 'গোরা' থেকে প্রায় পঁয়ত্রিশ মিনিট আবৃত্তি

করে আমায় চমৎকৃত করে দিলেন—আমরা সচরাচর কবিতা আবৃত্তি করে থাকি, তাও আজকাল বই দেখে পড়াই রেওয়াজ হয়েছে। কিন্তু 'গোরা'র মত কঠিন বই যে এমন অবলীলাক্রমে আবৃত্তি করা যেতে পারে তা আগে কখনো মনে করিনি। সোস্যালিষ্ট জগতে 'গোরা' অতি পরিচিত বই—সর্বত্র এর উল্লেখ এবং আবৃত্তি শুনেছি। বিস্ময়ের সঙ্গে ভেবেছি বিদেশী এর মধ্যে কি পায়? এ তো একেবারে ভারতবর্ষের ঘরের বই—বলতে গেলে যুক্তিবাদের আলোক-সম্পাতে বাঙ্গালী জীবনের উন্মোচনের বই। বিবেকানন্দের মতবাদ ও ব্রাহ্মসমাজের ভাবনার মধ্যে কবির বিশ্লেষণপূর্ণ সৃজনশীল মনের সঞ্চরণ। শুনেছি, সত্য কিনা জানি না যে, নিবেদিতার হিন্দুধর্মের বহু সংস্কারের যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা, তাঁর 'কালী, দি মাদার' বক্তৃতা, নিবেদিতার জীবন, কবির মনে গোরার চরিত্রের আভাস আনে। এও শুনেছি 'গোরা'র পরিশিষ্ট অংশটুকু সাহিত্যের দিক থেকে যার প্রয়োজন ছিল না মনে হয়, সেটুকু নিবেদিতার পরামর্শেই লেখা। হাঙ্গেরিয়ান যুবকের আবৃত্তি চলছিল। নামগুলি লক্ষ্য করে বুঝতে পারছিলাম এটি বইর শেষ অংশ যেখানে পিতার রোগশয্যার পাশে চরম অক্ষর দৃশ্য চলেছে সেখানটাই আবৃত্তি করছেন। একদা যে ইংরেজদের ঘৃণা করেছে সেই সাহেব ডাক্তারের দিকে চেয়ে গোরার মনে হল তাহলে এই লোকটিই তার সবচেয়ে আপনার? সকল বন্ধনচ্যুত গোরার আর্ত প্রশ্ন 'মা তুমি আমার মা নও?' অপরিচিত ভাষার মধ্যে যেন প্রাণ পেয়ে উঠল, এ জিজ্ঞাসা যুদ্ধ আর্ত মানুষের নারীসমাজের কাছে এক চিরপ্রশ্নের মত—মা যদি মা হয় তবে কি এই হননবৃত্তি এমন অবাধে চলতে পারে? যুদ্ধের পূর্বে ও পরে যে-সব অবাধ হত্যালীলা চলেছে তার মধ্যে মেয়েদের করণীয় কি কিছু ছিল না?

জার্মানীতে কনসেনট্রেসন ক্যাম্পের প্রদর্শনীতে সাজান আছে ইহুদী মেয়ের চুলের তৈরী পা-পোষ, আর মানুষের চামড়ার ভ্যানিটি ব্যাগ। শুনেছি ইহুদীর চামড়ার তৈরী ভ্যানিটি ব্যাগ সে সময়ে মেয়েদের ফ্যাসান হয়েছিল। ইয়োরোপের বুকের উপর যুদ্ধের তাণ্ডবলীলা যে কী তা আমরা দূরে বসে কিছুতেই অনুমান করতে পারি না। এমন কোনো সংসার নেই যেখান থেকে কেউ না কেউ অত্যাচারিত বা যুদ্ধে নিহত হয়েছে—উপযুক্ত বয়সের জোড় মেলান নেই স্বামী-স্ত্রীর। মধ্যবয়সী মেয়েদের অনেকেরই অল্পবয়সী স্বামী—কারণ যুদ্ধে স্বামী মারা গেছে, তারপর নিঃসঙ্গ জীবনের দায়ে আবার কাউকে বিয়ে করেছে তারা অনেক সময়েই হয়ত বয়সে ছোট—। বুলগেরিয়াতে একটি লেখিকা আমার সঙ্গে এক সঙ্গে নানা-স্থানে বেড়ালেন, সর্বদা সাহিত্য আলোচনা, ভারতবর্ষের সভ্যতা ও

শাস্ত্র সম্বন্ধে তাঁর অফুরান প্রশ্ন চলেছে। কৃষ্ণ-সমুদ্রের তীরে বসে করেছি কবিতা আবৃত্তি বাংলায়, কখনো পাহাড়ের উপত্যকায় নদীর ধারে বসে বলেছি ভারতবর্ষের জীবনের নানা কথা। কখনো তাকে বিমর্ষ মনে হয়নি। পাঁচ-ছয়দিন নিরন্তর একত্র ভ্রমণের পর হঠাৎ তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, যুদ্ধে আপনার পরিবারের কোনো ক্ষতি হয়নি? ভদ্রমহিলা চমকে উঠলেন। তাঁর প্রসন্ন মুখের উপর শোকের ছায়া পড়ল—শুনলাম বুলগেরিয়াতে বোমাবর্ষণ কমই হয়েছিল কারণ দু-চারবার বোমার পরই এদের তৎকালীন ফ্যাসিষ্টপন্থী´ সরকার হিটলারের সৈন্যের কাছে আত্মসমর্পণ করে। তারই মধ্যে একদিন তার পরিবারের পাঁচটি লোক এক সঙ্গে মারা গেছে। ভদ্রমহিলা থেমে থেমে বলছিলেন, সাইরেন বাজবার সঙ্গে সঙ্গেই বোমা পড়ল, সময় পেলাম না সেল্টারে ঢুকবার। যেন একটা দমকা হাওয়ায় আমি ও আমার স্বামী একটা ছোট্ট কোণের মধ্যে সাজোরে ঢুকে গেলাম—যখন জ্ঞান হল দেখি ভাঙ্গা-বাড়ির ধ্বংসস্তূপের মধ্যে অর্ধপ্রোথিত হয়ে গেছি। আমার স্বামীব মুখেব নানাস্থান থেকে রক্তপাত হচ্ছিল। আমি চিৎকার করছিলাম আমাকে মুক্ত করবার জন্য কিন্তু তিনি কোনো কথা না বলে আচ্ছন্নের মত চলে গেলেন—যখন ঘণ্টা-খানেক বাদে ফিরে এলেন তখন বুঝলাম ভীষণ কিছু ঘটেছে। আমার বাবা মা ভাই তার স্ত্রী ও পাঁচ বছরের ভাইপো সব একসঙ্গে প্রোথিত—কেউ মৃত কেউ মুমূর্ষু—ভাইপো ছিল আমাদেব পরিবারে একমাত্র শিশু, বড় আদরের—সে একেবারে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। তবু ভাবলাম তাকে ভাল করে সৎকার করব—'we picked him up from bone to bone'

সোফিয়াতে একটি বুদ্ধিমতী মেয়ে আমার দোভাষীর কাজ করত। সে আমাকে বলেছিল যুদ্ধে এ সব পারিবারিক ক্ষতি বা বোমাবর্ষণে হত্যা ইত্যাদি মানবাত্মার তত অবমাননা নয় যত কনসেন্ট্রেসন ক্যাম্পের অত্যাচার, তার বর্ণিত সব কথা আমার বিশ্বাস হত না—যদি না সে সময়ে আইখম্যানের বিচারের খবর শোনা থাকত। বিস্ময়ের কথা এই যে, ইয়োরোপে অর্থাৎ সোসালিষ্ট দেশেও ঐ বিচারের বর্ণনা এত প্রকাশিত হয়নি। সে মেয়েটি আমায় বলেছিল সোফিয়াতেই একজন ইহুদি ভদ্রলোক আছেন। হিটলারের আক্রমণের সময়ে তাঁর বয়স ছিল উনিশ। একদিন জার্মান সৈন্যদল সদ্য চলে যাবার পর একটা নাপিতের দোকানে সে ক্ষৌরকর্ম করছিল। হঠাৎ তাকে একজন বল্লে তুমি ইহুদি হয়ে এই সাবান ব্যবহার করছ? তখন সেতাকিয়ে দেখে তাতে লেখা আছে জে, এস, অর্থাৎ জুডা সোপ, অর্থাৎ ইহুদীর চর্বীর তৈরী সাবান। সে ছেলেটির মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটে গেল। ইয়োরোপে ভ্রমণকালে একটু বয়স্ক লোকের কাছে কথা তুললে এমন কত

যে ভয়াবহ অভিজ্ঞতার কথা শোনা যায় তার শেষ নেই, অবশ্য কথা না তুললে কেউই কিছু বলে না। যুদ্ধের ভয়াবহতা বর্তমান বংশের মন থেকে হয়ত কিছু মুছে যাচ্ছে, তবু যারা সেই অগ্নিপরীক্ষা পার হয়ে এসেছে তারা যেখানে শান্তির আশ্বাস পায় সেখানে আশা ও বিশ্বাসে ছুটে না এসে পারে না। ইয়োরোপের এই দেশগুলিতে তাই রবীন্দ্রনাথের বাণী এক বিশেষ তাৎপর্যে এক বিশেষ অর্থে প্রকাশিত। জীবনে যে-সব সুখ-দুঃখের ঘাত-প্রতিঘাতের অভিজ্ঞতার মধ্যে বাঙ্গালীর কাছে রবীন্দ্রকাব্য ও মননা সত্য হয়েছে ইয়োরোপের মানুষের কাছে তার চেয়ে ভিন্নতর অভিজ্ঞতার মধ্যে তা সত্যের অন্যমুখ প্রকাশ করেছে। এই 'গোরা' বই আমাদের কাছে জাতিভেদের অমূলকতা ও ভ্রম, গোরার জীবনকাহিনীতে অপ্রত্যাশিত, ঘটনা সমাবেশের মধ্যে প্রকাশিত। ইয়োরোপে এই বই বিভিন্ন নেশনের, সাদা-কালোর, ইহুদী-ক্রিশ্চানের ভেদের অলীকতা প্রকাশ করেছে। আনন্দময়ী বলছেন, ছোট শিশুকে কোলে নিলেই বোঝা যায় মানুষের জাত নেই— এই অনুভব সত্য হলে কি জুডা সাবান তৈরী হতে পারে? আমাকে একটি শিল্পিনী বলেছিলেন—'গোরা এক আশ্চর্য বই, এই বইতে আমরা গোটা ভারতবর্ষকে পাচ্ছি—পাচ্ছি সমস্ত বিশ্বের সমস্যা ও তার সমাধানের ইঙ্গিত। পাচ্ছি অতীত ভারতের সমস্ত চিন্তার ঐশ্বর্য, দেখছি অভ্যাসে আবদ্ধ অচলায়তনে ঘেরা সংস্কারবিমূঢ় ভারতীয় সমাজ, দেখছি নূতন যুগের উদয়, তার জিজ্ঞাসা ও যুক্তিবাদের দ্বারা অন্ধকারের মুক্তি। গল্পের প্লটের মধ্য দিয়েই কত সহজে চিরসত্যের প্রকাশ হচ্ছে।

যে মানুষ অন্তরে এক, তার জাতি সমাজ অভ্যাসের পার্থক্য বহিরঙ্গ ঘটনা মাত্র—একথা কত সত্য যে, শিশুকে কোলে নিলেই বোঝা যায় মানুষের জাত নেই, ভালবাসলেই বোঝা যায় মানুষের জাত নেই, অথচ এ সত্য কত অজ্ঞাত হয়ে ঢাকা পড়ে থাকে মানুষের জীবনেই—নৈলে মানুষে মানুষে হানাহানি হয় কি করে? বোমাই বা ফেলা হয় কি করে? এই বই ভারতের সমস্যার গ্রন্থিছেদন করে জগতের সমস্যার মূলে এসে এক পরম সত্যকে প্রকাশ করে তুলেছে—এ তাই এক আশ্চর্য কাব্য।' যখন বিদেশীর মুখ থেকে এসব কথা শোনা যায় তখনই যথার্থ উপলব্ধি হয় যে, সাহিত্য বিশ্বের জিনিস—এক স্থানে উদ্গত হলেও তা উদ্ভিন্ন হয়ে উঠে সর্বতোমুখে। একথা নিতান্তই সত্য যে, কেবল বাঙ্গালীর দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে রবীন্দ্রনাথকে সম্পূর্ণ জানা সম্ভব নয়। এই বিশাল পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে মানুষ বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে তাঁর বাণীর বহুধা শক্তি ও মহিমা যে নূতন চোখে নূতন অর্থে দেখতে পায় তার সবটাই আমাদের দৃষ্টির সীমার মধ্যে ধরা পড়ে না।

রবীন্দ্রনাথ বাংলায় লিখেছিলেন বলেই তাঁর উচ্চারিত চিরসত্যগুলি একমাত্র বঙ্গীয় নয়।

বুলগেরিয়াতে রবীন্দ্রশতাব্দী উৎসবের প্রথম সভায় সোফিয়ার প্রসিদ্ধ থিয়েটার-গৃহে ৯ই মে উপস্থিত হলাম। ১৯২৬ সালে ঐ গৃহে রবীন্দ্রনাথের সম্বর্ধনা হয়েছিল। সে স্মৃতি উল্লেখ করবার মত অনেকেই উপস্থিত ছিলেন—বিখ্যাত লেখক স্তোয়েনভ তাঁর মধ্যে একজন। তিনি রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে ৭।৮ খানি বই লিখেছেন—আড়াই ঘণ্টার উৎসবে যা আলোচনা হল তার কিছু কিছু পরের দিন খবরের কাগজের রিপোর্ট থেকে অনুবাদ করিয়ে বুঝতে পারলাম। বাংলা কবিতার ছন্দ-মাধুর্যের দেখলাম খুবই সমাদর। আমাকে অনেকেই বলেছেন বাংলা কবিতার আবৃত্তিতে তাঁরা এমন কিছু পান যে, অর্থবোধ না হলেও তা ভাব উদ্বেলিত করে—সঙ্গীতের মত তার এক অব্যবহিত বোধ জন্মায়। জানি না এ কথা সত্য কি না, সত্য হলে তো ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের গণ্যমান্য ব্যক্তিরাও তা শুনতে পাননি, নৈলে এত বাংলা-বিদ্বেষ হত না।

বুলগেরিয়ার ছোট ছোট শহরে—নানা জায়গায় রবীন্দ্রোৎসব হয়েছে। কৃষ্ণ-সমুদ্রের তীরে স্বাস্থ্যনিবাস অতি সুন্দরী ভার্না—সেখানে উৎসব হল—উৎসবের প্রধান অঙ্গ রবীন্দ্রজীবনী পাঠ—তারপর নানা কাব্য থেকে আবৃত্তি—বিদেশী ভাষার মধ্যে কান পেতে আছি, হঠাৎ শুনলাম 'শেখরলাল', বুঝলাম 'দুরাশা' গল্পটি আবৃত্তি করছে—ঐ গল্পের অর্থ সেদিন বিদেশীর কণ্ঠে গভীরতর তাৎপর্য নিয়ে প্রকাশ পেল। যে জাত্যাভিমানে ব্রাহ্মণ একদা নারীর প্রেম প্রত্যাখ্যান করেছিল, দেখা গেল সে শুধু অভ্যাস, আর কিছু নয়। রবীন্দ্র-কাব্যের মধ্যে জাতিধর্মের শৃঙ্খলছিন্ন, সংস্কার-বিমুক্ত, শুদ্ধ মানবতার বিশ্বাভিমুখী বাণী সোস্যালিষ্ট জগৎ আজ জাতিগর্বিত শ্বেত-কায়দের শোনাতে চায়। 'কাষ্ট' হিসাবে যে জাতির কথা একদা ব্রাহ্মণ গোরা মেনেছিল 'রেস্' হিসাবে তো সারা ইয়োরোপে তারই পুনরাবৃত্তি চলেছে—শেখরলাল যে জাত্যাভিমানে যবনীর হাতের জল প্রত্যাখ্যান করল সেই অভিমানই তো আজও Little Rock-এ নিগ্রো শিশুদের স্কুল-কলেজ থেকে খেদিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে—ইয়োরোপীয় জীবনে নানা ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথের বহু গল্প কবিতাই যে অর্থ প্রকাশ করছে, নানা মানুষের চিন্তায় ও অনুভূতিতে সত্য হয়ে উঠছে—তারা বাংলা জানে না বলে বা রবীন্দ্রনাথের অনুবাদের ভাষা আধুনিক ইংরেজিসম্মত নয় বলে তার মূল্য ব্যর্থ হয়নি।

উৎসবান্তে ফিরে এলাম কৃষ্ণসাগরের 'স্বর্ণবালু' তীরে আমাদের অতিথিনিবাসে। তখন মধ্যরাত্রি, সমুদ্রের ছল-ছল শব্দ পুরীর কথা মনে পড়িয়ে দিচ্ছিল, আর সবই

পৃথক, এই আশ্চর্য সুন্দর স্বাস্থ্যনিকেতন ৬।৭ বছর হয় গড়ে উঠেছে—বিভিন্ন ইউনিয়নের কর্মীদের জন্য—যেমন লেখক সঙ্ঘ, পাবলিসার্স, ইঙ্গিনীয়ার, রোডবিল্ডার প্রভৃতি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নিজ ইউনিয়ন এই বাড়ীগুলি তৈরী করছে—সম্পূর্ণ নূতন স্থাপত্য সুখ-সুবিধা ও সৌন্দর্য্যের সমাবেশ—শ্রেষ্ঠ হোটেলের মত গৃহসজ্জা, উদ্যানে পুষ্পশোভা, এখানকার সমুদ্রতীরে দেখলাম বাগান খুবই ভাল হয়েছে। এই সমস্ত সুশোভিত গৃহ থেকে বেরিয়ে মজুরশ্রেণীর লোককেও সমুদ্র স্নানে যেতে দেখে বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করেছিলাম যে, বাড়ি এত পরিচ্ছন্ন রাখা কি করে সম্ভব হয়?—যে উত্তর পেয়েছিলাম তা উপযুক্ত উত্তর বলে আমাদের অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলিয়ে বিশ্বাস করা যায় না। ওরা বল্লে প্রথমে অপরিচ্ছন্ন হয়ে যেত কিন্তু এত পরিষ্কার থাকলে আর কেউ অপরিষ্কার করতে পারে না। আমার স্বদেশের বড় বড় ইমারত ও সাধারণের ব্যবহৃত স্থান, সভাগৃহ, সিঁড়ি প্রভৃতিগুলির দিকে দেখলে একথা বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় না। তা সত্যিই তো বাগানের ফুলের শোভা—কেউ ছিঁড়ে নিচ্ছে না—আয়নার মত পালিশ করা স্বাস্থ্যনিবাস, অশোকা হোটেলের তুল্য ঝক ঝক করছে। আর স্বচক্ষেই তো দেখলাম কালেক্টিভ ফার্মের চাষী রমণী সেখান থেকে ছুটে এসে আমার শাড়ীর এক প্রান্ত তুলে চুম্বন করে সপ্রসন্ন দৃষ্টিতে বল্লে 'ইন্দিস?' শুনলাম নানা কর্মে নিযুক্ত প্রত্যেক মানুষকেই বছরে এক মাস কি তিন সপ্তাহ ছুটি নিতে হয়, তখন তাদের নিজ নিজ নির্দিষ্ট স্বাস্থ্যনিবাসে স্থান পায়। সেখানে সব শ্রেণীর কর্মী একই সুবিধায় একই গৃহে বাস করে। তার মধ্যে উচ্চ নীচ নেই এবং টাকাব অঙ্ক হিসাবে তিন সপ্তাহে একজনেব খরচ পড়ে ১৯ টাকা। নিজের বাড়িতে থাকলে তার অন্তত চারগুন ব্যয় হয়। এই বুলগাবরা সেদিন পর্যন্ত তুর্কীদের অধীন ছিল। সর্বসমেত পাঁচ শ' বছরের অধীনতা ভোগ করে অল্পদিনই স্বাধীন হয়েছে। তারপর তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের দুগ্র্হ সার হয়েও এমন করে দেশকে গড়ে তুলতে চাইছে, ধনী-দরিদ্রে প্রভেদ দূর করতে চাইছে। প্রমাণ করতে চায় যে, সব মানুষই এক সম্পদের উত্তরাধিকারী—কেনই বা এরা তার জন্য উপযুক্ত নির্দেশের সন্ধানে দেশ-দেশান্তরে খুঁজে বেড়াবে না? এইসব ভাবতে ভাবতে এগিয়ে চলেছি, গভীর রাত্রির ঠাণ্ডা সমুদ্রের বাতাস লাগছে চোখেমুখে, উপরে অজানা দেশের আকাশে চিরপরিচিত জ্যোতিষ্কের সভা—আমার সঙ্গী ও সঙ্গিনীরা নিজেদের মধ্যে কথা বলতে বলতে একটু পিছিয়ে পড়েছেন, হঠাৎ বাগানের লতা-গুল্মের পাশ থেকে মিলিটারী পোশাক পরা একটি মাতাল 'ইন্দিয়া ইন্দিয়া ইন্দিয়া' বলে এক সঙ্গীত জুড়ে আমার সামনে এসে হাত নাড়তে শুরু করা মাত্র দ্রুতগতিতে সকলে এগিয়ে এসে তাকে সরিয়ে দিলে......তারপর বহুক্ষণ পর্যন্ত বহুবার মার্জনা চেয়ে তিনজনই

বলতে লাগলেন ও বুলগার নয়, চেক। যেন কোনো বুলগারের পক্ষে এমন অভদ্রতা করা অসম্ভব। আমার একটু মজা লাগল বৈকি। জাত্যাভিমান কত মর্মগূঢ়—কতরকম ছদ্মবেশ অবচেতনায় মূল গেঁথে আছে তাকে কি সহজে স্খালন করা যায়? ভেদবুদ্ধি, অহং ও আত্মাভিমানকে বিশ্ববোধে পরিণত করা কি সোজা কাজ! তবু তো তার চেষ্টা করা চাই—যাঁরা সে পথের নির্দেশ করেন তাঁদের বাণীর জন্য কান পেতে থাকা চাই।

রবীন্দ্রনাথ সোফিয়াতে এসেছিলেন ১৯২৬ সালে—সে সময় তাঁর রাজকীয় ও প্রীতিপূর্ণ সম্বর্ধনা হয়েছিল সারা ইয়োরোপ মহাদেশেই, এই সম্বর্ধনার প্রকৃতি ও সমারোহ একই রকম হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের বাণীর সত্যতাকে যাচাই করে নেবার সময় তখনও হয়নি। তাঁর সম্বন্ধে জ্ঞান অভিজ্ঞতার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না। যে নবযুগের বাণী তাঁর কণ্ঠে সেই নূতন যুগের পূর্ণ উপলব্ধি ক'জনেরই বা ছিল? এ সম্বন্ধে বুলগেরিয়ায় প্রকাশিত ১৯২৬ সালের খবরের সঙ্গে বর্তমান শতাব্দী উৎসবের প্রসঙ্গে ঐ দেশে আলোচিত বক্তব্যের তুলনা করা যেতে পারে। ১৯২৬ সালের এপ্রিল মাসে ডঃ এলেন স্লাটারক নামে ঐ দেশীয় একজন নামী সাহিত্য-সমালোচক রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে একটি বই লেখেন, তার ভূমিকায় আছে:—"ঠাকুর সোফিয়াতে আসছেন ভারতবর্ষের কোটি কোটি লোকের 'ধর্মগুরু' (Spiritual leader), সেই জ্ঞানী পুরুষ যিনি তাঁর কবিতার ভিতর দিয়ে হিন্দুর ধ্যানমগ্ন আত্মা আমাদের কাছে প্রকাশ করেছেন……তিনি যে আজ সোফিয়ায় আসছেন, একি বিস্ময়ের কথা নয়? হাউস অফ কালচারের প্রতিনিধি হিসাবে আমরা সীমানার ষ্টেশনে প্রত্যুদগমন করতে গিয়েছিলাম—সেখানে পৌঁছেই কবি ও মনীষীর সামনে উপস্থিত হলাম। তাঁর কালো চোখের অনুসন্ধানী দৃষ্টি মর্মভেদী, তিনি মৃদু হাস্য করলেন, সে হাসি তাঁর মানবপ্রেমের দ্যোতক।……তাঁর সৎস্বভাব ও নম্রতা আমরা যেন অনুভব করলাম। আমাদের হৃদয় তাঁর দিকে উন্মুখ হল……আমাদের অভিনন্দন-পত্র পড়ে তাঁকে সম্বর্ধনা করলাম। "হে প্রিয় শিক্ষক, আমাদের এই দুঃখ-দুর্ভোগের দিনে এই অশান্তি, অসংযম ক্ষুদ্র বিবেক সত্যের অনুসন্ধানে মহা ভ্রমপূর্ণ পথে চলবার সময়, সুখের সন্ধানে প্রবল মত্ততার দিনে, তোমার উপস্থিতিই মানুষের বিক্ষুব্ধ বিক্ষত মনে কোমলতাপূর্ণ কল্যাণের প্রভাব নিয়ে আসে। এই বালকানের পথ দিয়ে তুমি যখন যাবে তোমার স্পর্শে এই বহুজাতিবিশিষ্ট দেশে মানুষের চিত্ত আরো আলোকিত হবে আরো সৎ হবে আরো প্রেমে পূর্ণ হবে। তাতে তাদের মঙ্গল হবে, মঙ্গল হবে, মানবজাতির, আমাদের মধ্যে তোমার অল্পক্ষণের উপস্থিতি এদেশের মানুষের মনে ঊর্ধ্বমুখী ভাব জাগ্রত করবে, দুঃখ দহন সহ্য করার শক্তি দেবে।

স্বাগতম হে গুরু, হে পূর্ব জগতের জ্ঞানী, হে প্রেমপ্রকাশের অগ্রদূত, তোমাকে স্বাগতম—হে বিশ্বআত্মাব প্রতিচ্ছায়া (reflection of the world soul) ঊর্ধ্ব হিমালয়ের ও ভারত উপত্যকার স্বচ্ছ বাতাস আমাদের দেশের উপর প্রবাহিত হও। তোমাকে স্বাগতম। ঠাকুর ধীরে ধীরে মৃদুস্বরে কথা বললেন। পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে পরস্পরের পরিচয় ঘটান, মানুষের মনুষ্যত্ব উদ্বোধিত করা, বর্তমান সভ্যতার চেয়ে মহত্তর সত্যকে মানুষের কাছে এগিয়ে আনা এই তাঁর ভ্রমণের কারণ। তাঁর মুখের কথা ও 'সাধনা' বইতে লিখিত, বক্তব্যের মর্মকথা একই কিন্তু তাঁর ব্যক্তিত্ব যেন তাঁর 'সাধনা' বই-র বক্তব্যকে আরো পরিস্ফুট করে তোলে। কবি পরিশ্রান্ত, কিন্তু সে কথা তাঁর ভাবে প্রকাশ পায় না। তিনি ছবি তুলতে বাধা দেন না, বই ও ছবিতে অনায়াসে অটোগ্রাফ সই করেন। এদেশে তাঁর এই প্রীতিপূর্ণ স্বাগত সম্বর্ধনায় বোঝা যায় যে, আমাদের দেশের মানুষের অন্তরে এখনও আধ্যাত্মিকতার মূল্য আছে। তাঁর সম্মানে ভোজসভার আয়োজন হয়েছিল কিন্তু কর্মকর্তারা ভুলে গিয়েছিলেন মাংসাহারের জন্য প্রাণী হত্যার নিয়ম নেই—(সে জন্য কবি মাংস খাননি তা' অবশ্য নয়) তিনি কিছু মিষ্টান্ন নিলেন, মদ্য স্পর্শ করলেন না……ভোজের সময় ছাত্ররা সম্মিলিত সঙ্গীত গাইছিল তিনি খুব মন দিয়ে শুনছিলেন। আমি 'সাধনা' বইখানি নিয়ে তার উপর কিছু লিখে দিতে বল্লাম, তিনি লিখলেন…কত অজানারে জানাইলে তুমি, কত ঘরে দিলে ঠাঁই, দূরকে করিলে নিকট বন্ধু পরকে করিলে ভাই……।

"ঠাকুর চলে গেছেন কিন্তু তাঁর মূর্তি আমাদের স্মৃতিতে প্রতিষ্ঠিত, আমাদের হৃদয় এখন সাধারণ ভাবের চেয়ে উচ্চতর ভাবনায় পূর্ণ—প্রজ্ঞা ও সৌন্দর্য আমাদের অতিথি হয়ে, মনে করিয়ে দিতে এসেছিল যে, আমরাও মানুষ—"

ইষ্টক বা ইষ্ট নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকায় ২৮শে নভেম্বর ১৯২৬ সংখ্যায় লিখছে—

"রবীন্দ্রনাথ সব বয়সের সব শ্রেণীর মানুষকে মোহিত করেছেন এই তাঁর বিপুল ব্যক্তিত্বের প্রধান প্রমাণ। এই বিজ্ঞ বাঙ্গালী কবি আমাদের এই সহজ সত্য শেখালেন যে, মানুষে মানুষে মৈত্রীই আমাদের পথ—সরলতাই সেই চাবী যা দিয়ে জগতের ঐক্যসাধনের উপায় পাওয়া যায়……

আমি তাঁকে দেখলাম……দেখলাম তাঁর করুণাবিকীর্ণ হাসি, তাঁর অন্তর্ভেদী দৃষ্টি, সে মুখ যেন কোনো পুরোনো মন্দিরেব বিগ্রহের মত খোদিত দেবমূর্তি। তিনি ধর্মবান, আত্মস্থ। তাঁর সুদীর্ঘ পরিচ্ছদ তার সঙ্গে মহিমার সংযোগ করে। পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে সেতুবন্ধনের প্রয়াসে তিনি দরজায় দরজায় প্রেম ঐক্য ও

মানবতার বাণী নিয়ে ফিরছেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম যুদ্ধোত্তর ইয়োরোপ সম্বন্ধে তাঁর কী মনে হয়, (সে সময়ে পুনরায় যুদ্ধের আশঙ্কা ফ্যাসীবাদের হুঙ্কারের সঙ্গে ইয়োরোপে জেগে উঠেছিল) তিনি বল্লেন তাঁর মনে হচ্ছে ইয়োরোপ যেন একটা প্রকাণ্ড উন্মাদালয় যেখানে বিকৃতমস্তিষ্কেরা তাদের সন্তানের কবরের উপর নৃত্য করছে।······সোফিয়া ষ্টেশনে যখন প্রচুর জনতার সমাবেশ দেখলাম তখন পুলকিত চিত্তে মনে হল মানবধর্ম ফিরে এসেছে—"

এই প্রবন্ধের সঙ্গে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের একটি প্রতিকৃতির নীচের লেখা ছিল—"এঁকে দেখলে মনে হয় ইনি একজন তেমনি মানুষ যাঁর ঈশ্বর দর্শন ঘটেছে।······"

ন্যাশনাল থিয়েটার গৃহে ২৮শে নভেম্বরে ১৯২৬ রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় ভাষণের কিছুটা এখানে অনুবাদ করে দিচ্ছি। তারপর বর্তমান শতাব্দী উৎসবের সঙ্গে তৎকালীন উৎসবের তুলনামূলক আলোচনার চেষ্টা করা যাবে।······

"আপনাদের সামনে আজ আমি দাঁড়িয়েছি বাক্যহারা, মাতৃভাষার আশ্রয় আমার নেই। আমি আপনাদের সঙ্গে আজ যে ভাষায় কথা বলতে বাধ্য হচ্ছি, তা আপনাদেরও নয় আমারও নয়। আপনাদের মুখে যে আনন্দ অভিনন্দন দেখতে পাচ্ছি তাতে অভিভূত-চিত্তে ভাবছি যদি ভাষার বদলে আমার তেমনি একটি সুরের যন্ত্র থাকত যাতে সুরধ্বনি তুলে মনের সঙ্গে মনে এক অব্যবহিত যোগ করতে পারতাম।······কিছুদিন পূর্বে যখন চীনদেশে গিয়েছিলাম তখন আমার জন্মদিনে তারা নিমন্ত্রণ করেছিল, বিদেশে এই নিমন্ত্রণের সম্মান পেয়ে মনে হয়েছিল যেন আমি স্বদেশেই আছি······তাদের মত পোশাক আমাকে পরাল, আমি চীনা পরিচ্ছদ পরে যেন তাদেরই একজন হয়ে গেলাম। (পরিনু চীনের বাস) আজ এদেশে এসেও মনে হচ্ছে আমি তোমাদেরই একজন। শিশু যখন মায়ের কোলে জন্মায় তখনই তার জন্ম সম্পূর্ণ হয় না, মানুষের মনে তার কর্ম ও স্বীকৃতির দ্বারা তার আবার নূতন জন্ম হয় (দ্বিজত্ব 'শান্তিনিকেতনে' জন্মদিন প্রবন্ধ তুলনীয়) আজ আমার যেন আর এক জন্মদিন, তোমাদের হৃদয়ে আমার আর একটি আবাস··· আমার কাজ সমস্ত বিশ্বের মানুষের মধ্যে মিলন ঘটান, একাজ আমার কবিতা ভাষণ ও আমার স্থাপিত বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা আমি করে চলেছি······তবে তোমাদের ও আমার মধ্যে স্থায়ী সম্বন্ধ স্থাপনের যথার্থ মাধ্যম আমার কবিতা······যদিও আমি দূরদেশের ও ভিন্ন জাতির মানুষ তবু হয়ত আমার কবিতায় সেই দূরদেশের মানুষদের জীবনের প্রতিচ্ছবি তোমরা দেখতে পাবে, আনন্দ পাবে। যখন দক্ষিণ আমেরিকায় গিয়েছিলাম সেখানে হঠাৎ একদিন দেখলাম আমার স্বদেশী অতি প্রিয়

ফুল (জুঁই) ফুটে রয়েছে। প্রবাসে সেই পরিচিত ফুল যেন আমার হৃদয়ে স্বদেশ ও বিদেশের মধ্যে একটি সংযোগ করে দিল…কবিতাও ঐ ফুলের মত সহজ, ওর মধ্যেই সেই রহস্য গোপন আছে যাতে ভিন্ন দেশের বহু সাগরের দ্বারা বিচ্ছিন্ন মানুষের মধ্যে মিলনের সৃষ্টি করতে পারে, হৃদয়ের দরজা খোলাতে পারে। আমি প্রচারক নই……বক্তা নই, দার্শনিক নই, আমি কবি মাত্র……এই কবিতার ভিতর দিয়েই আমি বিশ্বের অনুভূতি, সার্বভৌম চিন্তা জাগ্রত করে মানুষের হৃদয়ে হৃদয়ে মিলন ঘটাতে চাই”—

১৯২৬ সালের অভিনন্দন ও তার প্রত্যুত্তরের সঙ্গে বর্তমান শতাব্দীর ঐ দেশের বক্তব্য ও চিন্তার তুলনা করলে বোঝা যায় রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য ও রচনার তখন যে অনুভব ও অর্থ ইয়োরোপে প্রচলিত হয়েছিল তার সঙ্গে পার্থক্য ঘটেছে আজকের রবীন্দ্র-গুণগ্রাহীর। সোফিয়াতে শতাব্দী উৎসবে পঠিত কবির একটি সুদীর্ঘ জীবনী থেকে একটি ছোট্ট অংশ অনুবাদ করছি—“তিনি ইয়োরোপ আমেরিকার ও এশিয়ার বহু দেশে বক্তৃতা দিয়েছেন। ইয়োরোপে বণিক-সভ্যতার মধ্যে প্রাণের অভাব আত্মার মৃত্যুর কথা তিনি বলেছেন। আমেরিকায় তিনি Cult of machine-এর প্রতিবাদ করেছেন। জাপানে Cult of nationalism-কে ধিক্কার দিয়েছেন যে নেশন-তন্ত্রের প্রভাবে চীনের উপর সাম্রাজ্যবাদী হুমকী চলেছে তার কথা বলেছেন”……এমনি করে বর্তমান বুলগার লেখক বহু দেশের উল্লেখ করে সেই দেশের সমস্যায় রবীন্দ্রনাথের বাণীর অমোঘতার বিচার করেছেন যাতে ফুটে উঠেছে বহুকাল পূর্বে উচ্চারিত ক্রান্তদর্শী কবির প্রজ্ঞা। লেখক স্তোয়নেভ রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে ৬।৭ খানি বই লিখেছেন। শতাব্দী উৎসবে প্রকাশিত প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন—“সেই পরীর দেশ যেখানে হীরা মুক্তা ছড়ানো, যেখানে গভীর অরণ্য ছায়াময়, যেখানে মহানদী খরস্রোতা, যেখানে কত গগনবিলম্বী ঐতিহাসিক মন্দির-চূড়া, যেখানে সোনালী লোমের বাঘ, সে দেশে কবি মনীষী মানবপ্রেমিক ও ভারতের মহাকবি রবীন্দ্রনাথ জন্মেছেন। বহুদিন পর্যন্ত আমাদের কাছে ভারতবর্ষ এক অজ্ঞাত রহস্যময় দুঃসাহসিক গল্পের দেশ ছিল।——সত্য ভারতকে জানতে আমাদের অনেক দেরি হয়েছে, অনেক দেরি হয়েছে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের বজ্রনির্ঘোষ শুনতে। সে দেশ যে বৃহৎ শক্তিমান মানুষের দেশ যারা সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে উদ্যত শক্তি সে কথাও জানতে আমাদের দেরি হয়েছিল। ভারতবর্ষের সত্য ছবি যাঁরা আমাদের কাছে প্রকাশ করেছেন, প্রকাশ করেছেন তার ঐশ্বর্য, তার ইতিহাসের সৌন্দর্য, তার স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা, এ সব কথা যাঁদের কাছে আমরা জেনেছি কবি দার্শনিক রবীন্দ্রনাথ তাঁদের অগ্রণী। যদিও তিনি ধনী ও

শিক্ষিত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন, তবু ধন বিত্তা সম্মান কিছুই তাঁকে মূঢ় অশিক্ষিত জনসাধারণের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দেয় নি। তাঁর আশ্চর্য কবিতাগুলিতে তৃণাঙ্কুর থেকে দূর আকাশের জ্যোতিষ্ক পর্যন্ত সকলের প্রতি এক সর্বব্যাপী করুণা অনুভব করা যায়। সে সূক্ষ্ম মমত্ববোধের সৌন্দর্য যেন ভারতীয় মিনিয়েচার ছবির উৎকর্ষের মত। আবার আর একদিকে তাঁর কবিতার মধ্যে দর্শনশাস্ত্রের জন্মভূমি ভারতের গভীর প্রজ্ঞা প্রকাশিত, সেই সঙ্গে অত্যাশ্চর্য মানবতা, মানুষের প্রতি সদা-জাগ্রত ভালবাসা, সুন্দর মুক্ত স্বাধীন ও পূর্ণ মানুষের উদ্বোধন তাঁর কবিতায়। শেষ জীবনে বোলপুর গ্রামে গ্রামবাসীদের সান্নিধ্যে বাস করলেন, সেই দরিদ্র নির্যাতিত বাঙ্গালী চাষীদের জীবন তিনি বহু গল্পে উপন্যাসে গভীর অন্তর্দৃষ্টির সঙ্গে বর্ণনা করেছেন। তাঁর রচনায় স্বদেশের সমস্ত সমস্যা, পরশাসনের দুঃখ, রায়তের অবস্থা, জাতিভেদের অন্যায় সমস্তই বিধৃত হয়েছে। ইত্যাদি—

১৯২৬ সালের অভিনন্দনের সঙ্গে বর্তমান আলোচনাটি মিলিয়ে দেখলে বোঝা যায় যে, পূর্বে তাঁকে যে প্রাচ্য-মিষ্টিক, ধর্মগুরু, ইত্যাদি বিশেষণে বর্ণনা করবার প্রয়াস ছিল বর্তমানে তা নেই—তাঁর মানব-প্রেমের কথা, মানুষের জন্য তিনি যা করেছেন, যা ভেবেছেন তারই ভিতর দিয়ে তাঁকে যথার্থ খুঁজে পাচ্ছে বর্তমানের ইয়োরোপ। সোফিয়াতে শতবার্ষিকী উৎসবের নিমন্ত্রণপত্রের সঙ্গে কবির পরিণত জীবনের এই সার্থক আত্ম-বিশ্লেষণটি উদ্ধৃত ছিল—"আমি এসেচি এই ধরণীর মহাতীর্থে—এখানে সর্বদেশ সর্বজাতি ও সর্বকালের ইতিহাসের মহাকেন্দ্রে আছেন নরদেবতা—তাঁরই বেদীমূলে নিভৃতে বসে আমার অহঙ্কার আমার ভেদবুদ্ধি স্খালন করবার দুঃসাধ্য চেষ্টায় আজও প্রবৃত্ত আছি—"

জার্মানীতে একজন প্রৌঢ় আমাকে বল্লেন ১৯২২ সালের কথা—রবীন্দ্রনাথ তখন কাউণ্ট কেইসারলিং-এর অতিথি, তখন ডিউক অব হেসের বাগানে যে সভা বসত সেখানে তিনি উপস্থিত থাকতেন। তখন তাঁর বয়স আঠার বছর। সপ্তাহ-ব্যাপী সে সভায় বহু লোক রবীন্দ্রনাথকে দেখতে আসত ও নানা প্রশ্ন করত। কিন্তু কাউণ্ট কেইসারলিং-এর বর্ণিত রবীন্দ্রনাথের ব্যাখ্যায় তাঁর যুবক চিত্ত সন্তুষ্ট হত না। মিষ্টিক কবি, প্রাচ্য ধর্মগুরু ইত্যাদি বিশেষণের চেয়ে রবীন্দ্রকাব্যে মানুষের প্রতি ভালবাসাই সহজ সরল রূপে তাঁর কাছে প্রকাশ পাচ্ছিল। জার্মান ভদ্রলোক বল্লেন, অনেকের সঙ্গেই আমার তর্ক হচ্ছিল এ নিয়ে—যাঁর কাব্যে এমন মানবতার প্রকাশ তাঁকে মিষ্টিক বলা ভুল। দুর্জ্ঞেয় তিনি নন, সে জন্য ভারতের স্বাধীনতার যুদ্ধ সম্বন্ধে তাঁর কি মত সে কথা আমি সুযোগ পেলে জিজ্ঞাসা করব শুনে সেদিন

অনেকেই বাধা দিয়েছিলেন। তাঁদের মতে রবীন্দ্রনাথ কবি দার্শনিক ও ভক্ত, আধ্যাত্মিকতাই তাঁর উপজীব্য, পলিটিক্সের চিন্তা তাঁর নেই। কিন্তু অবশেষে যখন কাউণ্ট কাইসারলিং-এর কাছ থেকে দু'মিনিটের সময় পেলাম তখন দুরুদুরু বুকে আমি এগিয়ে গিয়ে প্রশ্ন করলাম, "ভারতবর্ষ কি স্বাধীন হবে?" "নিশ্চয়ই হবে"

"সে বিষয়ে অন্য কোন রাষ্ট্রের সাহায্য প্রয়োজন হবে না, সে একলাই এ যুদ্ধে জয়ী হতে পারবে।"

"আমার তো মনে হয়, অন্যের সাহায্য ছাড়াই তাকে স্বাধীনতা অর্জন করতে হবে।" আমি ভেবেছিলাম এ সব রাজনৈতিক প্রশ্নে তিনি বিরক্ত হবেন কিন্তু তিনি সুধা বিকীর্ণ মৃদু হাস্য করে যৌবনগর্বিত আঠার বছরের ছেলের দিকে চেয়ে বল্লেন—"বয়স্ক ও বৃদ্ধ লোকেরা যখন সত্যের অনুসন্ধান করে তখন তা সুন্দর কিন্তু বালকের পক্ষে তা আরো সুন্দর।"

প্রথম যুদ্ধের পরে ইয়োরোপে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব রণক্লান্ত পরাভূত শোকাচ্ছন্ন মানুষের মনে শান্তির সুধা বর্ষণ করেছিল কিন্তু বর্তমানের ইয়োরোপ মনে করে সে অনুভূতি যুক্তির দ্বারা বিশ্লেষিত হয় নি। মিষ্টিক, প্রাচ্য জ্ঞানী Wise man of the east প্রভৃতি মোহময় বিশেষণের দ্বারা আবৃত হয়ে গেছে। প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাথের বাণীতে রহস্যময় অলৌকিকতা কিছু নেই—তিনি এই পৃথিবীর সুখদুঃখকাতর মানুষের বন্ধু। তিনি দুর্বলের বল জোগান, অত্যাচারীর বুকে ঘৃণার শাণিত বাণ নিক্ষেপ করেন, দুঃখীর বন্ধু, অসহায়ের সহায় রূপে উচ্চারিত তাঁর বাণী সকল দেশের সকল মানুষের সান্ত্বনা। স্বদেশে বিশ্বভারতীতে ও শ্রীনিকেতনে তাঁর সারাজীবনের বহুধা কর্মযোগে যে মানবপ্রেম প্রবাহিত, পৃথিবীর দূর-দূরান্তে সকল মানুষের জন্য নিবেদিত সেই প্রেমই তাঁর কাব্যের প্রেরণা। দার্শনিকের উদারতা, বৈজ্ঞানিকের যুক্তি, পণ্ডিতের প্রজ্ঞা ও কবির সহৃদয় প্রেম নিয়ে তিনি সকল মানুষের দুঃখ-দুর্দশা অত্যাচার ও অবিচারের প্রতিরোধ করে চলেছেন দীর্ঘ জীবনের প্রতিটি দিন। সেই কবিকে মিষ্টিক আখ্যাদ্বারা দুর্বোধ্য করে তোলা ভ্রম মাত্র।

রাশিয়াতে রবীন্দ্রনাথের এই পুনর্মূল্যায়নের চেষ্টায় যে অনুশীলন চলেছে তার ব্যাপকতা দূর থেকে অনুমান করা শক্ত। এটি শতাব্দী উৎসবের ডঙ্কা বাজিয়ে ভারতবর্ষের মনোরঞ্জনের চেষ্টা মনে করা, শুধু একটি বিরুদ্ধ ভাব পোষণ করার ইচ্ছা ছাড়া আর কিছু নয়। বহু ছাত্র-ছাত্রী অধ্যাপক-অধ্যাপিকা এই কার্যে তাঁদের সারা জীবন উৎসর্গ করেছেন, কষ্ট করে বাংলা ভাষা শিখেছেন এবং রবীন্দ্র-চিন্তার গভীরতার মধ্যে প্রতিদিনের সান্ত্বনার পথ খুঁজে ফিরছেন। এবারে জুনের প্রথম

সপ্তাহে যখন মস্কোর লেখকসংঘের আমন্ত্রণে গিয়ে পৌছলাম তখনও শতাব্দী উৎসবের শেষ পর্যায় চলেছে। লেখক-সংঘের ছোট্ট একটি ঘরে বসে সেই উৎসবের বিবরণ শুনতে লাগলাম—এশিয়াটিক রাশিয়ার ও নানা দূরতম প্রান্তে পার্বত্য গ্রামেও হয়েছে উৎসব—এমন সব ভাষায় 'নৌকাডুবি' অনূদিত হয়েছে যেগুলির নামও ভাষাবিদ ছাড়া কেউ শোনেন নি এবং সে পার্বত্য ভাষা অল্পদিন পূর্বে পর্যন্ত ছাপার অক্ষরের গর্ব করতে পারত না। রাশিয়ার বিভিন্ন স্থানের উৎসবের বিবরণগুলি ও খবরের কাগজের কাটিং আমায় উপহার দিলে—সেটি একটি ডিক্সেনারীর মত ভারী। লেনিনগ্রাদে 'তাসের দেশ' বাংলা ভাষায় অভিনীত হয়েছে—রুশ ভাষায় অনূদিত গানে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের অক্ষত সুর সংযুক্ত হয়ে অপরূপ সুরমাধুর্য তরঙ্গিত করেছে—কিন্তু সবচেয়ে বিস্মিত হলাম যখন রবীন্দ্ররচনার একটি সুসম্পূর্ণ গ্রন্থপঞ্জী ও তাঁর উপরে রচিত পুস্তকের তালিকাটি আমার হাতে এল। ক্ষণিক হুজুগে পড়ে উৎসবের আয়োজনে নৃত্যগীতাদি করা কিছু বিস্ময়কর নয়, কিন্তু দিনের পর দিন অক্লান্ত পরিশ্রম করলে তবে গ্রন্থপঞ্জী তৈরী হয়। বাংলা ছাড়া আর কোনো ভারতীয় ভাষায় ও বাঙ্গালীকৃত ছাড়া ইংরেজী ভাষায় রবীন্দ্ররচনার এমন পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থপঞ্জী হয়নি। দিনের পর দিন অক্লান্ত শ্রমদান যে রাজনৈতিক চাল-প্রসূত একথা অশ্রদ্ধেয়। সেই সময়ে মস্কোতে ছোটদের থিয়েটারে রুশ নাট্যকারের নির্দেশে রামায়ণ অভিনয় হচ্ছিল। ঐ অভিনয় ছোট বড় সকলেরই মনোহরণ করেছিল, দীর্ঘকাল ধরে অভিনয় চলেছে, মস্কোর শিল্পপ্রিয় সকল লোকেরই একবার দেখা হয়ে গেছে। একটি ভদ্রমহিলা যিনি রবীন্দ্র রচনাবলীর দ্বিতীয় খণ্ডের সম্পাদনা করছেন, একদিন তাঁর ছোট তিনঘরের ফ্ল্যাটে নিমন্ত্রিত হয়ে গিয়েছি, খাবার টেবিল ঘিরে বসেছে পরিবারের সবাই—দাদা বৌদি—অদূরে শুভ্রকেশা শ্বশ্রূমাতা তদারক করছেন। শুনলাম তিনিই সব রান্না করেছেন। কথাচ্ছলে জিজ্ঞাসা করলাম 'রামায়ণ দেখেছেন?'* ভদ্রমহিলা ঈষৎ অপ্রস্তুত মুখে শুদ্ধ বাংলায় বল্লেন, 'না ভাই সময় হয় নি'—ঘরশুদ্ধ লোক হেসে উঠল, দাদা বল্লেন, "সময় কি করে হবে? এর সমস্ত সময়ই তো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অধিকার করে বসে আছেন।" দূর দেশের সেই সাততলা এক বিরাট বাড়ির ছোট ফ্ল্যাটটিতে বসে মাতৃভাষার এক বিজয়িনী মূর্তি মনকে অভিভূত করে দিল।

ঐ সব দেশে রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতা বড় জনপ্রিয়, প্রায়ই আবৃত্তি হয়—'কাগজের নৌকা'—

---

* মস্কোতে তখন মাদাম গুইসন্তা কর্তৃক পরিচালিত রামায়ণ নাটক অভিনীত হচ্ছিল।

"ছুটি হলে রোজ ভাসাই জলে
কাগজ নৌকাখানি
লিখে রাখি তাতে আপনার নাম
লিখি আমাদেব বাড়ি কোন্ গ্রাম।
বড় বড় করে মোটা অক্ষবে
যতনে লাইন টানি
যদি সে নৌকা আর কোনো দেশে
আর কারো হাতে পড়ে গিয়ে শেষে
আমার লিখন পড়িয়া তখন
বুঝিবে সে অনুমানি
কার কাছ হতে ভেসে এল স্রোতে
কাগজ নৌকাখানি।

গঙ্গাতীরে একদা যে কাগজের নৌকা ভাসিয়েছিলেন তা সপ্ত সাগর পাব হয়ে চলেছে দানিয়ুব রাইন ধরে, পাল তুলেছে ভল্‌গায়—বহন করে নিয়ে চলেছে সগৌরবে সেই বিজয়িনীকে, আ মরি বাংলা ভাষা…

শিলাইদহে

১৯৭১ সালের জানুয়ারীর মাঝামাঝি স্বাধীন বাংলাদেশের রাজধানীতে প্রবেশ করা গেল। গত সাত বছর ধরে অর্থাৎ ১৯৬৪ সাল থেকে আমরা কয়েকজন (সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি পরিষদের সভ্যবৃন্দ) পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালীদের সঙ্গে আত্মিকযোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা করেছিলাম। বিঘ্ন ছিল অনেক। দু'দিকেই সন্দেহ ও অবিশ্বাসের মেঘ ঘনিয়েছিল, বিশেষ করে পাকিস্তান সরকারের ভ্রূকুটিতে সাহিত্য সংবাদের আদানপ্রদান একরকম বাদই ছিল। তবু গোপনে গোপনে ব্যক্তিগত পরিচয়সূত্রে যেটুকু হাতে এসে পৌছত তাতে দেখতাম পশ্চিম বাংলার সাহিত্য সংস্কৃতি সম্বন্ধে জানার গভীর আগ্রহ তাঁদের। বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথকে পাবার, তাঁর সঙ্গীতের ধারায় জীবন পূর্ণ করে নেবার কি আকুলতা! সেই আগ্রহে বাধা পড়ল বলেই তো বাঁধল লড়াই। পূব পাকিস্তানের মুসলমান যখন ধর্মীয় সত্তার চেয়ে সাংস্কৃতিক সত্তা বা বাঙালীত্বকে বড় করে দেখতে পেল তখনই রবীন্দ্রনাথ তাঁদের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হলেন—সাম্প্রদায়িক ধর্মের চেয়ে মানবধর্মের বা মানবতার প্রভাব ক্রমেই ভাস্বর হল। আমরা পশ্চিমবঙ্গের ভক্তরা পূর্ববঙ্গে রবীন্দ্রনাথের এই পুনরুজ্জীবনে উল্লসিত হলাম। এবং এই বন্ধনসূত্রকে দৃঢ় করবার জন্য ১৯৬৪ সাল থেকে পশ্চিমবঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানের লেখকদের রচনা প্রকাশ করতে লাগলাম মনে আছে ১৯৬৫ সালে একটি মুসলমান যুবক ফেণী থেকে আমায় লিখেছিলেন—"রাত্রে যখন রেডিওতে রবীন্দ্রসঙ্গীত বাজে আমি জানালা খুলে জ্যোৎস্নার সমুদ্রের দিকে চেয়ে থাকি, আমার মন দূর থেকে দূরান্তরে যেন আকাশের সীমানা পার হয়ে কোনো এক অজ্ঞাত জগতে চলে যায়। বলতে পারেন এর অর্থ কি? এ কি কোনোরকম প্রত্যক্ষ ধর্মবোধ?" সেই যুবক আজ কোথায় আছে—আছে কি না জানি না। তার নামটাও মনে নেই। তবু এইসব সংস্পর্শ হেতু এঁদের অস্তিত্বের সঙ্গে একাত্ম হয়ে ছিলাম বলে উনিশ শ' একাত্তর সালের পঁচিশে মার্চ যে ভয়ানক তাণ্ডব সুরু হল আমাদের দেহে মনে তার ঢেউ লাগল প্রচণ্ড ভাবেই। বস্তুত যেন আমাদেরই ঘরে আগুন লাগল, আমাদেরই ছেলে নিহত হতে লাগল, আমাদেরই সর্বস্ব লুণ্ঠিত হতে লাগল, কোনও পার্থক্য রইল না দুই বঙ্গের বাঙালীর দুঃখ দহনে।

দীর্ঘ নয়মাস পরে যুদ্ধাবসানে বিজয়ের দিনে আমার প্রথম কথাটিই মনে হল

যে, এবার রবীন্দ্রনাথের প্রিয় বাসস্থান ও 'মানুষের কবির' আবির্ভাবের ক্ষেত্র শিলাইদহ দেখব। এই শিলাইদহে ও পদ্মার ধারে ধারে প্রাকৃতিক ও মানবিক পরিচয়ের অভিজ্ঞতার সঞ্চয়ে পূর্ণ হয়ে ওঠেন মহাকবি। দেশের সাধারণ মানুষ তাদের সুখদুঃখকাতর জীবন নিয়ে, বিশ্বপ্রকৃতি তার অসীম সৌন্দর্যসম্ভার নিয়ে কবির হৃদয়ের বড় কাছাকাছি এসেছিল এইখানেই। এইখানেই জোড়াসাঁকোর 'নাগরিক কবি'র ঘটেছিল 'মানুষের কবি'তে উত্তরণ। বাঙালীর কাছে শিলাইদহ তাই একটি বিশেষ অর্থবহ নাম। স্বাধীনতার পরেই অর্থাৎ জানুয়ারীর (১৯৭২) মাঝামাঝি ঢাকা পৌছন গেল। বাংলাদেশে প্রবেশ করবার সূচনাতেই মনে করেছিলাম, যে রবীন্দ্রসঙ্গীত এই স্বাধীনতার সংগ্রামের অন্তবর্তী প্রেরণা—সেই রবীন্দ্রনাথের শিলাইদহ সম্বন্ধে স্বাধীনতার নায়ককে কিছু বলব। তখন মুজিবর রহমানের কাছে দেশ-বিদেশ থেকে মহারথীরা নানা উপহার নিয়ে আসছে। ভাবলাম, রাজদর্শনে কি নিয়ে যাই? এমন কোনো উপহার যা তার আর্থিক সীমাকে ছাড়িয়ে যাবে বহুদূর, যা আমি ছাড়া আর কেউ দিতে পারবে না বা দেবে না। বাংলাদেশের গায়ক-গায়িকারা সেই প্রসিদ্ধ গানটি গাইতেন খুব—'ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলে আগুন জ্বালো'। কোনো রাষ্ট্রের মুক্তির পথে এমন গানের শক্তি অনেক। ঐ গানটির রবীন্দ্রনাথের স্বহস্ত লিখিত পাণ্ডুলিপি এবং তাঁর স্বাক্ষরিত একটি ফটোগ্রাফ একসঙ্গে বাঁধিয়ে নিয়ে গেলাম। ১৮ই জানুয়ারী ১৯৭২ মুজিবর রহমানের সঙ্গে সেই ঐতিহাসিক প্রাসাদোপম গৃহে দেখা হল, যেখানে ইয়াহিয়ার সঙ্গে তাঁর আলোচনা চলেছিল।

রবীন্দ্রনাথও যে যুদ্ধে জঙ্গী আততায়ীর হাতে একজন প্রধান শহীদ সেকথা তিনি আমায় বললেন। তাঁর নিজের ঘরে টাঙ্গানো রবীন্দ্রনাথের ছবিখানিকে নাকি গুলি করা হয়।

তাঁকে তখন বলেছিলাম—শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথের আদর্শে একটি সর্বাঙ্গীণ শিক্ষার আয়োজন যদি করেন, যদি একটি মিউজিয়াম হয় তাহলে সেকাজে যতদূর সহযোগিতা করা যায় তা আমরা করব। আমার উপহারটি মাথায় ঠেকিয়ে তিনি বললেন, "এ জিনিস আমার ব্যক্তিগত সামগ্রী নয়, এ যাবে আমার রবীন্দ্র মিউজিয়মে।" আরো বললেন, "তাঁর জন্য আমরা কিছু করতে পারি নাই, এবার করব।"…তারপর থেকে মাঝে মাঝেই শুনছি শিলাইদহে নবশান্তিনিকেতন করার কথা। নবশান্তিনিকেতন গড়ার চেয়ে পুরাতন শান্তিনিকেতনের দিকেই আমার লোভ বেশি। এমন একটি স্থান এখন এজগতে বড় প্রয়োজন যেখানে অর্থের মূল্যের চেয়ে সুন্দরের মূল্য বেশি। যেখানে ইট কাঠ ও লোহার স্তূপের চেয়ে

খড়ের ঘরের একটি আলপনায় চিত্রিত দেওয়াল বেশি মনোহর—যেখানে অরুপণ প্রকৃতি মানুষের নিত্যসঙ্গী।

মার্চের প্রথম দিকে একবার চেষ্টা করলাম শিলাইদহ যাবার। কুষ্টিয়া পর্যন্ত জীপে যাওয়া হল; নৌকায় লোক ও জীপ পার হবার বন্দোবস্ত হল, বিশাল গড়ুই নদীর বিস্তৃত বালুচর দেখে ছিন্নপত্রের বহু বর্ণনা মনে পড়তে লাগল। এই নদী তো সম্পূর্ণ হারিয়েছিল আমাদের কাছে। একে যেন কোন বিস্মৃত জগৎ থেকে কেউ উদ্ধার করে এনেছে। সেই উদ্ধারের মর্মান্তিক কাহিনী সুদীর্ঘ করে লেখা রয়েছে মানুষের করোটি ছড়ানো তীরভূমিতে। কুষ্টিয়ার একটি যুবকের কাছে বর্ণনা শুনেছি রবীন্দ্রনাথের প্রিয় ঐ গড়ুই নদীর চরকে পাকিস্তানীরা নাম দিয়েছিল 'স্বাধীন বাংলা' এবং হতভাগ্য বন্দীদের বলত, চল তোদের স্বাধীন বাংলায় নিয়ে যাই। তারপর এইখানে এনে বধ করত। একটি হত্যার দৃশ্য দেখেছিল ঐ ছেলেটি নদীর অপর দিকের ঝোঁপের মধ্যে লুকিয়ে বসে। ঘাতকেরা তাদের বন্দীকে হত্যা করছিল ধীরে ধীরে। সেদিন সুন্দর জ্যোৎস্না রাত্রি—আঘাতে জর্জরিত সেই ব্যক্তি চীৎকার করছিল—"হে আকাশ তুমি সাক্ষী থেকো এই অন্যায়ের যেন উপযুক্ত প্রতিবাদ হয়। হে গড়ুই নদী তুমি সাক্ষী থেকো, হে পূর্ণচন্দ্র তুমি সাক্ষী থেকো, আকাশের তারা তোমরা দেখ।" সেই মরণার্ত চীৎকার এক অপূর্ব কবি মনের পরিচয় দিচ্ছিল, একপাশে নরপশু নখদন্ত বিস্তার করেছে, আর একপাশে সৌন্দর্য-উদ্দীপিত মানুষের অপূর্ব মহিমার কাহিনী আমাদের অশ্রু ঝরিয়েছিল সেদিন।

অপর দিকে গড়ুই নদীর খাড়া তীরভূমি, জীপ যেন প্রাণ হাতে নিয়ে উঠল। তারপর ভাঙ্গা-চোরা রাস্তা দিয়ে মাইল তিন চার যাওয়া গেল—রাস্তা এত খারাপ যে পথে বিরাট বিরাট গহ্বর মুখ ব্যাদন করে আছে, শুনলাম পথ থেকে মাটি খুঁড়ে নিয়ে গ্রামের লোকেরা গৃহসংস্কার করেছে। কারণ রবীন্দ্রভবনে যাবার ঐ পথের প্রয়োজনীয়তাটি এতদিন কেউ বোঝেনি। এই পথটি পদ্মানদীর পাড় ঘেঁষে চলেছে। শুনলাম, সুলতানপুর গ্রামের দিক দিয়ে আর একটি রাস্তা আছে সেটি মেরামত হচ্ছে। যাহোক মধ্যপথ থেকে ফিরে আসতে হল সেবার শূন্য মনে। দুঃখ হল স্বাধীনতার পর পঁচিশ বছর কেটে গেছে—এখনও শিলাইদহের পথ এমন বিপদসঙ্কুল, এ পথে মানুষের আনাগোনা নেই। আমার মন পৌত্তলিক নয়, স্থানমাহাত্ম্য ইত্যাদিতে আমি বিশ্বাসী নই, তবু যে-স্থানের স্মৃতি রবীন্দ্রকাব্যে এমন উদ্ভাসিত, তার প্রতি আকর্ষণ বোধ করছিলাম প্রবলভাবে। ঐ পাশের পদ্মা দেখলুম অনেক শীর্ণ, গড়ুই নদীর প্রশান্ত জলরাশির কাছে ম্রিয়মাণ। নিরালায় বিষণ্ন মন নিয়ে ভাবছিলাম আর হয়ত কোনো দিনও

আসা হবে না। কিন্তু ভাগ্যক্রমে সে সুবিধা হল। পঁচিশে বৈশাখের দিন পনের আগে কুষ্টিয়া থেকে কয়েকটি ভদ্রলোক এলেন তাঁরা রবীন্দ্রজন্মোৎসব কমিটি করেছেন,—বললেন, 'এবার বেশি লোক নিয়ে যেতে পারব না, এখনও ব্যবস্থা তেমন পাকা নয়'—তাঁদের নিমন্ত্রণে চব্বিশে বৈশাখ পৌছন গেল। সেই গড়ুই নদী পার হয়ে গাড়ি উঠল অপরদিকে। এবারে অন্যদিকের রাস্তাটি তৈরী হয়েছে—এ রাস্তা পদ্মার পার দিয়ে নয়, গ্রামের মধ্য দিয়ে কাঁচা মাটির পথ। বহুদিনের পুরানো সব গ্রাম বেশ পরিচ্ছন্ন, বড় বড় ঘর। কুষ্টিয়া শহর যে পরিমাণ ধ্বংস হয়েছে এ দিকের গ্রামে তেমন গৃহদাহের চিহ্ন দেখলাম না। মাঝে মাঝে বিরাট দু' একটি ধ্বংসোন্মুখ পাকা বাড়ি। হিন্দু জমিদারদের পরিত্যক্ত ভিটা দেখা গেল। তখনি একটা বৃহৎ দীঘি সংযুক্ত ইঁট বার অট্টালিকা দেখিয়ে একজন বললেন ওটা বাঘা যতীনের পৈতৃক আবাস। মাইল চার পাঁচ পাকা রাস্তা পার হয়ে শিলাইদহের বহুশ্রুত কুঠিবাড়ির রঙ্গীন দেওয়াল দেখা গেল।

এতদিন বাংলাদেশে ঘুরে ঘুরে কোথাও জঙ্গলে ঢাকা কোথাও বা জবর দখলে অধিকৃত বড বড় বাড়ী দেখেছি। ইঁট কাঠ বের করে আছে—কোথাও বা অশ্চর্য টেরাকোটার কারুকার্য অশ্বত্থের শিকড়েব বন্ধনে উধর্বশ্বাস, এক একটা পোড়ো বাড়ীর থাম কলকাতার পুরানো সেনেট হলের থামের কথা মনে পড়িয়ে দেয়। বিরাট গথিক স্থাপত্যের ভগ্নাবশেষ পলাতক হিন্দুদের স্মৃতিভারে অবসন্ন। মনে মনে ভাবছিলাম শিলাইদহের কুঠিবাড়ী অমনি একটা বিরাট কিছু হবে। কিন্তু অনাড়ম্বর একটি সুশ্রী বাংলো বাড়ি ছবিতে যেমন দেখা গেছে তার চেয়ে বেশি কিছু কোথাও নেই। অপ্রশস্ত কাঠের সিঁড়ি, সাধারণ মানের দরজা জানালা স্নানের ঘর অর্থাৎ ঠাকুর বাড়ীর চলতি ভাষায় "নাবাব" ঘরের বিশেষত্ব নিচু লম্বা বাঁধান দেওয়ালেব তাক। জিনিসপত্র অবশিষ্ট কিছু নেই—একটি পালকী আর একটি চেয়ারের কাঠামো ছাডা। শুনলাম, প্রতি বছরই নতুন নতুন সরকারী কর্মচারী আসতেন, তাঁরা বহু যত্ন করে তুলে রাখবার জন্য কিছু কিছু জিনিস নিজেদের বাড়ি নিয়ে যেতেন। ছাতের উপর তিনতলায় কবির লেখার ঘর। ঐখান থেকে দূরে পদ্মা দেখা যায়—ঘরটি একেবারে ছোট। দেখে বুঝতে পারলাম এ বিষয়ে তাঁর মনের ভাবটা চিরকালই একরকম ছিল। ছোট ঘর তাঁর ভালো লাগত। বিরাট প্রাসাদের সমারোহ তাঁর অরুচিকর ঠেকত। শিলাইদহের কুটিবাড়ি তা জমিদারেরই বাড়ি কিন্তু অন্যান্য জমিদার বাডির তুলনায় জমকালো নয়।

ফিরবার পথে হিজলেবট নামক একটি গ্রামে হেরম্ব মৈত্র মহাশয়ের পৈত্রিক ভিটা দেখলাম—কোনো নীলকুঠি সাহেবদের বাড়ি—তার একটা ঘরে

শিলাইদহের তিনখানি ঘর ঢুকবে। মানসিক যে প্রবণতা ছিল বলে কবি জোড়াসাঁকোর প্রাসাদ ছেড়ে শান্তিনিকেতনে মাটির ঘরে চলে আসতে পারলেন সে কথা আর একবার মনে পড়ল। শান্তিনিকেতনে আশ্রম রচনাকালে বাহুল্য বর্জিত ছোট নীড় গড়তে চেয়েছিলেন, সে যে সে বাসা নয়, সে নীড়ে সারা বিশ্ব আশ্রয় পাবে এই ছিল তাঁর সাধ। কিন্তু তার জন্য সিমেণ্ট কংক্রিট বা ইট কাঠের বড় বড় থাম ও খিলানের প্রয়োজন দেখেন নি। এবারে বুঝলাম যে যখন তিনি জমিদারীতে রাজত্ব করেছেন, সংসার করেছেন তখনও আড়ম্বরের প্রশ্রয় দেননি। শিলাইদহ আশ্রম নয়, কিন্তু আশ্রম ছিল তাঁর অন্তরে। কালক্রমে কিন্তু শান্তিনিকেতনেও সেই আশ্রম হারিয়ে যেতে লাগল, দুঃখিত মনে 'কুটিববাসী' কবিতাটিতে তাই তালধ্বজ কুটিরের বাসিন্দাকে লক্ষ্য করে লিখলেন—

"কীর্তিজালে ঘেরা আমি তো ভাবি
তোমার ঘরে ছিল আমারো দাবি—
হারায়ে ফেলেছি সে ঘূর্ণি বায়ে
অনেক কাজে আর অনেক দায়ে"

কিন্তু সে দায়ে দায়ী তিনি নিজে নন, হারাতে তিনি চাননি তবু হারিয়ে গেল, কেন গেল সে কাহিনী পরের প্রবন্ধে রইল।

কুটিরবাসী

পূর্বের প্রবন্ধটিতে শিলাইদহের প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বনবাণী কাব্যগ্রন্থের 'কুটিরবাসী' কবিতাটির উল্লেখ করেছিলাম। 'কুটিরবাসী' কবিতাটির মুখবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন—"তরু বিলাসী আমাদের এক তরুণ বন্ধু এই আশ্রমের এক কোণে পথের ধারে একখানি গোলাকার কুটির রচনা করেছেন, সেটি আছে একটি পুরাতন তালগাছের চরণ বেষ্টন করে তাই তার নাম হয়েছে তালধ্বজ। এটি যেন মৌচাকের মতন নিভৃত বাসের মধু দিয়ে ভরা লোভনীয় বলেই মনে করি। সেই সঙ্গে এও মনে হয় বাসস্থান সম্বন্ধে অধিকার ভেদ আছে যেখানে আশ্রয় নেবার ইচ্ছা থাকে সেখানে হয়ত আশ্রয় নেবার যোগ্যতা থাকে না। এই শেষ লাইনটিতে একটু মনস্তাপের ছোঁয়া আছে, তার গভীরতা কতদূর তা হয়ত সাধারণের চোখ এড়িয়ে যায়—কবি যেন বলতে চাইছেন, "আমার আশ্রমে আমি যা করতে চাই ছিলাম তা পারলাম না, আমার যোগ্যতা নেই।"

সকলেই জানেন শান্তিনিকেতন আশ্রমে রবীন্দ্রনাথ একটি পরীক্ষা করছিলেন—এই পরীক্ষা নানাদিক প্রসারী, শুধু যে শিক্ষা বিষয়ে তা নয়, এখানে একটি সম্যক জীবনচর্চার পরীক্ষা হচ্ছিল তার মধ্যে কেন্দ্রবিন্দুর মত উপনিষদের সেই আশ্চর্য মন্ত্রটি আছে "ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা", ত্যাগের রিক্ততা নয়, ত্যাগকেই ভোগে পরিণত করা। ত্যাগেই আনন্দ, আশ্রমে ছিল না শুষ্ক বৈরাগ্যের শূন্যতা বা ধনের স্পর্ধা। খড়ের চাল মাটির বাড়িগুলির মধ্যে সবচেয়ে চোখে পড়ে ঐ তালধ্বজ, ওর আশ্চর্য শ্রীর কাছে স্কাই-স্ক্রেপারের দম্ভ লজ্জা পায়। জোড়াসাঁকোর রাজভবন ছেড়ে কবি নিজেও বাস করতেন ছোট ছোট বাড়িতে। খড়ের চাল মাটির বাড়িতে আমিও তাঁকে থাকতে দেখেছি—যদি কেউ তাঁকে জিজ্ঞাসা করত মাটির বাড়িতে কষ্ট হয় কিনা—তিনি বলতেন ভারতবর্ষের নিরানব্বইজন লোকই তো মাটির বাড়িতে থাকে, কষ্ট কি ? কোণার্কের পাশেই একটা মাটির ঘর ছিল—সে ঘরে শ্রীযুক্ত অমিয় চক্রবর্তী মহাশয় হল্যাণ্ড দুহিতা হৈমন্তীদেবীকে বিবাহ করবার পর বাস করতেন। আলপনা ও দেশীয় শিল্পে সাজান সেই ছবির মত ঘরটি আজও আমার চোখে লেগে আছে। উনিশ শ' ছাব্বিশ-সাতাশ সালে কবি 'কোণার্কে' থাকতেন। কোণার্ক বাড়িটিতে তখন ছোট ছোট চারটি ঘর ছিল। ঘরগুলো এত ছোট ছোট ও নিচু যে মনে হয় যেন মাথায় লেগে যাবে—বিশেষ করে ওই দীর্ঘ দেহ, দীর্ঘ পরিচ্ছদধারী পুরুষ যখন সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াতেন তখন মনে হত, এঁকে তো এ ঘরে মানায়

না। নানা প্রদেশের লোকশিল্প, বেড়ার নক্‌সা, ঘরের ছাউনীর নক্‌সা, প্রভৃতির সংগ্রহ সুরু হয়েছে তার আগে থেকেই, আমার মনে আছে আমরা যখন চট্টগ্রামে থাকতাম তখন তিনি আমার পিতাকে লিখেছিলেন, আমার মাকে যেন অনুরোধ জানান হয় চট্টগ্রামের কুঁড়ে ঘরের বেড়ার ও চালের নক্‌সা জোগাড় করতে। তিনি জানতেন এ বিষয়ে, পণ্ডিত, অধ্যাপকদের চেয়ে মেয়েরাই কিছুটা উৎসাহিত হতে পারে। অধ্যাপকেরা খুব হেসেছিলেন, বেড়ার নক্‌সা দিয়ে রবীন্দ্রনাথ কি করবেন —বেড়ার নক্‌সার চেয়ে ফাল্গুনীর তত্ত্বই তখন তাঁদের মনোযোগ অধিকার করেছিল। দেশীয় লোকশিল্পের পুনরুজ্জীবনে শান্তিনিকেতনের দানের কথা একালের অনেকেই হয়ত জানেন না। তখনকার গৃহসজ্জায় পাশ্চাত্য প্রভাব ছিল সর্বত্র, ধনীগৃহের চেয়ার-৺কাচ গিলটি করা ছবির ফ্রেমে ভারতীয় সৌন্দর্যরুচির কোনো চিহ্ন ছিল না। ধনীর ঘরে ছিল বিলাতী শৌখীন আসবাবের জাঁকজমক; স্বল্প-বিত্তের ঘর ছিল মলিন শ্রীহীন—শিল্প-সমৃদ্ধ ভারতের কোনো চিহ্ন গৃহস্থের ঘরে উপস্থিত ছিল না। এই দিকে শান্তিনিকেতনের দানের কথা এ কালে কেউই হয়ত ঠিকমত জানেন না। অন্যান্য প্রদেশে তো নয়ই, বাংলাদেশেও নয়। রূপ-সজ্জার যে আয়োজন শান্তিনিকেতনে সৃষ্ট হল তা অনেকখানিই অর্থের বন্ধনমুক্ত ছিল। দারিদ্র্যকে সৌন্দর্যের মূল্যে মূল্যবান করে তোলাও শান্তিনিকেতনের একটি মহৎ দান। আশ্রমের বাড়িগুলি তা ইটেরই হোক বা মাটিরই হোক ছিল ছোট—চারপাশের গ্রাম থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন, হঠাৎ গজিয়ে ওঠা নয়। সোনার খাঁচায় তোতাপাখী পড়ান তাঁর আদর্শ ছিল না। গাছের তলায় প্রকৃতির সঙ্গে মেশামেশি হয়ে সরল সুন্দর জীবনে তিনি এক নতুন ঐশ্বর্যের সন্ধান এনেছিলেন। এ আশ্রম বৈরাগ্যের রিক্ততার নয়, রূপে রসে নানা অলঙ্করণে সজ্জিত, নূতন নূতন উৎসবে মুখরিত। এখানে যে আনন্দের আয়োজন সে টাকা দিয়ে কেনবার নয়। এখনকার ছেলেমেয়েদের সাজে সজ্জাতেও সেই ছাপ ছিল, বিশেষত্ব ছিল—সেই বিশেষত্বে ধনের গর্ব ছিল না। আমার মনে আছে একবার ৭ই পৌষে আমার এক বান্ধবী আমার সঙ্গে শান্তিনিকেতন যাবে স্থির হল—আমাদের বয়স তখন ষোল সতের হবে। সে তার বাক্সভর্তি করে বেনারসী আর জরির ফুল তোলা শাড়ী নিয়েছে। যত তাকে বলি ওখানে কেউ ওসব পরে না, সে বিশ্বাস করেনা। বলে অত লোকজন বেড়াতে আসবে ওখানেই যদি ভালো কাপড় না পরি তো কোথায় পরব? কিন্তু সে সেখানে পৌছেই বুঝতে পারল সে আবহাওয়ায় এই জমকালো সাজ চলবে না—তার বেনারসী পরা হল না।

কুটিরবাসী কবিতাটিতে আছে—

যা কিছু আসে যায় মাটির পরে
পরশ লাগে তার তোমার ঘরে
ঘাসের কাঁপা লাগে পাতার দোতা
শরতে কাশবনে তুফান তোলা—

এই আশ্রমের কুটিরগুলি যেন প্রকৃতিরই অঙ্গ ; মানুষও প্রকৃতিরই অংশ সে কথা সে যত ভোলে যত প্রকৃতি থেকে দূরে যায় তত তার জীবনে কৃত্রিমতা। মাটির কাছাকাছি মানুষকে নিয়ে আসবার আয়োজন ছিল এই আশ্রমে—ধনের দিকে তার স্পৃহা কমিয়ে, লোভ কমিয়ে ঈর্ষা দ্বেষের জটিলতা মুক্ত সহজ সুস্থ জীবন, যে জীবন, "উচ্চপানে সদা মিলিয়া আঁখি নিজেরে পলে পলে," ফাঁকি দেবে না সেই জীবনে সে উন্নীত হবে। এই কুটির যেন মানুষের ও প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম। মানুষ তো পথিক। কিন্তু তার সেই পথিকবৃত্তির কথা সে ভুলে যায়। যখন সে ধন মান সম্পদ আহরণ করতেই ব্যস্ত হয়ে পড়ে. ইমারত গড়তে তার যত আগ্রহ বাড়ে তত তার সরল জীবনের যথার্থ মূল্যবোধগুলি বিপর্যস্ত হয়ে যায়। তাই ঐ তালধ্বজকে লক্ষ্য করে বলছেন—

"তোমার বাসাখানি আঁটিয়া মুঠি,
চাহেনা আকড়িতে কালের ঝুটি,
দেখি যে পথিকের মতই তাকে।
থাকা ও না থাকার সীমায় থাকে।
ফুলের মত ও যে পাতার মত,
যখন যাবে রেখে যাবেনা ক্ষত।"

কিন্তু কোনো বড় উদ্যোগ তো কারু একলার ব্যাপার নয়—আশ্রমের যে ছবিটি রবীন্দ্রনাথের কল্পনায় ছিল—স্বভাবতই তা অন্যের মনে স্পষ্ট ছিল না তাই ঐ আশ্রমের মাঝখানেই রাজপ্রাসাদ উঠল, রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশাতেই—একখানা ঘরের 'উদয়ন গৃহ' রথীবাবুর হাতে ক্রমেই ইন্দ্রপুরী হয়ে উঠল—একটি একটি করে অংশ একেক সময় তৈরী হয়ে হয়ে বাড়িটা যেন নির্মিত নয় বিকশিত হতে লাগল। দেশীয় স্থাপত্যের অনুকরণে গড়া অজন্তার ভঙ্গীতে চিহ্নিত এই প্রাসাদোপম গৃহ রূপদর্শী জনের নয়ন নন্দন। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য এ বাড়িতে থাকতেই চাইতেন না। পাশের কোর্ণাক ছাড়াও আরও ছোট ছোট দু'একটি বাড়ি হয়েছিল তারি কোনো একটিতে থাকতেন, বিশেষ করে মাটির বাড়ি শ্যামলী তাঁর প্রিয় ছিল। দোতলার উপর একখানি ঘর ও বারান্দা নিয়ে উদীচি ছিল তাঁর শেষ আশ্রয়—এই সমস্ত এলাকাটাকে বলা হয় 'উত্তরায়ণ' 'রবি' নামের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এই নামকরণ।

উদয়ন গৃহ এত বিরাট হবার পরে অন্যান্য বিত্তশালীরাও বড় বড় বাড়ি তৈরী করতে সুরু করলেন আশ্রমেই,—এমনই একটি বাড়ির নাম কেউ রেখেছিলেন 'দক্ষিণায়ন।' শুনেছি সেকথার উল্লেখ করে কেউ তাঁকে বলেছিলেন, "গুরুদেব, অমুক তার বাড়ির নাম দক্ষিণায়ন রেখেছে, দেখুন কি স্পর্দ্ধা।" উনি নাকি এর উত্তরে বলেছিলেন, ও বাড়ির নাম আসলে "প্রত্যুত্তরায়ণ।" কথাটা আমার কানে শোনা নয় তবে ভাবটা পরিচিত। এমন কথা এমন দুঃখবিদ্ধ পরিহাস কেবল তিনিই করতে পারতেন। উদীচি বাড়িটা তৈরী হবার আগে মাঝে মাঝে স্কুলের আপিস বাড়ির তিনতলায় টিনে ছাওয়া বারান্দা ও একখানা ঘরে বনমালীকে নিয়ে সংসার পাততেন। এই সময়ের একটা ঘটনার উল্লেখ করব। ঘটনাটি ব্যক্তিগত ও পারিবারিক হলেও মনে হয় রবীন্দ্রনাথকে জানার জন্য এটি লিখে রাখার দরকার। তাছাড়া মহাপুরুষদের আত্মীয়-অনাত্মীয়তে ভেদ নেই—তাঁরা সকলের এবং সকলেরই তাঁদের সম্বন্ধে জানবার অধিকার আছে।

সম্ভবত সেটা উনিশ শ' ছত্রিশ সাঁইত্রিশ সাল কবি সবে ইরিসিপ্লাস অসুখ থেকে উঠেছেন—দেখা করতে গেলাম শান্তিনিকেতনে।

উত্তরায়ণে প্রতিমাদেবী আমায় বললেন—দেখো মৈত্রেয়ী, বাবা ম'শায় তো এই শরীরে সেই স্কুলের তিন তলায় গিয়ে রয়েছেন। কোনো কথা শুনবেন না—কিছুতে আমাদের কাছে থাকবেন না—এই গরমে ছাতের উপর ঘর তাতে টিনের তাপ আসে—তাছাড়া এতদূর থেকে ব্যবস্থা করাও তো কঠিন—কোনো একটা বিপদে পড়লে তো আমারই দোষ হবে। এমন কি যখন এখানে থাকবেন তখনও আমাদের কাছে থাকবেন না—এরকম করলে আমি কি করে দেখা শোনা করি বল? তোমাদের কথা তবু শোনেন—দেখ না চেষ্টা করে এখানে আনতে পার কি না।

আমি তো মনে মনে কৃতসঙ্কল্প হয়ে গেলাম—যে করে হোক ওঁকে আনতেই হবে।

স্কুলে তিনতলায় উঠে দেখি ঘর একেবারে আগুন। আমি সেকথা নিয়ে আক্ষেপ করাতে উনি যেন ভারি আশ্চর্য হয়ে বললেন, "বৈশাখের দুপুর বেলায় কি জ্যোৎস্না আশা কর?" চারিদিকের দরজা জানালা খোলা—রৌদ্রতাপ ঝাঁ ঝাঁ করছে। প্রতিমাদির কথাগুলোর তাৎপর্য খুবই, ধীরে ধীরে তাই আমার বক্তব্যগুলো বলতে সুরু করলাম। এবং এরকম একা থাকা যে কতদূর ভুল তাও বলতে লাগলাম। যেদিন ইরিসিপ্লাস রোগে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন সেদিন কাছে সুধাকান্ত না থাকলে, বা কোণার্কে না থেকে এখানে থাকলে কি হত তাও

মনে করিয়ে দিলাম। কবি আমার সদুপদেশ নিরুত্তরে শুনেছিলেন। তারপর বল্লেন, একা থাকতে তাঁর কোনই অসুবিধা হয় না। এবং কাউকেই তাঁর দরকার নেই। তেমন দরকার হলে না হয় সুধাকান্তকে খবর দিয়েই মূর্ছা যাবেন। আমি কিন্তু তখন হাসিঠাট্টা দিয়ে ব্যাপারটা উড়িয়ে দিতে রাজী নই। আমার প্রতিজ্ঞা ওঁকে উত্তরায়ণে নিয়ে যাবই। প্রতিমাদির কাছে কৃতিত্বটা দেখাতেই হবে। এদিকে আমি যত বলি এভাবে একা থাকা বিপজ্জনক উনি নির্বিকারে মুখে বলেন, বিপদের চিহ্ন মাত্র দেখতে পাচ্ছেন না। আমার যুক্তিসঙ্গত কথা এভাবে উপেক্ষা করায় আমি কিছু ক্ষুণ্ন কিছু রাগত ভাবেই আমার বক্তব্য জোরাল করবার জন্য বল্লাম, "কিন্তু প্রতিমাদির শরীর খারাপ, রথীদারও, ওঁরা কি করে এখানে এসে আপনার দেখাশুনা করবেন—এটা ওঁদের প্রতি অত্যন্ত unfair হচ্ছে।" এইবার তাঁর শান্তভাবটা অতর্হিত হল, টেবিলের উপর কলমটা ফেলে দিয়ে উনি চেয়ারে হেলান দিয়ে সোজা হয়ে বসলেন। তারপর তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে বল্লেন, 'unfair! তুমি মনে কর আমি unfair হয়েছি? ওরা আমার প্রতি unfair হয় নি?' আমায় বিস্ময়াভিভূত দেখে উনি বলতে লাগলেন, বলতে পার আমাব আশ্রমেব মধ্যে ওরা রাজবাড়ি বানাল কেন? ওরা যদি কলকাতায় বা পতিসরে বানাত আমার বলার কিছু ছিল না, কিন্তু আমার আশ্রমে কেন? এখানে আমি একটা পরীক্ষা কবছি আমার আদর্শে বিশ্বাস করে, আমার ডাকে সাড়া দিয়ে দেশ-বিদেশ থেকে কত জ্ঞানী-গুণী এসেছেন তাঁরা মাটির ঘরে ছোট ছোট বাড়িতে থেকেছেন, আর সেইখানেই কিনা প্রাসাদ তৈরী করল ওরা? তারপর আবার গোলাপ বাগান! ও বাড়িতে আমি কখনো থাকব না—সেই জন্যই আমি শ্যামলীতে মাটিব বাড়িতে থাকতে চাই আর ইচ্ছে করে মুড়ি টুড়ি খেয়ে থাকি এদেশের গরীব মানুষের যা খাদ্য।

আমি স্থির করলাম একথা আমি রথীবাবু ও প্রতিমাদেবীকে বলব। সন্ধ্যাবেলা যখন উত্তরায়ণ থেকে গাড়ি এল আমায় নিতে—উনি পরিহাস করে বললেন—'রাজবাড়ি থেকে রথ এসেছে বাজকন্যার জন্য'—পরের দিন সকালে উদয়ন গৃহে পশ্চিমের সাজান বারান্দায় খাবার টেবিলে দামী দামী খাদ্য বস্তু সাজান। চিরদিনের প্রত্যাশিত এবং বাঞ্ছিত এই আতিথ্য সেইদিনই প্রথম আমার অরুচিকর ঠেকল। আমি রথীন্দ্রনাথ ও প্রতিমাদেবীকে আমাব বক্তব্য বল্লাম। রথীন্দ্রনাথ খুবই ক্ষুণ্ন হলেন, "দেখো বাবা কি রকম ভুল বোঝেন। ওঁর জন্যই তো সব। আমাদের কি আছে বল? ওঁর কাছেই দেশ-বিদেশ থেকে মান্যগন্য মানুষ আসেন, আমরা আতিথ্যের ব্যবস্থা রাখি। তাছাড়া গোলাপ বাগান? আশাকরি এ বিষয়েও তুমি

ওঁর সঙ্গে একমত নয়—যিনি মানুষের জীবনে অপ্রয়োজনীয়ের প্রয়োজনের কথা এত বলে এলেন, সেই কবিই কি গোলাপ বাগানে আপত্তি করছেন ?”

সেদিন কিছু পরে আমি যথাস্থানে রথীদার বক্তব্য পেশ করলাম। পুত্রের বক্তব্য শুনে তিনি আমার দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, “তুমি এর উত্তর দিতে পারনি ? তাহলে এর উত্তর তোমার ভিতর নেই ? তাহলে তুমি যখন আমার কাছে আস তখন বড় বাড়িতে থাকবে বলে আস ? আমি তো জানি যারা আমার কাছে আসে তারা আমি গাছতলাতে থাকলেও আসত। এদিকে এরাই আবার গান্ধীজির আশ্রম থেকে বেড়িয়ে এসে আমাকে সেখানকার অনাড়ম্বর ব্যবস্থার মহিমা শোনালে—কোনো ফার্নিচার পর্যন্ত নেই, প্যাকিং কেসের বাক্সতে বসা হয়—কি সিমপ্লিসিটি ! এদিকে আমার আশ্রমে আমার আদর্শকে ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দিলে। আর গোলাপ বাগান ? হাঁ হাঁ জানি গোলাপ বাগানের প্রয়োজনীয়তা, তা সেটা লাইব্রেরীর সামনে করলে না কেন ? যেখানে সেটা সকলের হত। আমার বাড়িতে কেন ব্যক্তিগত সম্পত্তির চিহ্ন দেওয়া ? আমার যা আছে তা সবার।··· চুপ করে কেন ? তুমিও ঐদলে নাকি ?”

আমি কখনো এ ব্যাপারটা এভাবে দেখিনি তাই খুবই বিস্মিত হয়েছিলাম —আমি বল্লাম, “এত যদি আপনার আপত্তি আপনি জোর করে বলেন নি কেন ? আপনারই তো আশ্রম—গান্ধীজি কি তাঁর আশ্রমে মাছ রান্না করতে দেবেন ?”

“আমি বলিনি কি করে জানলে ? তাছাড়া আমার যা বলার আমি কি গত পঞ্চাশ বছর ধরে ক্রমাগত বলছি না ? তোমরা যদি শুনতে না পাও সে কি আমার দোষ ? আমার তো জবরদস্তির ভাষা নেই।”

এরপরে আর বলার কিছু ছিল না—সন্ধ্যা হয়ে এল—আমরা বাইরে বারান্দায় এসে বসলাম—সদ্য ধোয়া মেঝে থেকে তপ্ত বাষ্প উঠছিল। মাথার উপর মশার ঝাঁক ভন ভন করছিল—সেটা ছিল এক দম বন্ধকরা গ্রীষ্ম সন্ধ্যা। তিনি চুপ করে স্থির হয়ে বসেছিলেন—জানি যতই অতিষ্ঠ করুক মশা মাছি বা গরম, ইনি স্থির হয়ে বসলে নড়ায় কার সাধ্য ?

অন্ধকারে চুপ করে বসে বসে আমার নানা কথা মনে হতে লাগল—উনি কি এক আদর্শবাদী যে আদর্শ এযুগে অচল ? উনি কি এক অসম্ভব মরীচিকার পিছনে ছুটেছেন বা যুগবিরোধী কাজ করতে চাইছেন ? এসব বিচার করবার আমার সাধ্য ছিল না—আমি শুধু ভাবছিলাম আগ্রার দুর্গশিখরে বসে বন্দী সাজাহান প্রস্তরে খচিত দুর্গস্তম্ভে মাণিক্যের মধ্যে তাজমহলের ছায়া দেখতেন সেই কাহিনীটা। যদি

তিনি দেখতেন তাঁর তাজমহল থেকে একটি একটি করে পাথর খসে যমুনায় পড়ে যাচ্ছে তাহলে তাঁর যেমন মনে হত এঁরও কি তেমনি হচ্ছে ?

উনি আপন মনে গুণ গুণ করে গাইছিলেন, "আমারে তুমি অশেষ করেছ এমনি লীলা তব।" ভাবতে লাগলাম ইনি তো বাদশা নন, ইনি কবি—এঁর হাতে শক্তি আছে পরাজয়কে জয়ে পরিণত করবার, লোকসানকে লাভে—এই মুহূর্তে উনি হয়ত ঠিক তাই করছেন।

সেদিন বিদায় নেবার সময় তিনি বললেন, "মিছিমিছি তোমায় ভৎর্সনা করলাম, কিছু মনে করো না লক্ষ্মী মেয়ে, দেখো তুমি কাছে থাকতে কি রাগ দেখাতে পাশের বাড়ির লোক ডাকতে যাব ?" আজো যখন শান্তিনিকেতনে বড় বড় ইমারত দপ্তরখানা ইত্যাদি দেখি সেই সন্ধ্যাটা আমার মনে পড়ে। আর এই উপমাটা কিছুতেই মন থেকে ছাড়তে চায় না। আমি যেন শুনতে পাই একটি একটি করে পাথর খসে পড়ছে। কিন্তু এটা তো ভুল। পাথর তো খসে নি বরং পাকা হয়েছে। তবু গড়াটাকেই ভাঙ্গা বলে মনে করবার মনোবিকার আমায় ছাড়তে চায় না।

জাপান ও রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্র শতবার্ষিকী উৎসব উপলক্ষে চীন ও জাপানে রবীন্দ্ররচনায় ও রবীন্দ্রবাণীর পুনঃপ্রচারের কতটা চেষ্টা হয়েছে তা ঐ সব দেশের উৎসবগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ থেকে সংগ্রহ করা কঠিন। বস্তুত সমগ্র এশিয়ার আত্মপ্রতিষ্ঠায় রবীন্দ্রনাথের দান কত গভীর ও ব্যাপক তা সম্ভবত বর্তমান যুগের মানুষদের জানা নেই। যখন সমগ্র এশিয়া সুসভ্য ইয়োরোপের কাছে অসভ্য বর্বর বলে নিন্দিত এবং এশিয়াও যখন সর্বব্যাপারে ইয়োরোপের অন্ধ অনুকরণে নিজের সমস্ত শিক্ষা সংস্কৃতি সুচারু শিল্পকলা বিদেশের মোহগ্রস্ত হয়ে বিসর্জন দিতে উদ্যত তখন রবীন্দ্রনাথ জাপানের শিল্পকলায়, সামাজিক বিধিবিধানের শান্ত সৌন্দর্য ও ধ্যানের শক্তি, চীনেব আধ্যাত্মিক জ্ঞান শিল্পকলা ও রুচির বিশেষ সৌন্দর্যের খবর ইয়োরোপে আমেরিকায় প্রচার করে বেড়িয়েছেন। তাঁর অতুলনীয় ভাষাব মধ্য দিয়ে তিনি পাশ্চাত্য ও এশীয় সভ্যতার তুলনামূলক সমালোচনা কবে এশীয় সভ্যতাব যথার্থ স্বরূপ জগতেব সামনে প্রকাশ করে তার লজ্জা নিবারণ কবেছেন, তাব আত্মবিশ্বাস উদ্বুদ্ধ কবে তুলেছেন। তিনিই বর্তমানকালে প্রথম ব্যক্তি যিনি এশীয় পোশাক পরে স্বচ্ছন্দে ইয়োরোপের কৌতূহলী দৃষ্টির সম্মুখে বিচরণ কবেছেন। কিছুদিন পূর্বে একজন জাপানী লেখক আমায় বলেছিলেন যে, রবীন্দ্রনাথই জাপানের মধ্যে নূতন এক আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তুলেছিলেন যখন তিনি তাঁর আপাদলম্বিত ভারতীয় পোশাকে জাপানের পথে যাত্রা করেছিলেন···তাব পরিচ্ছদ, আচার-ব্যবহার, অতুলনীয় ভঙ্গী, বচন, চিন্তা ও মনন সবের ভিতর দিয়েই এই একটি কথা ঘোষিত হচ্ছিল যে, সভ্য হবার জন্য ইয়োরোপীয় হবার প্রয়োজন নেই।

অন্ধ অনুকরণের বিপদ স্মরণ করে ১৯১৬ সালে জাপানে রবীন্দ্রনাথ তাঁর সাবধানবাণী উচ্চারণ করেন। ১৯২৪ সালেও রবীন্দ্রনাথ জাপানে বহু অমূল্য উপদেশ দিয়েছিলেন—যে সব ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন তার সমস্তই ফলেছিল। আর একবার দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রারম্ভে নগুচির সঙ্গে তাঁর বিতর্কেও রবীন্দ্রনাথ জাপানের সাম্রাজ্যবাদ ও চীনের প্রতি আক্রমণের মধ্যে মানবধর্মের বিচ্যুতির কথা স্মরণ করিয়ে দেন।

জাপানের সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ অপ্রিয় সত্য বলেছেন যথার্থ হিতাকাঙ্ক্ষীর মত কিন্তু তাঁর আমেরিকার বক্তৃতাগুলির মধ্যে যখনই জাপানের সম্বন্ধে উল্লেখ করেছেন তখনই তাতে আত্মীয়ের প্রতি মমতা প্রকাশ পেয়েছে। আমেরিকায় ইমিগ্রেশন

আইন যখন প্রবর্তন হল তখন সমগ্র এশিয়ার জন্য রবীন্দ্রনাথ এই আইনের বিরোধিতা করেন। ঐ আইনে জাপানী ছাত্ররা যে অসুবিধা ভোগ করছিল, রবীন্দ্রনাথের প্রীতিপূর্ণ কণ্ঠস্বর ও সৌহার্দ্যে তাতে শান্তির প্রলেপ দিয়েছিল।

১৯২৪ সালে রবীন্দ্রনাথের জাপান ভ্রমণকালে শ্রীযুক্ত এণ্ড্রুজের লিখিত একটি বর্ণনা থেকে উদ্ধৃত করছি—মিৎসুরা তোয়ামা জাপানের মহাসম্মানিত ব্যক্তি, তাঁর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাতের বর্ণনা এখানে আছে—

'দুই মাননীয় ব্যক্তি একটুক্ষণ নীরবে দাঁড়ালেন। তারপর মিৎসুরা তোয়ামা জাপানী প্রথায় বারবার নত হয়ে গভীর নমস্কার জানালেন এবং ভারতীয় প্রথায় করজোড়ে নমস্কার করলেন। তাঁর চক্ষু আনত, চক্ষু যেন প্রার্থনারত।

জাপান ও ভারতের এই দুই মহাপ্রাজ্ঞর মিলনের সময়ে সমগ্র দর্শকবৃন্দের ওপরে এক গভীর নীরবতা নেমে আসে যেন তাঁরা এক উপাসনায় যোগ দিচ্ছেন। ইতিপূর্বে জাপানে একটি বক্তৃতায় রবীন্দ্রনাথ এশিয়া-বিরোধী ইমিগ্রেশন আইন সম্বন্ধে উল্লেখ করেন—ঐ কথাটি তখন জাপানে ও সমগ্র পূর্বদেশে একটি বিশেষ গুরুতর চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল, তাই সকলে আশা করেছিল কবি পুনর্বার সেই বিষয়ে কিছু বলবেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এবার উচ্চতরভাবে বলতে সুরু করলেন। তিনি জাপানকে তাঁর আপন আত্মার সন্ধান করতে স্মরণ করালেন। সভাপতি তাঁর প্রারম্ভিক ভাষণে বলেছিলেন:

'আপনার উপস্থিতি আজ আমাদের আনন্দের বিষয়, কারণ আপনার শিক্ষা আমাদের একটু থামতে, চিন্তা করতে বলেছে। আপনার শিক্ষা আমাদের অন্তরের গভীরে প্রবেশ করেছে। পুরাকালে ভারতবর্ষ আর একবার আমাদের এরকম শিখিয়েছিল। আপনার ভারতবর্ষ আবারও তেমনি শিক্ষা দিতে পারে—আপনাদের দেশ থেকে আরও দার্শনিক আমাদের দেশে পাঠান, আমরা আপনাদের কাছে চিরঋণী থাকব।'

ভাষণের উত্তরে রবীন্দ্রনাথ বলেন—

'আট বছর পূর্বে যখন আমি জাপানে আসি তখন আপনাদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমার দুশ্চিন্তা ছিল। আপনাদের মধ্যে পাশ্চাত্য সভ্যতার বহিরঙ্গের সম্পূর্ণ অনুকরণ, আধ্যাত্মিকতার অভাব, আমার ভাল লাগে নি। আজ আমি অনেক পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছি। আপনারা অনেক দূর অগ্রসর হয়েছেন—এতে আমার গভীর আনন্দবোধ হচ্ছে। আপনারা আমাকে ও আমাদের দেশ থেকে প্রাজ্ঞ-ব্যক্তিদের আহ্বান জানিয়েছেন। কিন্তু আপনাদের দেশেই বহু প্রাজ্ঞজন আছেন ইতিপূর্বে পাশ্চাত্যের অনুকরণের মোহে তাঁদের যেমন বহুবার অবজ্ঞা করেছিলেন

আর সেরকম করবেন না। তাঁরা যেন তাঁদের আলো লুকিয়ে না ফেলেন। আপনাদের একথা স্মরণ রাখা কর্তব্য যে আপনাদের অন্তরের জাগরণ, একমাত্র যার মধ্যেই যথার্থ আনন্দ লাভ করা যায়, তা নিজেদের মধ্যেই উদ্বোধিত করা আবশ্যক, তা বাহির থেকে আসতে পারে না। তা পশ্চিম থেকে বা অন্য কোনও দিক থেকেই আসতে পারে না তা কেবল আপন অন্তরের গভীর থেকে, স্বকীয় আস্থা থেকে, উদ্বুদ্ধ হতে পারে। আজকের জীবনের সমস্যা কেবল পার্থিব পদার্থ কেবল সম্পদ সংগ্রহে নয়, যথার্থ আনন্দ লাভে। এই আনন্দ অন্তরের থেকেই আসে। প্রাচ্যের দর্শনের এই অন্তরস্থ ভাবনাই প্রধান ভিত্তি। আত্মার ধর্মের কথা যা এশিয়া চিরদিন পবিত্র বলে জেনেছে আজ তাতে আপনারা লজ্জা পাবেন না, নিজেদের আদর্শের বাণীতে আজ লজ্জাবোধ করবেন না। আজ আপনাদের আত্ম-মুক্তির প্রয়োজন, যা অন্তরের উৎস থেকে উত্থিত সত্য। যা আনন্দকে নষ্ট করে সেই তুচ্ছ ক্ষণস্থায়ী সুখের আবর্জনা থেকে মুক্তি।'

তারপরে কবি নূতন যুগের বাণী ধনী ও নির্ধনের দ্বন্দ্বের কথা অতি স্পষ্ট করে বলেছিলেন :

'যারা আমাদের সেবা করেছে তাদের আজ আমাদের সেবা করতে হবে। এই নিত্যধর্মকে সহজে অগ্রাহ্য করা যায় না। দরিদ্রেরা এতদিন আমাদের সেবা করেছে এখন আমাদের তাদের সেবা করার সময় এসেছে। আমার জীবনের এই একটি উচ্চাশা আছে যে, যে উপায়ে পারি তাদের প্রতিদান দেব—তাদের জীবন সৌন্দর্যে আলোকিত করে দেব—তাদের অস্তিত্বের মধ্যে আনন্দের আলো নিয়ে আসব। যদি জীবনের শ্রেষ্ঠ জিনিসগুলি মুষ্টিমেয় কয়েকজনেরই কেবল লভ্য হয়, তাহলে সভ্যতার পুষ্টি হয় না এবং সে যুগই নষ্ট হয়ে যায়। দরিদ্রের প্রতি অবিচার দিন দিন বাড়তে বাড়তে আজ একেবারে চূড়ান্তে এসে পৌঁছেছে। তাই সর্বত্রই অশান্তি। সমস্ত জগতে যেন দুই প্রতিপক্ষে বিভক্ত হয়ে গেছে, ধনী ও নির্ধন, সন্তুষ্ট ও অসন্তুষ্ট, যারা পরিশ্রম করে ও যারা বিশ্রামেই থাকে। এই দুই শ্রেণীতে যতদিন এমন বিভাগ থাকবে ততদিন শান্তির আশা নেই।

আপনারা আমাকে আমাদের দেশের প্রাজ্ঞব্যক্তিদের এদেশে পাঠাতে অনুরোধ করেছেন, কিন্তু প্রাজ্ঞব্যক্তির প্রাচুর্য নেই। আমার ইচ্ছা করে যে, যদি আমার দেশের দরিদ্রদের, দরিদ্র ভারতীয়দের এখানে আনতাম—ভারতেও যদি তোমাদের দরিদ্র জাপানীদের পাঠাতে পারতে তার ফল শুভ হত। কারণ যদি সমস্ত বিভিন্ন দেশের দরিদ্ররা পরস্পরকে জানতে পারত তাহলেই দেশে দেশে সত্য পরিচয় সবেদনায় প্রকাশ দেখা যেত। শিশু ও দরিদ্রের ভিতর দিয়েই ঈশ্বরের রাজত্ব পৃথিবীতে আসে।'

এই বক্তৃতার শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে জাপানের সর্বশ্রেষ্ঠ ধনীরা উপস্থিত ছিলেন। ১৯২৪ সালে কবির বক্তৃতাবলী জাপান অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে গ্রহণ করেছিল। এই সময়ে আমেরিকা থেকে বহিষ্কৃত হবার ফলে জাপানের অভিমানে দারুণ আঘাত লেগেছিল—সেই দুঃখের মুহূর্তে তারা কবির বাণীর তাৎপর্য বুঝতে পারে—যদিও ১৯১৬ সালে তাঁর বাণী পাশ্চাত্য সভ্যতার মোহগ্রস্ত আধুনিক জাপান প্রত্যাখ্যান করেছিল। আধ্যাত্মিকতা বস্তুতন্ত্রবিমুখতাকে তারা 'পরাজিত জাতির কবি'র বাণী বলে ঘোষণা করেছিল। তারই উত্তরে কবি তাঁর সেই আশ্চর্য কবিতা 'Song of the Defeated' লেখেন (M. R. Aug. 1924)। এবারে দুঃখের অভিঘাতে জাপানের মোহ ভঙ্গ হয়েছিল।

টকিওতে রবীন্দ্র পরিষদ বা টেগোর সোসাইটি স্থাপিত হলে ১৯২৬ সালে কাউনেটস মেটক্সা (Metaxa) টকিওর দি ইয়ং ঈস্ট কাগজে লিখেছিলেন:

'রবীন্দ্রনাথ দূরপ্রাচ্যবাসীদের (Far East) আহ্বান করে বলেছিলেন যে, যে সব দেশের সভ্যতা একই কেন্দ্র থেকে উত্থিত তাদের মধ্যে চিন্তার মিলন প্রয়োজন—তাঁর সেই আহ্বানের ফলেই এই ঠাকুর সোসাইটি স্থাপিত হল। বহু পুরাকাল থেকে প্রাচ্যদেশের বিভিন্ন জাতির মধ্যেই একই ঋষিদের প্রবর্তিত দর্শন, ধর্ম ও প্রকৃতি সম্বন্ধে গূঢ় জ্ঞান যা কেবলমাত্র বস্তুবিজ্ঞানের চেয়ে গভীরতর সে সমস্ত তত্ত্ব প্রচলিত হয়ে এসেছে। এই সমস্ত বিভিন্ন জাতি পৃথক পৃথক অবস্থার মধ্যে থাকার জন্য তাদের সভ্যতাও বিচিত্র হয়েছে কিন্তু মূলত তা একই। এখন চীন, ভারত, কোরিয়া, জাপান এরা যেন একই বনস্পতির শাখা-প্রশাখা।'

রবীন্দ্রনাথের এই আহ্বানে জাপানে তাঁরই নামে যে সমিতি স্থাপিত হল তাদের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যা বলা হয়েছিল তা প্যান এশিয়া বা সমগ্র এশিয়া এক হক এই রাজনৈতিক ভাব থেকে পৃথক। পশ্চিম এশিয়ার অভ্যুত্থানের সঙ্গে এশিয়াকে সঙ্ঘবদ্ধ করবার যে রাজনৈতিক প্রচেষ্টা ঠাকুর সোসাইটি ..কে সে রাজনৈতিক চিন্তা দূর করা হয়েছে—রাজনীতি কখনও ব্যক্তিগত, কখনও দলগত স্বার্থে চালিত তাই তা অত্যন্তই বহিরঙ্গ। তাই আমাদের ঠাকুর সোসাইটি রাজনীতি বাদ দিয়ে পূর্ব এশিয়ার আদর্শ ও নৈতিক মান সম্বন্ধেই প্রধান মনোযোগ দিচ্ছে। এইজন্য প্রাচীনকালের প্রজ্ঞা যা এক সময় পূর্বদেশীয়দের জীবনের মূল ছিল তাকে উদ্বোধিত করা প্রয়োজন এবং নিজেদের জাতীয় সম্পদকে পূর্ণভাবে লাভ করলে তবেই পাশ্চাত্য সভ্যতার সম্পদ লাভ করতে পারি—অন্ধভাবে তাদের অনুকরণ করে নয়—কিন্তু যথার্থ গুণ গ্রহণ করে যা ক্ষতিকর তা প্রত্যাখ্যান করতে পারি।...

এখন আমাদের মধ্যে এমন একজন মানুষ এসেছেন যাঁকে আমরা আদর্শরূপে

গ্রহণ করতে পারি—রবীন্দ্রনাথ যিনি পূর্ব দেশের অগ্রগণ্য প্রভু ও জগতের শ্রেষ্ঠ কবি। একজন পাশ্চাত্য দোভাষী আমাকে বলেছেন, 'ভবিষ্যতে মানুষ ঠাকুরের কথা তেমনি বলবে, যেমন হোমারের কথা বলে এবং যেমন হোমার পড়বার জন্য গ্রীক ভাষা শেখে তেমনি লোক ঠাকুরের লেখা পড়বার জন্য বাংলা শিখবে।...

'পূর্ব ও পশ্চিমের মিলন সম্ভব কিন্তু সে মিলন পরস্পর সমান ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে।' জাপানের ঠাকুর সোসাইটির এই প্রতিজ্ঞা থেকে বোঝা যায় সমস্ত পূর্ব এশিয়ায় রবীন্দ্রনাথের বাণী কতখানি আত্মমর্যাদা ফিরিয়ে আনতে সমর্থ হয়েছিল।

জাপান প্রসঙ্গে ১৯৩২ সালে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন:

'নূতন যুগে মানুষের নবজাগ্রত চৈতন্যকে অভ্যর্থনা করবার ইচ্ছায় একদিন পূর্ব এশিয়ায় বেরিয়ে পড়েছিলুম। তখন এশিয়ার প্রাচ্যতম আকাশে জাপানের জয়-পতাকা উড়ছে। লঘু করে দিয়েছে এশিয়ার অবসাদছায়াকে। আনন্দ পেলুম মনে ভয়ও হল। দেখলুম জাপান ইয়োরোপের অস্ত্র আয়ত্ত করে একদিকে নিরাপদ হয়েছে তেমনি অন্যদিকে গভীরতর আপদের কারণ ঘটল। তার রক্তে প্রবেশ করেছে ইয়োরোপের মারী যাকে বলে ইম্পীরিয়ালিজ্‌ম। সে নিজের চারিদিকে মথিত করে তুলেছে বিদ্বেষ।... কী করে মিলিত হয় জাপান তা শিখল না, কী করে মারতে হয় ইয়োরোপের কাছ থেকে সেই শিক্ষাতে সে হাত পাকিয়ে নিলে। এই মার মাটির নিচে সুড়ঙ্গ খুঁড়ে একদিন এসে ছোবল মারব তারই বুকে।'

আজ আমরা জানি কবির এই ভবিষ্যদ্বাণী দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় শোচনীয়-ভাবে সত্য হয়েছে—ছোবল পড়েছে হিরোসিমায় নাগাসাকিতে।

চীনে রবীন্দ্র শত বার্ষিকী উৎসব

সারা পৃথিবীজুড়ে রবীন্দ্র শতবার্ষিকী পালিত হয়েছিল। রাজনৈতিক মত পার্থক্যে বিভক্ত এই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সকলের কাছেই গ্রহণ যোগ্য। হয়ত বা আপন মনের মাধুরী মিশায়ে এরা অনেকেই তাঁকে রচনা করেছেন—বিপুল রবীন্দ্র সাহিত্যের কোনো কোনো ভাব এক এক দেশে বেশী মর্যাদা পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথ বহু মতের বহু পথের পথিককে পথ দেখাতে পেরেছেন। কারণ সত্যের বিচিত্র মুখ তাঁর চিন্তায় প্রতিফলিত। রবীন্দ্র চিন্তার মধ্যে বিরুদ্ধ ভাবের সমাবেশ আছে। তা চিত্তের চপলতায় নয়, সত্যের বহুমুখীনতায়। রবীন্দ্রচিন্তার মধ্যে এমন বহুভাবের সমন্বয় হয়েছে যার এক একটিকে অবলম্বন করে মতদ্বৈধ ও বিতর্কের শেষ নেই। অথচ তাঁর চিন্তায় তা সমন্বিত সুবিন্যস্ত। জীবনকে দূর থেকে দেখবার, নিজের রুচি অভিরুচি স্বার্থ দ্বন্দ্ব থেকে সরিয়ে রেখে দেখবার ক্ষমতাই তাঁকে মতের গর্তে বদ্ধ করতে পারে নি। তিনি উদার মুক্ত ঊর্দ্ধ আকাশের মত নিরাসক্ত দূরত্বে থেকে মানব জীবনের বিচিত্র সমস্যার রূপ দেখেছেন—তাঁর দৃষ্টিতে তাই বহু বিরুদ্ধ ভাবের নদী মহাভাব সমুদ্রে মিলেছে।

১৯৫২ সালে চীন ভারত বৈরী যে ভয়াবহ আকার ধারণ করল কে ভাবতে পারে ১৯৫১ সালে সেই চীনে রবীন্দ্রজয়ন্তী উদ্‌যাপিত হয়েছে? রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় সেহ তাঁর এক মাত্র পরিচয় নয়। তবু আজকের ভারতকে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন করে ভাবা কঠিন। রবীন্দ্রনাথের ভাবে সমগ্র ভারত কতটা ভাবিত সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ থাকলেও দেশে দেশে ভারতের সঙ্গে তিনিই বন্ধন সূত্র। তাই আজ যখন নিকট প্রতিবেশী চীনের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ একটি বিষণ্ণ তিক্ত ও অসুস্থ পরিণতি লাভ করেছে তখন রবীন্দ্র শতাব্দী উৎসবে পঠিত কয়েকটি প্রবন্ধ এখানে উদ্ধৃত করে দিচ্ছি—। প্রবন্ধগুলি খুব সারগর্ভ হয়ত নয়, হয়ত বিশেষ রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা সঙ্কীর্ণ তবু একথা বিশ্বাস করা যায় যে ঘোরতর বিদ্বেষের কালিমার মধ্যে হয়ত বা রবীন্দ্রনাথই একটি সূক্ষ্ম আশার আলোক রেখা!

পিকিং এ রবীন্দ্র শতবার্ষিকী উৎসব—

১৫ই মে পিকিং এর শিক্ষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্র থেকে এক হাজার লোকের কিছু বেশি মানুষ রবীন্দ্রজন্মোৎসব পালনের জন্য সভায় সমবেত হয়েছিল। ঐ সময়ে

পিকিং এ ভারতের মহাকবির জন্মোৎসব উপলক্ষে যে নানা উৎসব হয়েছিল তারই একটি অঙ্গ ছিল ঐ সভা।

সাহিত্য ও শিল্পকেন্দ্রের ফেডারেসানের সহকারী সভাপতি, এবং জন্মোৎসব কমিটির সংগঠক মাও তুন সভার উদ্বোধন করেন এবং প্রফেসার চি-সিন-কিন রবীন্দ্রনাথের জীবন ও কর্ম সম্বন্ধে ভাষণ দেন। এ দুটি বক্তৃতারই পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ দেওয়া হল। ভারতীয় রাষ্ট্রদূত জি পার্থসারথী ঐ সভায় বক্তৃতা করলেন। ভারতীয় দূতাবাসের কর্মচারীবৃন্দ ও পিকিং এ স্থিত ভারতীয় ছাত্রবৃন্দ সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সভাগৃহের সংলগ্ন একটি ঘরে যে প্রদর্শনীটি সাজান হয়েছিল তা দেখতে ভীড় জমে। প্রদর্শনীতে দ্রষ্টব্য ছিল রবীন্দ্রনাথের কাব্যের চীনা অনুবাদ গ্রন্থগুলি। তার মধ্যে শতাব্দী উৎসব উপলক্ষে সদ্য প্রকাশিত বইও ছিল। একদা রবীন্দ্রনাথ তাঁর অংকিত ছবি ও অন্যান্য যে সব উপহার তাঁর চীনা বন্ধুদের দিয়েছিলেন সে গুলোও ছিল। এই সব বস্তুগুলির মধ্যে ভারতে খ্যাতনামা চীনা শিল্পী সু-পি-হুং (Hsu-Pei-Hung) এর ছবির প্রদর্শনী উদ্বোধনের সময় কবি যে ভাষণ দিয়েছিলেন তার পাণ্ডুলিপি ছিল। তা ছাড়া একটি চীনা হাত পাখায় কবির স্বহস্তে খোদাই করা লেখা ছিল। ঐ পাখাটি তিনি মি লান ফ্যং (Mei-Lan-Fang) নামে অপেরা অভিনেতাকে দিয়েছিলেন।......পিকিং রেডিও ও শতাব্দী উৎসবের স্মারক হিসাবে রবীন্দ্র কবিতা আবৃত্তি প্রচার করেছিল—কবির রচনার উপরে কয়েকটি সাহিত্য পত্রের বিশেষ সংখ্যাও প্রকাশিত হয়েছিল। ১৯.৫ সাল থেকেই রবীন্দ্রকাব্যের সঙ্গে চীনের পরিচয় সুরু হয়েছে। তবে মুক্তির পূর্বে (Pre-liberation) যেমন ইংরেজি থেকেই অনুবাদ হয়েছে এখন তা না করে সরাসরি বাংলা থেকেই অনুবাদ হচ্ছে।

ভারতের কবি ও সংস্কৃতি জগতের বিরাট পুরুষ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মদিনের একশত-বর্ষ পূর্তির উৎসব সভার উদ্বোধনী ভাষণ—

বক্তা—মাও তুন

কমরেড ও বন্ধুগণ,

আমরা চীনের রাজধানীবাসী সাহিত্য সেবী ও শিল্পীরা আজ ভারতের কবি রবীন্দ্রনাথের জন্ম বার্ষিকী পালনের জন্য এখানে একত্র হয়েছি। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন লেখক, শিল্পী ও ভারতের গুরু। তিনি বহু কবিতা গান উপন্যাস ছোট গল্প নাটক প্রবন্ধ সাহিত্য সমালোচনা শিক্ষা ধর্ম ও সমাজ সমস্ত বিষয়ে লিখেছেন। তিনি ছবি এঁকেছেন। গানে সুর দিয়েছেন। তিনি ভারতের জনগণকে এক বিপুল ঐশ্বর্যের উত্তরাধিকারী করে গিয়েছেন। ঠাকুরের জীবনকাল ছিল ভারতের

সমাজে এক যুগ পরিবর্তনের কাল। তাঁর রচনার মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে তাঁর শিল্পী মনের বিবেক যা তাঁকে ভারতীয় জনগণের আশা আকাঙ্খা তাদের অত্যাচারের প্রতিরোধের ক্ষমতা সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদ প্রভৃতির বিরুদ্ধে দাঁড়ানর ক্ষমতা সম্বন্ধে চিন্তা করিয়েছে। জাতীয় মুক্তির কথা চিন্তা করিয়েছে। এই জন্যই তাঁর বিপুল জনপ্রিয়তা। চীনের জনগণ সর্বদাই বিভিন্ন দেশের সংস্কৃতির মূল্য দিয়ে থাকে। তারা মনে করে সে সমস্ত সম্পদে সকল মানুষেরই অধিকার আছে।

চল্লিশ বছর পূর্বে ঠাকুরের কাব্য চীনা ভাষায় অনূদিত হয়ে চীন থেকে প্রকাশিত হয়েছে। চীন দেশে পিপলস্ রিপাব্লিক স্থাপিত হবার পর তাঁর কাব্য অনুবাদের ও প্রকাশের দিকে আরো অগ্রসর হওয়া গেছে। ঠাকুরের কাব্য আমাদের ভারতীয় সাহিত্যরূপ বুঝিয়েছে ভারতীয় জনচিত্ত বুঝতে অনেকখানি সাহায্য করেছে। আমাদের আশ্বাস আছে যে আমরা শত বার্ষিকী উৎসব পালনের মধ্যে দিয়ে চীন ও ভারতীয় সংস্কৃতির আদান প্রদান করতে ও পরস্পরের মধ্যে সমঝোতা বাড়িয়ে তুলতে পারব।

এখন আমি সানন্দে কমরেড চি-সি লিন কে ঠাকুরের বিষয়ে তাঁর ভাষণ দিতে অনুরোধ জানাচ্ছি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভারতের মহাকবি

চি-সি-লিন কর্তৃক লিখিত

কমরেড, বন্ধুগণ,

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ভারতের মহাকবি ৭ই মে ১৮৬১ সালে কলকাতায় জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর জীবন এক অসাধারণ অধ্যবসায়ের, ঐশ্বর্যপূর্ণ সাহিত্য ও শিল্প সৃষ্টির আদর্শ। ১৯৪১ সালের অগষ্ট মাসে মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর লেখনীর কোনো বিরাম হয় নাই—তিনি পঞ্চাশখানার উপর কবিতা ও গানের বই লিখেছেন, বারটি উপন্যাস ও বড় গল্প, শতাধিক ছোট গল্প ও কুড়িটি নাটক লিখেছেন। এ ছাড়া তিনি প্রবন্ধ ও বই লিখেছেন বিবিধ বিষয়ে—সাহিত্য, দর্শন ও ধর্ম বিষয়ে স্মৃতিচিত্র, ভ্রমণ বৃত্তান্ত ও চিঠিপত্র প্রভৃতি লিখেছেন। তাঁর ঐশ্বর্যপূর্ণ ও বিচিত্র রচনা আধুনিক ভারতের সাহিত্য ইতিহাসে এক প্রধান স্থান নিয়েছে, ভারতের সাহিত্য জগতে তাঁর দূরপ্রসারী প্রভাব ও বিপুল সম্পদের উত্তরাধিকার রেখে গেছে।

বাল্যকালেই রবীন্দ্রনাথ কবিতা লিখতে সুরু করেন—চৌদ্দ বছর বয়সে তাঁর একটি দীর্ঘ কবিতা পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়। ১৮৮১ সালে তাঁর প্রথম (?) কাব্যগ্রন্থ সন্ধ্যাসঙ্গীত নামে প্রকাশিত হয়। যদিও এই কবিতাগুলিতে তাঁর

ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির কথাই লেখা হয়েছে তথাপি তাঁর প্রতিভার শিখা তখনই দ্যুতি বিকীর্ণ করতে সুরু করেছে।

১৮৯০ সাল থেকে কবির সাহিত্য সৃষ্টির এক বিশেষ যুগ। ঐ সময়ে তিনি অনেক চমৎকার ছোটগল্প লিখেছেন, ঐ গল্পগুলিতে ভারতীয় বিবাহ প্রথার সামন্তযুগীয় ভাব তিনি প্রকাশ করেছেন, ঐ সব গল্পে সর্বদাই দুর্ভাগিনী নারীদের প্রতিই তাঁর গভীর সহৃদয় সহানুভূতি প্রকাশ পেয়েছে। যে সমস্ত চরিত্র এই সব গল্পে বিবৃত হয়েছে তার মধ্যে আমরা একটি ১৮ বছরের বালবিধবার কাহিনী পাই, যে গভীরভাবে এক সন্ন্যাসীকে ভালোবেসেছে, একটি বালিকার কাহিনী পাই, যে বাধ্য হয়ে এক জমিদারকে বিবাহ করে আমরণ দুঃখ ভোগ করেছে। আর এক হতভাগিনীর কাহিনী পাই যে শ্মশানে তার মৃত স্বামীর সঙ্গে দগ্ধ হতে বাধ্য হয়। এই সব চরিত্র পাঠক-মনে গভীর রেখাপাত করে।

বিংশ শতকের গোড়ার দিকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর উপন্যাস দুটি রচনা করেন —গোরা ও নৌকাডুবি। নৌকাডুবিতে ভারতের সামন্তযুগীয় বিবাহ প্রথার নিন্দা আছে। গোরায় ভারতীয় জনগণের দেশভক্তির প্রশংসা ও সাম্রাজ্যবাদের ও বিদেশী শাসকদের অনুগামী ব্যক্তিদের প্রতি বিদ্রূপ আছে।

এই দুটি উপন্যাসের মধ্যে ভারতীয়দের বিদেশী শাসন ও সামাজিক প্রথার বন্ধন এই দুই নির্যাতনের হাত থেকে মুক্তির চেষ্টা রূপ পেয়েছে।

১৯০৫ থেকে ১৯০৮ সালে ভারতের বৃটিশ ভাইসরয় লর্ড কার্জন বাংলাদেশকে দুভাগ করে তাদের 'Divide and Rule' নীতি পালন করতে চেয়েছিল। এই কাজে সারা ভারতের বিশেষত বাংলার জনগণ প্রচণ্ডভাবে বাধা দিয়েছিল। ভারতবাসীরা সাম্রাজ্যবাদবিরোধী এক শক্তিশালী জাতীয় আন্দোলন সুরু করে। রবীন্দ্রনাথও সেই আন্দোলনের প্রবাহে উদ্বেলিত হয়ে ওঠেন। সহকর্মীদের উৎসাহ ও উন্মাদনা তাঁকে বিচলিত করে, অন্যায়ের প্রতি তীব্র ঘৃণায় তিনি দীপ্ত হয়ে ওঠেন। এই সময়ে বহু উচ্ছ্বসিত দেশপ্রেমের কবিতা লেখেন। পরবর্তীকালে যদিও তিনি কর্মক্ষেত্র থেকে সরে যান তবু তাঁর গভীর অনুভবের উত্তাপ ভারতবাসীদের হৃদয়ে প্রবাহিত হতে থাকে।

ক্রিসেণ্ট মুন, গার্ডনার, স্ট্রেবার্ডস ও গীতাঞ্জলি প্রভৃতি কবিতা সংকলনগুলিতে কবি বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দৃশ্য বর্ণনা করতে সুন্দর সুন্দর শব্দ চয়ন করেছেন— শান্ত যামিনী, স্বচ্ছ প্রত্যুষ, নিরবচ্ছিন্ন ধারা, উজ্জ্বল দিন, পুষ্পসম্ভার, প্রজাপতি, অলস মেঘ, প্রবাহিনী নদী, বিচিত্র তারকা, বর্ষণমুখর রাত্রি, শুকনো পাতা—সব সুন্দর চিত্রকল্প মনোমোহন ও প্রাণদায়ী—এই সব সম্বন্ধে তাঁর কবিতায় আমাদের

একেবারে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা জন্মায় আমরা যেন সেই স্থানে পৌছে যাই—আমরা ফুলেব গন্ধ পাই, পাখীর গান শুনি, আমরা কবির মাতৃভূমিকে ভালো না বেসে পারি না। অতএব ভারতীয়েরা যে এই গীতিকবিতাগুলি অত্যন্ত পছন্দ করবে সে আর আশ্চর্য কি ?

ঠাকুর যে পৃথিবীর মধ্যে একজন বিশিষ্ট লেখক বলে গণ্য হয়েছেন এ কোনো আকস্মিক ঘটনা নয়। তার যে শুধু নিজের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে প্রবল অনুরাগ ছিল তা নয়। তিনি ক্রমাগতই অন্যান্য দেশের সাস্কৃতির যা শ্রেষ্ঠ দান তা থেকে রস আহরণ কবে নিজের রচনাকে ঐশ্বর্যবান করেছেন। তিনি বিভিন্ন দেশেব মহাকাব্য পাঠ করেছেন। চীনা সাহিত্য দর্শনের ক্ল্যাসিক গ্রন্থগুলির অনেক অনুবাদ তিনি পড়েছেন। তিনি বিশেষভাবে কয়েকজন চীনা কবির রচনা পছন্দ করতেন তাদেব নাম হচ্ছে চু-উয়ান (Chu-yuan) পাই-চু-ই (Pai-chu-yi) ও সুসী (Su-shih)—দার্শনিকদের মধ্যে লাউৎ সে (Lao-Tzu) ছিল তার সমধিক প্রিয়।

জার্মানীর মহাকবি গেটের বচনা মূলে পডবার জন্য তিনি জার্মান শেখেন। এইভাবে বিদেশী সাহিত্য, বিশেষভাবে ইয়োবোপের সাহিত্য, তাঁকে গভীরভাবে প্রভাবান্বিত করে। তিনি এই বাহিরের প্রভাবকে স্বদেশের সংস্কৃতির সঙ্গে সমন্বিত করেছেন। এই দুই মিলিত সংস্কৃতির ভিত্তির উপরে দাঁড়িয়ে তিনি তাঁর অনবদ্য নিজস্ব শিল্পকৌশলে যে অপূর্ব সৃষ্টি করেছেন তার স্বাদ-গন্ধ পুরোপুরি জাতীয়। তাঁব গানে কবিতায় ক্ল্যাসিক্যাল ভারতীয় কাব্যের প্রভাব বয়েছে, সেই সঙ্গে রয়েছে লোক-সঙ্গীতের প্রভাব। তন্তুবায় জাতির কবীর নামে এক মহা লোকশিল্পীর কবিতা ও গানে রবীন্দ্রনাথের অনুরাগ ছিল গাঢ়—তাই নিজে এঁর রচনা ইংরাজীতে অনুবাদ করেন যাতে সমগ্র জগতে কবীরের ভাবধারার প্রচার হয়। নিজেব মাতৃভাষাব প্রতিও তাঁর শ্রদ্ধা ছিল গভীর, ইনিই প্রথম কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংবাজির বদলে বাংলায় বক্তৃতা দেন।

১৮৯০ সাল থেকেই তিনি বাংলা ভাষায় কাব্য রচনা করে আসছেন। এই লোকপ্রিয় ভাষার সঙ্গীতময় ধ্বনি তাঁর কবিতা ও গানে পরিচ্ছন্ন স্বাস্থ্যকর সমীর প্রবাহিত কবেছে—এক নূতন ছন্দ এনেছে। তিনি ভারতীয় কাব্যের জগতে এই ভাষার সাহায্যে এক সম্পূর্ণ নূতন দিগন্ত খুলে দিয়েছেন।

তাঁর ছোট গল্পগুলিতে তিনি লোকশিল্পের কথিকার ঢংটি আয়ত্ত করেছেন, গল্পগুলি গীতিকাব্যের রূপ নিয়েছে। এর একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত 'ঘাটের কথা'—তাঁর নাটকগুলিতেও ক্লাসিক্যাল ভারতীয় নাট্যের নৃত্য-গীত ও কাব্য-ভাব যা লোক-

নাট্যেও আছে সেই ভাব রক্ষিত হয়েছে। 'সন্ন্যাসী' ও 'চিত্রা' (চিত্রাঙ্গদা) নাটক দুইটিকে নাটকের ঢং এ লিখিত গীতিকাব্য বলা চলে।

ঠাকুর চীনা জনগণের বন্ধু ছিলেন। অতি অল্প বয়স থেকেই তিনি চীন সম্বন্ধীয় সমস্ত ব্যাপারেই উৎসাহী ছিলেন। বহু সহস্র বৎসর ধরে ভারত ও চীনের মধ্যে যে বন্ধুত্ব ও সংস্কৃতির ভাব বিনিময় ঘটেছে তারই ফসলের ঐশ্বর্য সম্বন্ধে তিনি গভীরভাবে অবহিত ছিলেন। তিনি চীনা সংস্কৃতির উচ্চ প্রশংসা করতেন। তিনি দুবার চীন ভ্রমণ করেছিলেন এবং চীন দেখে ফিরে গিয়ে তিনি চীনা সংস্কৃতি সম্বন্ধে পঠন-পাঠনে উৎসাহ দিয়ে প্রবন্ধ লিখেছেন। তাঁর স্থাপিত বিশ্বভারতীতে তিনি চীনা ভাষা ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে পড়াবার ব্যবস্থা করেন।

চীনের মানুষ সর্বদাই চীন ও ভারতের মধ্যের এই বহু শতাব্দীব্যাপী বন্ধুত্ব ও সাংস্কৃতিক সম্বন্ধের উচ্চ মূল্য দিয়েছে আর ভারতীয় সংস্কৃতি, সাহিত্য ও শিল্প সর্বদাই শ্রদ্ধার চোখে দেখেছে।

১৯১৫ শালের মত দূরবর্তী অতীতে রবীন্দ্রনাথের রচনা আমাদের দেশে পরিচিত হতে সুরু হয়। ১৯৪৯ শালে চীনের পিপলস রিপাব্লিক স্থাপিত হবার পরে এই কাজে এক নূতন অগ্রগতি হয়েছে। এখন ঠাকুরের রচনা ইংরেজী থেকে অনুবাদ না করে সোজাসুজি বাংলা থেকে চীনা ভাষায় অনুবাদ করতে পারি।

কাজেই এখন চীনা পাঠকরা রবীন্দ্রনাথকে আরো পূর্ণ ভাবে বোঝবার সুযোগ পাবে এবং তাঁর রচনার মধ্য দিয়ে ভারতীয় জনগণকে আমরা ভালোভাবে বুঝবার সুযোগ পাব।

ঠাকুর আমার হৃদয়ে আছেন

চি-সি-লিন (Chi-Hsien-Lin)

যখন পুরাণো দিনের কথা ভাবি তখন ত্রিশ বছরেরও বেশী পূর্বের কোন কোন ঘটনা পরিষ্কার মনের সামনে ভাসে।

১৯২৪ শালের বাইশে এপ্রিল একটি সুন্দর বসন্তের দিন, সেদিন রোদ ঝলমল করছিল, ঈষৎ অল্প বাতাস বইছিল। আমি তখন বালক মাত্র, সিনানে-উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রথম বার্ষিক ছাত্র। ভারতীয় কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সিনান (Tsinan) -এ এসেছেন জেনে আমি স্কুল পালালাম এবং অনেক দূর হেঁটে গিয়ে ভিড়ের মধ্যে চেপে চুপে ঢুকে ঘণ্টা দুই দাঁড়িয়ে থেকে শ্রদ্ধেয় প্রাজ্ঞ কবির ভাষণ শুনলাম।

ঐ বয়সে আমার কবি ও কাব্য সম্বন্ধে জ্ঞান কমই ছিল। বিশেষত ভারতীয় কবি ও ভারতীয় কাব্য সম্বন্ধে জ্ঞান নিঃসন্দেহে সামান্যই ছিল তবুও আমি স্কুল

পালিয়ে ছিলাম এবং সেজন্য আমার কোনো ক্ষোভ নেই, কারণ ঠাকুরের দীর্ঘ পরিচ্ছদ, দীর্ঘ শ্মশ্রু এবং শান্ত সৌম্য মুখমণ্ডল আমার মনের উপর গভীর ছাপ রেখে গেল। এর পর থেকে যখনই চীনা ভাষায় তাঁর কাব্যের কোনো অনুবাদ প্রকাশ হয়েছে আমি কিনেছি ও পড়েছি। আমি তাঁর কবিতাসংগ্রহ পড়েছি, ষ্ট্রেবার্ডস, গার্ডনার, ক্রেসেণ্টমুন ফ্রুট গাদারিং ফিউজিটিভ ও গীতাঞ্জলি ছাড়া প্রবন্ধ ও নাটকও পড়েছি। তাঁর রচনার অনেক আলোচনা গ্রন্থও পড়েছি।

এই ভাবেই বিশ বছর তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় চলছিল, যতদিন না 'পিপলস রিপাব্লিক অফ চায়না' স্থাপিত হয়। রাজনৈতিক এই পরিবর্তনের পরে আমি একটি চীনা সাংস্কৃতিক প্রতিনিধিদলের সঙ্গে ভারতে গিয়েছিলাম এবং দিল্লীতে পরম শ্রদ্ধেয় কবির পুত্র, যিনি তখন বিশ্বভারতীর উপাচার্য, তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হল। তিনি আমায় সাদরে তাঁর শান্তিনিকেতন ভবনে নিমন্ত্রণ করেছিলেন এবং আমি তাঁর পিতাকে চীনে দেখেছি জেনে বিশেষ আনন্দিত হলেন। কয়েকদিন পরেই আমরা শান্তিনিকেতনে গেলাম। সেখানে আমরা অত্যন্ত সৌহার্দ্যের সঙ্গে অভ্যর্থিত হলাম—কবির দৌহিত্রী, লাল কাপড় পরা একটি ফুট ফুটে মেয়ে আমাদের ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখালেন। গুল্ম পাদপ খোয়াই-এর পাহাড় ও উপত্যকা যে সব জায়গা কবি তাঁর জীবিতকালে ঘুরে বেড়িয়েছেন সব দেখলাম। ফুলের গালিচা বিছান গাছের ছায়াময় বাগানে বেড়াতে বেড়াতে আমার সে দিনের কথা মনে পড়ছিল ত্রিশ বছরেরও পূর্বে যে দিন আমি ঠাকুরকে দেখেছিলাম। আমরা 'উদীচীতে' রাত্রিবাস করলাম, এই পূর্ব দিকের দালানে কবি অনেকদিন বাস করেছিলেন—রাত্রে কবির রচিত একটি নৃত্যনাট্য দেখলাম।

পরের দিন প্রত্যুষে আমরা একটি ছোট বাড়িতে গেলাম, সেখানে কবির রচনার বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ গ্রন্থগুলির প্রদর্শনী সাজান ছিল, তার মধ্যে চীনা বইও ছিল। আমি কিছু কাঠের কাজের যন্ত্রপাতি দেখলাম- —ঐগুলি কবি ব্যবহার করতেন (কাঠের কাজ রবীন্দ্রনাথ করেন নাই, এই যন্ত্রগুলি রথীন্দ্রনাথের, তাঁর কাঠের কাজে অসামান্য দক্ষতা ছিল—)। উদ্যানের ছোট্ট জলাশয়ে লাল পদ্ম ফুটেছিল—অনেক নয়, দু তিনটি মাত্র, কিন্তু সেগুলো বেশ বড় এবং সকালের আলোতে অপরূপ মনোমুগ্ধকর।

এই অভিজ্ঞতার পর থেকে আমার যেন আরো বেশি ঔৎসুক্য জন্মেছে। এবং এখন চীনে রবীন্দ্রনাথের রচনা বাংলা থেকে সরাসরি অনুবাদের নূতন প্রচেষ্টা সুরু হয়েছে তার সঙ্গে আমার এই উৎসাহ ঠিক একই সময়ে মিলে গেছে।

এর পূর্বের সমস্ত অনুবাদ ইংরেজি থেকে হয়েছে এবং সেজন্য রবীন্দ্র রচনার

একটি ক্ষুদ্র অংশই পাওয়া গেছে। কিন্তু এখন সরাসরি বাংলা থেকে অনুবাদ সুরু হওয়ার ফলে আমাদের জ্ঞানের ক্ষেত্র বিস্তৃত হয়েছে এবং যে সব লেখার খবর আগে আমাদের জানা ছিল না তেমন অনেক লেখার সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটছে। ফলে চীনা পাঠকেরা রবীন্দ্রনাথকে আরো পূর্ণভাবে জানবার সুযোগ পাচ্ছে।

আমার মনে আছে প্রথম যখন আমি গার্ডনার, ষ্ট্রেবার্ড ও ক্রেসেণ্ট মুন পড়ি—আমি কবির অনেক সূক্ষ্মচঞ্চল ভাবনাকে ধারণ করবার এবং তাকে কাব্যে রূপ দেওয়া ও পাঠকের পরমানন্দ সৃষ্টি করার আশ্চর্য ক্ষমতায় মুগ্ধ হই।

বয়স বাড়ার সঙ্গে কবির সম্বন্ধে জ্ঞান ও তাঁকে বোঝবার ক্ষমতা ক্রমে ক্রমে বাড়ে এবং আমি কবিতা আরো গভীর ও ব্যাপক ভাবে বুঝতে পারি।

গত ১৮৮০ ও ৯০ শালের বছরগুলিতে কবি অনেক ছোট গল্প লেখেন—এই গল্পগুলোর মুখ্য বক্তব্য ছিল সামন্তযুগীয় বিবাহপ্রথা ও জাতিভেদ প্রথাকে আক্রমণ করা। এই সব গল্পের বেশিরভাগেই নায়িকারা তৎকালীন বিবাহপ্রথার দ্বারা উৎপীড়িত। একটি নায়িকা আট বছর বয়সে বিধবা হয় এবং একজন সন্ন্যাসীকে ভালবেসে ব্যর্থ প্রণয়ভারে পীড়িত হয়। আর একটি মেয়ের এক পড়তি জমিদার বাড়িতে বিবাহ হয়। তার ঋণগ্রস্ত পিতা কিছুতেই পণের দাবি পূরণ করতে পারে না এবং দুঃখে মেয়েটির জীবনান্ত ঘটে। আর একটি মেয়েকে এক মুমূর্ষু ব্রাহ্মণের সঙ্গে বিবাহ দিয়ে তাকে সতীদাহ করবার ব্যবস্থা করে চিতায় উঠতে আদেশ করা হয়—কেবল এক আকস্মিক ঝড়বৃষ্টির ফলে সে রক্ষা পায়। আবার আর একটি মেয়ে চিতা থেকে উঠে নিজেকে জীবিত কি মৃত বুঝতে না পেরে এক ভয়াবহ অবস্থায় পড়ে। আর একটি মেয়ে এক ছল ও কপট স্বামীর হাতে পড়ে স্বগৃহে অশেষ লাঞ্ছনা ভোগ করে, অবশেষে স্বামীটি ইংরেজ-পত্নী নিয়ে উপস্থিত হয়।

এই সব হতভাগিনী নারীদের যে বর্ণনা ঠাকুর লিখেছেন তাতে পরিষ্কার বোঝা যায় তাঁর মত কি, কিসের বিরুদ্ধে তিনি দাঁড়িয়ে উপহাস ও বিদ্রূপ বর্ষণ করছেন ও কোন দিকে তাঁর সহানুভূতি।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে যে উপন্যাসগুলি লিখেছেন সেগুলোরও ভাব একই প্রকার। ১৯০২ শালে লেখা নৌকাডুবি উপন্যাসটিও সামন্তযুগীয় বিবাহপ্রথার জন্য বিচ্ছিন্ন হল পরস্পরের কাছ থেকে, তারপর নৌকা ঝড়ে ডোবার ব্যাপার। তারপর নানা বিপর্যয়ের মধ্যে দিয়ে অবশেষে মিলনাত্মক এই কাহিনী। কিন্তু শেষে মিলন হলেও নিষ্ঠুর সমাজপ্রথার বিরুদ্ধে কবির উদ্যত শাসনবাণী এতটুকুও পথভ্রষ্ট নয়।

১৯০৭ সাল থেকে ১৯০৯ সাল পর্যন্তর মধ্যে লেখা 'গোরা' নামে উপন্যাসে এক

দেশপ্রেমিকের চরিত্র এ কেছেন। গোরার জ্বলন্ত স্বদেশ প্রেম। সে আবেগের সঙ্গে বলছে, যা কিছু আমার দেশকে আঘাত করছে, সে যত ভয়ানকই হোক তার প্রতিকার আছে এবং সে প্রতিকার আমার নিজেরই হাতে।

পরাধীন সমাজে এই ধরনের দেশাত্মবোধ, গর্ব ও আত্মবিশ্বাস স্বাধীনতা লাভের পক্ষে, মুক্তি সংগ্রামের পক্ষে অতিশয় মূল্যবান।*

একই সঙ্গে ঐ গোরা বইতেই রবীন্দ্রনাথ একজন বিশ্বাসঘাতকের চরিত্র এঁকেছেন, তাকে নির্দয় বিদ্রূপে জর্জরিত করেছেন—এই ঘৃণ্য চরিত্রটি বিপরীত নায়কের সদ্‌গুণাবলীর তুলনায় বেশ স্পষ্ট হয় উঠেছে।

ঠাকুরের কবিতা ঐশ্বর্যপূর্ণ ও বিচিত্র। তার গীতিকবিতার বিষয়বস্তু বিবিধ এবং বিস্তৃত, গীতিকাব্য, রাজনীতি বিষয়ক গীতিকবিতা প্রভৃতি আদর্শগত ভাবে পূর্ণ। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে তিনি বৌদ্ধকাহিনী অবলম্বন করে কবিত্বময় প্রেমকাব্য লিখেছেন—হিন্দু কাহিনী ও শিখ কাহিনী মহাভারতের বীরত্ব রাজস্থানের বীরত্ব সবই তাঁর কাব্যের বিষয় হয়েছে কিন্তু তিনি এই সব পুরানো কাহিনীতে নূতন তাৎপর্য সংযোগ করেছেন। এ সবের ভিতর দিয়ে তাঁর প্রেম প্রকাশ পেয়েছে এবং তাঁর বাংলাবাসীর মধ্যে স্বাজাত্য গর্ব জাগিয়ে তুলেছেন।

১৯০৫ সালে যখন ভারতে স্বাধীনতা আন্দোলনের এক তুঙ্গ মুহূর্ত, তখন তিনি অনেক দেশপ্রেমমূলক কবিতা লিখেছেন যা আজও অত্যন্ত জনপ্রিয়। এ ছাড়া তাঁর কবিতার এক বিরাট অংশ বাংলা দেশের গ্রামীণ সৌন্দর্যের বর্ণনা।. আমরা সেখানে, নীরব রাত্রি, স্বচ্ছ প্রভাত, জুলাই মাসের বর্ষণ মুখরতা, বসন্ত পুষ্পের ঘন সৌরভ, পুষ্প, প্রজাপতি, ভাসমান মেঘ, কলনিনাদিনী ঝরণা, ঝকমকে তারা, রাত্রে বৃষ্টির ঝর ঝর শব্দ, গ্রীষ্মকালের বলাকার গতি, শরতের হলদে পাতা প্রভৃতি দৃশ্যের পর দৃশ্যে অপরূপ প্রাকৃতিক শোভা দেখতে পাই।

ঠাকুরের মাতৃভাষার প্রতি অতুলনীয় শ্রদ্ধা ছিল—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনিই প্রথম বাংলাতে ভাষণ দেন।

---

* চীনা লেখকদের সব ক'টি প্রবন্ধেই রবীন্দ্র রচনার জাতীয়তা, দেশপ্রেমের দিকটিই বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে কিন্তু আন্তর্জাতিকতার ভাব, বিশ্বভাব যা প্রথম থেকেই তাঁর রচনায় গভীর নিগূঢ়ভাবে অনুস্যূত সে দিকটি তত উল্লেখিত হয় নাই।

বাংলা ভাষার জীবন্ত শক্তিশালী সঙ্গীতময় ধ্বনি তাঁর কাব্যে এক নূতন ছন্দে রূপ নিয়েছে তা প্রাণদায়ী পবিত্র আনন্দ প্রকাশ করেছে। গল্প লেখবার সময়ও তিনি পুরাতন ভারতীয় কথকদের ঢংটি পরিত্যাগ করেন নি।

কবির রচনা পড়ে আমি যা বুঝেছি সংক্ষেপে এখানে তা বলা গেল। আর চীনের প্রতি তাঁর গভীর প্রীতির কথা আমি বহুদিন থেকেই জানি, স্মরণ করি। তিনি চীনের মানুষ, চীন সভ্যতা উভয়ের প্রতিই বহু প্রশংসা বাক্য বলেছেন এবং এই দুই দেশের মধ্যে পুনঃসংযোগ স্থাপনে তার ব্যাকুলতার কথা বার বার জোর দিয়ে বলেছেন। অতি গভীর আবেগের সঙ্গে তিনি বলেছেন—"নব যুগ এসেছে এবং আমাদের দরজায় অপেক্ষা করে আছে, অপেক্ষা করে আছে আমাদের সাদর অভ্যর্থনার। আমরা তাকে আর দাঁড় করিয়ে রাখতে পারি না। এসো চীন ও ভারত আমরা মিলিত হই ও একযোগে সেই মহাযুগকে অভ্যর্থনা করবার স্বাগত সঙ্গীত মিলিতভাবে এই দুই দেশ থেকে উঠুক। যেন এই দুই দেশ বরণ প্রদীপ জ্বালিয়ে নিয়ে সেই নবযুগের অভ্যর্থনার জন্য এগিয়ে চলে। ঠাকুরের মুখের এই প্রেমের, সৌহার্দ্যের বাণী আমরা কখনো ভুলব না।

অকম্পিত

সম্প্রতি রবীন্দ্র চিত্রকলা নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে। যদিও এ বিষয়ে এখনও অনেক মননায় প্রয়োজন আছে। আমাদের বাল্যকালে ও রবীন্দ্রনাথের জীবিতকালের শেষ পর্যন্তই তাঁর চিত্রকলার এদেশে সমাদর হয়নি। সমাদর হয়নি বললে ভুল বলা হবে। সত্য কথা এই যে লোকে দেখতেই পায়নি। ছবি দেখবার উপায় ছিল না, ফলে অভ্যাসও কিছুই ছিল না গত দশ পনেরো বছরের মধ্যে যেমন চিত্র প্রদর্শনীর রেওয়াজ হয়েছে, যে কেউ যখন তখন প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করে ফেলছে তখন এমন তো হতে পারত না। এখন তো ছাত্রছাত্রীরাও অনায়াসে একক প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করে ফেলতে পারছে একথা সে যুগে কে বা ভাবতে পারত! কবির জীবিতকালে কলকাতায় তাঁর চিত্রপ্রদর্শনী বোধ হয় একবারই হয়েছিল। সরকারি আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষের চেষ্টায় ও উৎসাহে ঐ ছবির প্রদর্শনী হ'লে কলকাতার সুধীবৃন্দ রবীন্দ্র চিত্রকলার পরিচয় পান। সে সময়ে ছবি সম্বন্ধে কৌতূহল ও আগ্রহ ছিল খুবই সীমিত। তাছাড়া প্রদর্শনীর দ্বারদেশে লাল শালুর ওপরে রবীন্দ্রনাথের নামের পূর্বে স্যার উপাধিটি যোগ করে লেখায় অনেকে অধ্যক্ষ মহাশয়ের ওপরে এতো বিরক্ত হয়েছিলেন যে সে ক্রোধ যতোটা তাঁর উপরে পড়েছিল তার সঙ্গে তাঁর দ্বারা প্রযোজিত প্রদর্শনীর ওপরও কম পড়েনি।

এছাড়া বিদেশের চিত্রাঙ্কন পদ্ধতির যে নবীন বিবর্তন, যে পরীক্ষা নিরীক্ষা এক শতাব্দী ধরে চলেছে সে সম্বন্ধেও জ্ঞান ছিল খুবই সংক্ষিপ্ত। অধিকাংশ মাসিক পত্রিকায় যে সব ছবি ছাপা হত তা রঙ করা ফটোগ্রাফ বলা চলে। রবি বর্মার ছবিগুলির সমাদর যথেষ্ট হয়েছিল—বিলেতি ঢঙ-এ স্বদেশী বিষয় নিয়ে আঁকা বলেই রামানন্দ সম্পাদিত রামায়ণের মধ্যে মধ্যে সে ছবিগুলি স্থান করে নিয়েছিল। কেবলমাত্র 'প্রবাসী'তে ভারতীয় চিত্রাঙ্কনরীতিতে অঙ্কিত অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল ও তাঁদের শিষ্যবর্গের যে সব ছবি ছাপা হত সেগুলিই সুধী সমাজের চিত্ত ছবির জগতে আকর্ষণ করেছিল। তবুও সেগুলির প্রভূত সমালোচনা শুনতে পেতাম। বিশেষত ভারতীয় পদ্ধতিতে অঙ্কিত ছবিগুলি যে মানুষের অবিকল প্রতিচ্ছবি নয় এ অপরাধ ক্ষমার যোগ্য ছিল না। 'ঐ রকম লম্বা লম্বা সরু সরু আঙুল কি মানুষের হয়।'—এ প্রকারের সমালোচনা প্রাজ্ঞ লোকদের মুখেও শোনা গেছে, এমন কি কিছু কিছু শিল্পজ্ঞেরও ছিল ঐ অভিমত। অর্থাৎ প্রকৃতির প্রতিলিপিই শিল্পের আদর্শ ছিল।

অবনীন্দ্রনাথ নন্দলাল প্রমুখ কয়েকজনের অঙ্কিত ভারতীয় পদ্ধতিতে চিত্রকলা ক্রমে অভ্যস্ত হয়ে এলেও—নব্য ইয়োরোপীয় ভঙ্গি ছিল একেবারেই অজ্ঞাত—সেই অজানা বিস্ময়কর ও রীতিবিরুদ্ধ এক চিত্রলোকের সংবাদ প্রথম পাওয়া গেল গগনেন্দ্রনাথের চিত্রকলায়। তাঁর ব্যঙ্গচিত্রগুলি সমধিক প্রশংসা লাভ করলেও কিউবিজিমের ও আলোছায়ার রহস্যঘন সম্পূর্ণ নূতন ভঙ্গির ছবিগুলি যেন রসিকের মনের দরজায় 'ন যযৌ ন তস্থৌ' অবস্থায় ছিল। ঐ আশ্চর্য লাবণ্যক্ষরিত বিচিত্র চিত্রবিকাশ যে বিস্ময় উদ্বোধিত করে তুলত ছবি দেখতে অনভ্যাসবশত তাঁর অভ্যর্থনার অবশ্যই ত্রুটি রয়ে গিয়েছিল। বস্তুত ত্রিশ চল্লিশ বৎসর আগে এই নবভঙ্গীর রস নির্ণয়ে পারগ মাত্র দুচারজনই ছিলেন।

১৯২৬ সালে যখন প্রথম বাংলা দেশ জানতে পারল যে কবি রবীন্দ্রনাথ সহসা তাঁর কলমকে ভাব হতে রূপে মুক্তি দিলেন, যখন তাঁর কলমের মুখে অসম্ভব আকৃতির অবিশ্বাস্য মূর্তিগুলি খাতার কর্তিত অংশের ওপর আপন অস্তিত্ব ঘোষণা করতে লাগল, তখন কবির খেয়াল বলে সাধারণের কাছে তা উপেক্ষিত কিংবা সস্নেহে পরিহসিত হলেও শিল্পীগোষ্ঠীর কাছে সেই শক্তিশালী রেখার আত্মঘোষণা, তার 'অয়ম্ অহং ভোঃ' ধ্বনি ক্ষণে ক্ষণেই স্বকীয় স্থান দাবি করছিল ও অজ্ঞাতসারে গভীর প্রভাব বিস্তার করছিল। বর্তমানে বাঙলাদেশে চিত্রকলা যে নূতন নূতন পথে আপন প্রকাশের পথ খুঁজছে বলতে গেলে সে প্রচেষ্টার রবীন্দ্রনাথই ছিলেন পথিকৃৎ। পুরাতন রাজপুত মোগল কাঙড়া অজন্তার বন্ধনমুক্ত বিশেষ শিল্পীর বিশেষ চিত্তদ্যোতনা এমন করে আপন গতি পথ খুঁজবার সাহস হতে বহু বিলম্ব হত যদি না দুঃসাহসী যৌবনের জয়গান কণ্ঠে নিয়ে, অজানার আকর্ষণে নিত্য উন্মোথিত চিত্তবৃত্তি রবীন্দ্রনাথ চিত্রশিল্পের পথেও সংস্কারের বন্ধনমুক্তি, অভ্যাসের অচলায়তন ভেঙে দিতেন। এমন কি তখনকার দিনে প্রথিতযশা ঘোষিতকীর্তি শিল্পীদের মধ্যেও কারো মন পুরাতন পথ থেকে গেল সরে। ফলে তাঁদের তুলি গেল বদলে। এই বদল সহসা রঙের পথ ধরতে সাহসী না হওয়ায় শাদা-কালোর স্কেচ ও চাইনিজ কালির আলোছায়া মেলে পুরাতন রীতিতে শৃঙ্খলাবদ্ধ কোনো কোনো শিল্পীকে মুক্তি দিল। রবীন্দ্র-চিত্রকলার সমাদর হতে দীর্ঘদিন লেগেছে তবে তাঁর চিত্রকলার প্রভাবে মনের অর্গল খুলে যেতে, দৃষ্টির সংস্কার মুক্তি ঘটাতে সে তুলনায় বেশি দিন লাগেনি। এই প্রভাব প্রত্যক্ষ-সহজ অনুকরণের মতো নয়, এ শুধু শিল্পীর সত্তার অস্তিত্বে এক নূতন দৃষ্টি জাগিয়ে তোলবার শক্তি সঞ্চরণ। অনেক সময় মনে হয় কাব্যের ক্ষেত্রের চেয়েও শিল্পের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রপ্রতিভার অন্তর্গূঢ় শক্তি পরবর্তী শিল্পীদের আঙুলে বল ও অন্তরে রসোল্লাস নির্বাধ করতে পেরেছে। কবিতার

ক্ষেত্রে তার ফল কোনো কোনো স্থলে দুর্বল অনুকরণ, আবার কোথাও-বা প্রভাব অতিক্রমণের অতিকৃত প্রয়াসে কবিতা কুটিল, বঙ্কিম ও সত্যভ্রষ্ট হয়ে পড়েছে।

চিত্রশিল্পের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের ওপর বিদেশী প্রভাবের কথাও কেউ কেউ উল্লেখ করেন। আপাতদৃষ্টিতে বর্ণবিন্যাস, প্রকৃতির অনুকৃতির অভাব ও শিল্পীর বিশেষ চিত্তস্ফুরণের প্রাবল্য প্রভৃতি কয়েকটি বিষয়ে ঐক্য থাকলেও একটি প্রধান অনৈক্য বর্তমান আছে যার ফলে রবীন্দ্র চিত্রকলা সম্ভবত সমগ্র শিল্পজগতে অনন্য বলে ধরা যেতে পারে, কারণ এ শিল্প সম্পূর্ণ পবিকল্পনাহীন। এই 'পরিকল্পনাহীন' কথাটি কতোদূর পর্যন্ত সত্য তা চিত্রাঙ্কনরত ববীন্দ্রনাথকে না দেখলে অনুমান করা যায় না।

এক সময়ে শুনেছিলাম এবং হয়তো আজও অনেকের সেই ধারণা আছে যে রবীন্দ্রনাথ ৬৭ বছর বয়সে ১৯২৬ সালে খাতাব পাতায় কাটাকুটি করতে করতে প্রথম রেখার জগতেব সন্ধান পান। তাব পূর্বে তিনি কখনো ছবি আঁকেন নি সেজন্য এ বিষয়ে যদি তাঁর পটুত্ব কিছু থাকে তা আকস্মিক প্রতিভার স্ফুরণ বা 'অশিক্ষিত পটুত্ব।' কিন্তু অঙ্কনবীতির নিয়মিত কোনো অনুশীলন না করলেও দীর্ঘ জাবনে মাঝে মাঝেই তাঁর কলম অক্ষরের বন্ধন ছেড়ে রেখার লীলায় অভিভূত হয়েছে, রবীন্দ্রজীবনের নানা স্থানে সে খবব পাওয়া যায়। শিল্পীর বাড়িতে যেমন প্রচুর ছবি দেখবার সুযোগ তাঁর হয়েছিল তেমনি ছবি আঁকবার শখও তাঁর ছিল প্রথম থেকেই।

'ছিন্নপত্রে' তিনি লিখছেন, 'লজ্জার মাথা খেয়ে সত্যি কথা যদি বলতে হয় তো এটি স্বীকার কবতে হয় যে ঐ যে চিত্রবিদ্যা বলে একটি বিদ্যা আছে তার প্রতিও আমি সর্বদা হতাশ-প্রণয়ের লুব্ধ দৃষ্টিপাত করে থাকি। কিন্তু আর পাবার আশা নেই, সাধনা করবার বয়স চলে গেছে। অন্যান্য বিদ্যার মতো তাঁকে তো সহজে পাবার জো নেই, তাঁর একেবারে ধনুকভাঙা পণ, তুলি টেনে টেনে একেবাবে হয়রান না হলে তাঁর প্রসন্নতা লাভ কবা যায় না।'

এই চিঠি লেখা হয় ১৮৯৩ সালে, তখন রবীন্দ্রনাথের বয়স বত্রিশ বছর। আর তাঁর চিত্রকলার পুরোপুরি সাধনা শুরু হয় ১৯২৬ সালে, কিন্তু এর মাঝে মাঝে যে তিনি তুলি টেনে হয়রান হবার চেষ্টা কবেন নি তা নয়। শিল্পী মুকুলচন্দ্র দের সাক্ষ্য অনুসারে ১৯০৫ সালে রবীন্দ্রনাথের পেন্সিলের ছবি আঁকার কথা জানা যায়। ১৯৪৮ সালের আশ্বিনের ভারতবর্ষে মুকুল দে লিখছেন :

'তিনি (রবীন্দ্রনাথ) তখন (১৯০৫) শাদা মারবেল পাথরের জলচৌকির সামনে বসে লেখাপড়া করতেন। সেখানে বসে দেরাজ খুলে বার করলেন

চমৎকার কালো চামড়ার বাঁধাই সুন্দর ছবি আঁকার বই। তারপর সেখানি আমার হাতে দিলেন। এই খাতায় (ছিল) তাঁরই নিজের হাতের কয়েকটি পেনসিল ও কালিতে আঁকা ছবি। তাতে গুরুদেবের স্ত্রীর একটি ছবিও ছিল। সব ছবিগুলিই তাঁরই আঁকা। আর একটি ছিল নদীর ঢেউ এর ওপর নৌকা ভাসছে, নৌকায় একটি সুন্দরী মেয়ে শুয়ে আছে।......আমাকে ঐ ছবিগুলি দেখিয়ে বলেন "এই রকম পরিষ্কার পেন্‌সিলের লাইনে ছবি আঁকতে পারিস?......আমার কাছে 'কুমারস্বামী'র Indian Drawing এর বই ছিল, সেটা বীরেন নিয়ে আর ফেরত দেয় নি, সেটা এখন থাকলে তোকে দিতাম।" এই প্রসঙ্গ রবীন্দ্রনাথের জীবিতকালে আর্টস্কুলের প্রদর্শনীর স্মারক গ্রন্থের ভূমিকাতে মুকুল দে লিখেছিলেন কাজেই অনুমান করা যায় রবীন্দ্রনাথ গোপনে কিছু আঁকার অভ্যাস বরাবরই রেখেছিলেন। গোপনে এই জন্য যে এ সম্বন্ধে তাঁর আত্মপ্রত্যয় ছিল না। ।শিল্পীর বাড়িতে জন্মেছেন যেখানে বড়ো বড়ো শিল্পীর জীবনপণ সাধনা চলেছে সেখানে অন্য কাজের ফাঁকে ফাঁকে শিল্প জগতে এই অভিসারের ইচ্ছাকে তিনি নিজেই ব্যঙ্গ করে লিখেছেন :

"আমার অবস্থাটা দ্রৌপদীর মতো হয়েছে। তিনি মনে করেছিলেন যে, আহা সেই যদি আমার পাঁচটি স্বামীই হল তবে ঐ কর্ণকে শুদ্ধ নিয়ে ছ'টি হলেই দিব্যি হত। আমার বিশ্বাস কর্ণকেও যদি পেতেন তাহলে দুর্যোধন দুঃশাসনকেও হাত ছাড়া করতে ইচ্ছে হত না। কারণ হয় এক নয় অসংখ্য এর মাঝখানে আর কোথাও স্বাভাবিক বিরামের স্থান নেই। ...অতএব একলা কবিতাটিকে নিয়ে থাকাই আমার সুবিধে। বোধহয় যেন উনিই আমাকে সবচেয়ে বেশি ধরা দিয়েছেন। আমার ছেলেবেলাকার ভালোবাসা আমার বহুকালের অনুরাগের সঙ্গিনী।" এই চিঠি যৌবনে লিখিত হয়েছিল কিন্তু আমরা জানি দ্রৌপদীর কর্ণকে পাবার সাধের মতো এই কলাবিদ্যার সাধ তাঁর অপূর্ণ থাকে নি। শেষ পর্যন্ত রেখারঙের জাদু-নর্তকীরা ধরা দিয়েছিল।

অনুমান করা যায় এই গোপন বাসনা চিরদিনই তলে তলে কাজ করে এসেছে। কিন্তু বহুবিধ কর্মজালের মধ্যে কবিতার দুর্বার স্রোতে আপন পথ খুঁজে পায়নি, রয়েছে তলিয়ে গহনে। নৌকায় শয়ান সুন্দরীর পেন্‌সিল স্কেচ একেবারেই রবীন্দ্র চিত্র-অনুগামী নয়। তারপর কখন খাতার পাতায় কাটাকুটির ওপর দাগ বুলাতে বুলাতে রেখার জগতের অন্তর্নিহিত শক্তি উঠল তাঁর লেখনীতে তরঙ্গিত হয়ে, গড়ে উঠতে লাগল বিচিত্ররূপ যারা কোনো দৃশ্যবস্তুর প্রতিরূপ নয়। অসম্ভব অবিশ্বাস্য আকৃতিগুলির ভিতরে রেখার গূঢ়চ্ছন্দে, কোন অজ্ঞাত ঐক্যে, স্বপ্নসম্ভব শিল্পমূর্তি অনুভবের বিচিত্র সত্যকে প্রকাশ করতে লাগল, অজ্ঞাত পরিচয় জন্তুর মূঢ় মূক

ক্রন্দন যা সকল ভাষাহীন প্রাণীর অব্যক্ত বেদনার প্রতীক। দেখা গেল অমানুষিক ওষ্ঠে হাসির আভাস। মায়াময় প্রান্তরে কুয়াশা, আত্মহত্যার আর্তনাদ, বিমূঢ় শোক, গল্পের স্বপ্নপুরী। লাইনের সঙ্গে লাইনের সংযোগে যে ছবির জগৎ গড়ে উঠতে লাগল শিল্পীর মনের কোনো পূর্ব পরিকল্পনার দ্বারা তা চালিত নয়। রবীন্দ্রনাথের ছবি সম্বন্ধে এ কথাটি সর্বজনবিদিত যে রেখার টানে রঙের মায়ামৃগ তাঁর তুলিকে ছুটিয়ে নিয়ে গেছে, তবে এই পরিকল্পনাশূন্য রেখার গতি প্রকৃতি সম্বন্ধে পূর্ণ ধারণা করতে হলে চিত্রাঙ্কনরত রবীন্দ্রনাথকে যাঁরা দেখেছেন তাঁদের অভিজ্ঞতার কথা জানতে হবে। এবং সেই অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করা একান্ত প্রয়োজন, না হলে ভবিষ্যৎ শিল্প-তত্ত্বজ্ঞ কখনই এ সত্য সম্পূর্ণ অনুধাবন করতে পারবেন না।

কাগজের ওপর যখন একটি লাইন পড়ত কবি-শিল্পী তখনও জানতেন না সেটি কী হবে কি ফুল হবে—সে কোন অতিপ্রাকৃত জন্তু হয়ে উঠবে কি প্রান্তরের ওপর ...নের আভাস দেবে। লাইনের পরে লাইন দিচ্ছেন। যখন একটি বিশেষ আকার ফুটে উঠল তখন সেটার অনুসরণ করতে লাগল সচেতন দৃষ্টি। লাইনের ভারসাম্য ও ছন্দ লক্ষ্য করে রেখার সঙ্গে রেখার সংযোগ করতে লাগলেন শিল্পী। হয়তো ঘষছেন রঙিন পেনসিল দিয়ে সজোরে, ঘষছেন তো ঘষছেনই, গেল তাঁর শিস ভেঙে, তুলে নিলেন অজস্র পেন্‌সিল থেকে আর একটি, সেটার রঙএর দিকে দৃকপাত মাত্র না করে। হয়তো তুলে নিয়েছেন খুব মোটা করে গোলা জলের রঙ, কিন্তু বিভিন্ন রঙএর পাত্র থেকে তুলে নেবার পূর্বে ফিরে দেখবার প্রয়োজন বোধ করেন না কবি। পাশে যদি কেউ থাকে তবে তাড়া দিলেন পাত্রটি এগিয়ে দিতে, কিন্তু কোন্ রঙএর পাত্র চাই সেদিকে দৃষ্টি নেই। সুন্দর একটি মুখ হয়ে উঠেছিল, দিলেন তার উপর খানিকটা কালি জেবড়ে। একটা পাশ গেল কালো হয়ে। মনে হল এর মৃত্যু হল। সে সময়ে দর্শক যদি কেউ থাকত অবশ্যই তার মনে হত এঁর হাত থেকে ছবিখানি ধ্বংস হবার পূর্বে উদ্ধার করে নেওয়া ভালো। কিন্তু তারপর সেই আকস্মিক উৎপাতের মতো রঙকে টানতে লাগলেন তুলি দিয়ে। ঘষতে লাগলেন, কখনো বা তুলি ফেলে দিয়ে আঙুল, নখ কাজে লাগালেন, আবার নূতন রঙ চাপালেন, ঘষাঘষি চলতেই লাগল। তারপর ধীরে ধীরে ফুঠে উঠল সেই কালি-মাখা লাঞ্ছিত মুখমণ্ডলে বিচিত্র ব্যঞ্জনা। রঙএর উপর রঙ চাপাবার সময় এরকম পরিকল্পনাশূন্য অরাজকতা শিল্পরাজ্যে আর কোনো শিল্পী ভরসা করছেন বলে মনে হয় না। রবীন্দ্রনাথ ধরে ধরে রঙএর সঙ্গে রঙ মিলিয়ে মিলিয়ে ছবি আঁকতেন না —বন্যার মতো, প্লাবনের মতো, রঙের ধারা নামত, মাঝে মাঝে রঙের বজ্রপাত হত। জলের রঙ এতো গাঢ় করে গোলা হত বা যে পেলিকান কালি ব্যবহার

করতেন তাকে আর উঠিয়ে ফেলবার উপায় ছিল কিনা সন্দেহ—ওঠাবার চেষ্টাও বিশেষ লক্ষ্য করিনি।

রঙএর ওপর রঙ চাপত—ফলে অভিনব বর্ণচ্ছটা যেন কোন গূঢ় আবেগে স্পন্দিত হয়ে শিল্পীর অনির্দিষ্ট অভিপ্রায়কে ব্যক্ত করে তুলত। কালোর ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছে লাল—বেগুনির চাপা আগুন ফুটে বেরোচ্ছে লালের প্রচ্ছন্নতার মধ্য দিয়ে। হল্‌দে নীলের দ্বন্দ্বে রঙএর মশাল জ্বলছে দর্শকের চেতনাকে বিহ্বল করে ঐ যে বনের নিচে আগুন জ্বলছে, যখন শিল্পীর তুলির মুখে ছবির পটের উপরে পড়েছিল সহসা হলদের ওপর লাল, তখন কে জানত জ্বলবে ঐ অস্তরাগ। চলল নির্মম ঘসাঘসি—রঙএর উপর রঙ চাপানো। অন্তরের যে গভীর ঐক্যবোধ কবিতার ছন্দে নেমে আসে বিচিত্র লীলায়, তারই বহুধা শক্তি তুলির মুখে পেল গতি। অজ্ঞাত পরিচয় রেখা ও রঙ ধরা পড়ল পরিচয়ের বন্ধনে—ছন্দিত হল রূপের আকারে, রঙএর স্পন্দনে, অনির্দেশ্য সৌন্দর্য, রেখার বাণী অসংশয়ে বলল আমি এসেছি—অয়ম্ অহং ভোঃ।

আমেরিকায় যখন ছবির প্রদর্শনী হয় তখন রিপোর্টারদের প্রশ্নের উত্তরে কবি বলেছিলেন—'যখন আঁকি আমি জানি না কি আঁকব।…কলম তুলে নিয়ে যেমনি শুরু করি হয়তো একটি মুখ একটি ফুল বা একটুকরো মেঘের আভাস দেখতে পাই। …কখনো কখনো ভুল হয়ে যায়—ফুলের বোঁটাকে নামাতে গেলে যেমন অনেক সময় ডাঁটাটি ভেঙে যায় তখন রেখাটি মরে যায় আমি তাকে তার ধ্বংসের পথে নিয়ে ফেলেছি। এই অগণ্য আকারগুলি অগণ্য ছোট ছোট আত্মার মতো তারা আমার কাছ থেকে মুক্তির আশা করে।'…

ফুলের বোঁটাকে নামাতে গিয়ে হয়তো কখনো কখনো তারা ভেঙে গেছে, মরে গেছে যে ফুল বিকশিত হতে পারত শোভায় কিন্তু সেই অসংখ্য আকারের মধ্যে অধিকাংশই পেয়েছে রসলোকে মুক্তি। তাঁর কাব্যের মতই অসীম সৌন্দর্যলোকের দ্বার খুলে দিয়েছে। রবীন্দ্র-চিত্রকলার রঙের বিচিত্র খেলার দিকে চেয়ে চেয়ে দর্শকের মনে সৌন্দর্যের যে অসীমতার ভাব জেগে ওঠে একমাত্র কালিদাসের ভাষায় ছাড়া সেই অনির্দিষ্ট ভাবনার কোনো নাম নেই—সেই রম্যতায় জন্মজন্মান্তরের অব্যক্ত সৌহৃদানি মনের মধ্যে ব্যাকুল হয়ে ওঠে 'পর্যুৎসুকীভবতি যৎ সুখিতোঽপি জন্তুঃ'।

১৯৫৫

বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় ও তার আদর্শ

সম্প্রতি পাব্লিক একাউন্টস কমিটির মন্তব্যে বিশ্বভারতীর আদর্শচ্যুতি সম্বন্ধে কাগজে অনেক কথা পড়া গেল—এমনও কেউ লিখেছেন যে, বিশ্বভারতী সম্বন্ধে দেশের চিন্তাবিদরা কিছু ভাবেন না এ কথায় রবীন্দ্রনাথের প্রতি ঔদাসীন্য দোষ আরোপ করা হয়। শিক্ষাতত্ত্বে আমি পারদর্শী নই কিন্তু শান্তিনিকেতন রবীন্দ্র জীবনের ফসলভরা সোনার তরী সে সম্বন্ধে উদাসীন থাকতে পারি না।

যাঁরা সরকারী ব্যায়ের খতিয়ান করতে গিয়েছেন, তাঁরা শান্তিনিকেতনের ইতিহাসের সঙ্গে কতটা পরিচিত তা জানি না, মনে হয় তাঁরা একটা আশা নিয়ে গিয়েছিলেন, সেটা কোথাও আঘাত পেয়েছে—প্রতিষ্ঠানটি মামুলী এবং গতানুগতিক মনে হয়েছে অথচ অভাবটা কোথায় তা ঠিকমত বুঝতে পারেন নি এবং বিজ্ঞান শিক্ষার নূতন ব্যবস্থাকে শান্তিনিকেতনের শিল্প সঙ্গীত সাহিত্য প্রভৃতিকে বিজ্ঞান শিক্ষার পরিপন্থী মনে করেছেন। এ অনুমান ঠিক নয়। রবীন্দ্রনাথ বিজ্ঞান শিক্ষার বিরোধী ছিলেন না। আধুনিক জগতে বিজ্ঞানের নূতন নূতন আবিষ্কার ছিল তাঁর আনন্দ ও বিস্ময়ের বস্তু। শান্তিনিকেতনে জগদানন্দ রায় তাঁর বিজ্ঞান চর্চায় রবীন্দ্রনাথের সহানুভূতি পেয়েছেন। ডারউইনের অভিব্যক্তিবাদ রবীন্দ্র-কল্পনা ও বিশ্বাসের স্রোতে মিশে বলাকায় কবিতার ছন্দে মূর্ত হয়েছে, তার প্রভাব পড়েছে 'আত্মপরিচয়ের' উপলব্ধিজাত জীবন বর্ণনায়। জ্যোতির্বিজ্ঞানের বহু উপমা "শেষের কবিতার" ছত্রে ছত্রে প্রকাশ পেয়ে ঐ শাস্ত্রের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় প্রমাণ করেছে—লোকশিক্ষা সংসদের গ্রন্থাবলীর মাধ্যমেও বিজ্ঞানের নানা কথা সাধারণ মানুষের কাছে পৌছে দেবার চেষ্টা করেছেন। শান্তিনিকেতনে যে পুরোপুরি বিজ্ঞান চর্চার ব্যবস্থা হয়নি তার কারণ সঙ্গতির অভাব। আজকের মত টাকা যদি রবীন্দ্রনাথের হাতে থাকত তবে তিনি ইটের ও কংক্রিটের স্তূপ না বানিয়ে বিশ্বের জ্ঞান আহরণ করে আনতেন। ভইক ওড়াতেও তাঁর কবিত্বে বাধত বলে মনে হয় না। রবীন্দ্রনাথের জ্ঞানস্পৃহা বিজ্ঞান-বিমুখ ছিল একথা মনে করার মত ভ্রম আর কিছু নেই।

তবে এখানে একটি কথা বলবার যে, সমস্ত শিক্ষার যেটা মূল সেই মূল্যবোধকে জাগিয়ে তোলার প্রেরণা দেওয়াই বিশ্বভারতীর আদর্শ ছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ইয়োরোপে গিয়ে বর্তমান সভ্যতার বিকৃত মূল্যবোধ, যেখানে ধনের মূল্য জ্ঞানের চেয়ে, মানুষের চেয়ে, বড়ো হয়ে উঠেছে, সেখানে পরধনলোলুপ জাতীয়তা, যে

কোনও উপায়ে অর্থ সংগ্রহে লজ্জিত হচ্ছে না, যেখানে অস্ত্র ব্যবসায়ী অর্থের জন্য যুদ্ধ বাধাতে উৎসুক, যেখানে অষ্ট্রিচ পালকের জন্য, হীরার খনির জন্য আফ্রিকার মানুষকে চির দাসত্বে রাখা, ভারতের রক্ত শুষে স্ফীতোদর হওয়া, মানুষ গৌরবের মনে করছে সেই লালসাসিক্ত সভ্যতার সর্বনাশা রূপ ক্রান্তদর্শী কবির সামনে এমন স্পষ্ট হয়েছিল যে, এই অন্ধ জাতিপ্রেমের প্রতিরোধ কল্পে আন্তর্জাতিক কেন্দ্ররূপে বিশ্বভারতীতে মানব মূল্যবোধের চর্চা করতে চেয়েছিলেন—তিনি বলেছিলেন ন্যাশানালিজম এক অপ-দেবতা। দেবতার নাম করলে তবেই অপদেবতা পালায়—শান্তিনিকেতনে সেই দেবতার মন্দির গাঁথছি।

শান্তিনিকেতন যদি বিশেষ কোনো আদর্শ বলতে চেয়ে থাকে তা হচ্ছে এই যে, জাতি বর্ণ সম্প্রদায়ের উর্ধ্বে মানুষই মূল্যবান। পদের বা অর্থের মূল্যে তার মূল্য নিরূপণ হয় না, মানুষ্যত্বের উদ্বোধনে, ন্যায়, ধর্ম ও সৌন্দর্যের মূল্যেই সে মূল্যবান।

শান্তিনিকেতনে তাই ধন ছিল না কিন্তু সৌন্দর্যের অমূল্য ঐশ্বর্য ছিল। গান্ধীজীও ধনের মূল্য স্বীকার করেন না কিন্তু তাঁর পথে নিরলঙ্কার রিক্ত-শূন্যতায় মানব জীবনের একটি প্রধান দিক উপেক্ষিত। শান্তিনিকেতনের প্রতিটি কোণা শিল্পের অলঙ্কারে সজ্জিত দিব্যশ্রী। বেশে ভূষায় স্থাপত্যে এমনকি কুঁড়ে ঘরের সৌকর্যে, সৌন্দর্যের অসীম মূল্য মানুষের মনকে ঐশ্বর্যবান করে তুলত। 'তালধ্বজ' কুঁড়েঘর তবু সে কোনো উদ্ধত স্কাই-স্ক্রেপারের কাছে লজ্জা পাবে না। রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে সেই পার্থক্যই বোঝাতে চেয়েছিলেন, কারণ কুবেরের সঙ্গে লক্ষ্মীর, লোলুপতার সঙ্গে শ্রী সম্পদের যে বিপুল পার্থক্য মানুষ ক্রমাগতই তা ভুলে যায়। তাঁর আশ্রমে অর্থই সম্পদ নয়, মানবতার সর্বাঙ্গীণ উন্মেষে, চরিত্রের পূর্ণ উদ্বোধনে, সৌন্দর্যের সম্পদেই মূল্যবান হবে মানুষ। সেখানে তাই দারিদ্র্য অপমান নয়, আয়োজনের স্বল্পতায় কোনো দীনতা নেই। মাটির বাড়িতে বাস করি, কি ডানলো-পিলোতে শুয়ে থাকি তা দিয়ে যে মানুষের মূল্য নির্ণয় হয় না এবং কেবল অর্থই জীবনকে শোভায় সজ্জায় রূপে রসে বর্ণে গন্ধে পূর্ণ করবার ক্ষমতা রাখে না তা এমন করে আজকের দিনে আর কে বলতে পেরেছিল?

আর আজ সেখানেই যদি পদ বৃদ্ধির জন্য, মাইনে বাড়ার জন্য দলাদলি চলে, যদি বিরাট কংক্রিটের প্রাসাদ উঠতে থাকে, তোতাপাখীর শিক্ষার জন্য সোনার খাঁচাই তৈরী হয়, ছাত্রদের মধ্যেও সুখ সুবিধার তারতম্য ঘটান হয়, চাকরি জীবনের দাসত্ব ও গ্লানি অধ্যাপকদের জীবনে প্রবেশ করে—যদি কার বাড়ি বড় গাড়ি এল তা দিয়ে তার মূল্য নির্ণয় হয়, তবে শান্তিনিকেতন আদর্শ ভ্রষ্ট হয়নি কেমন করে বলব? পদমর্যাদা অনুসারে উন্নাসিকতা, ভি. আই. পি. প্রথা, কোনটি

সেখানে ঢুকে পড়ে নি? যেখানে বিশ্বকে ডাক দিয়ে আনা হবে সেখানে ক'জন বিদেশী অধ্যাপক আছেন? যে সব বিদেশী আসেন তাঁরা কেন রবীন্দ্র ভাবধারার সঙ্গে কিছুমাত্র পরিচিত হবার সুযোগ পান না? আজকের শান্তিনিকেতনে পাব্লিক সার্ভিস কমিশনে পরীক্ষা দিয়ে যাঁরা চাকরি করতে যান তাঁরা মাইনে বেশী পেলেই অন্যত্র চলে যান, আর যত দিন থাকেন অন্তহীন দলাদলিতে হাঁপিয়ে ওঠেন।

এদিকে যারা রবীন্দ্র চর্চায় সারাজীবন দিয়েছেন যাঁরা তার কাজে উৎসর্গিত, এবং যাঁরা তার প্রিয়, তাঁরা হয়ত সেই কারণেই শান্তিনিকেতনে অদৃশ্য। আর কোনো রাজপুরুষ, যে হয়ত রবীন্দ্রনাথের পাঁচখানা বইর নাম একসঙ্গে বলতে পারবে না, সে শান্তিনিকেতনে ভি.আই.পি.—এরকম লোকের পিছন পিছন স্তব করতে করতে আশ্রমবাসীদের শোভাযাত্রা দেখিনি যে তা নয়—এগুলিই আদর্শচ্যুতি, ক্রমবিকাশ নয়। ক্রমবিকাশ ঘটবে জীবন্ত প্রতিষ্ঠানের—এমন কি ক্রমে বিবর্তনের পথে তার আমূল পরিবর্তন হয যেতে পারে কিন্তু সেটা মূল আদর্শের বিচ্যুতি না হয়ে পরিণতি হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

১৯৬০

রবীন্দ্রসংগীত

আমাকে রবীন্দ্রনাথের সংগীত সম্বন্ধে কিছু লিখতে বলা হয়েছে কিন্তু আমি সংগীতজ্ঞ নই। গলায় সুর নেই আর সংগীতবিদ্যাও জানা নেই। তবে রবীন্দ্র-সংগীতে বিদ্যার অতীত, জ্ঞানের অতীত কিছু বস্তু আছে, সে সেই বস্তু যাকে বলা হয়েছে তর্কের অতীত, বাক্য ও মনের অতীত, যাকে অন্য কোনো ভাবেই পাওয়া যায় না—ন মেধয়া ন বহুধা শ্রুতেন—যাকে শুধু অন্তরে কোনো বিশেষ বিশেষ মুহূর্তে উপলব্ধিতে পাওয়া যায়, সে সম্বন্ধেই হয়ত দু-এক কথা বলতে পারি।

আমাদেব অল্পবয়সে দেশে গানের চর্চা খুবই সীমিত ছিল। যে দু-একটি বাড়িতে বিশেষভাবে সংগীতচচা হত তার মধ্যে ঠাকুরবাড়িই অগ্রণী। হিন্দু সমাজে মধ্যবিত্ত গৃহস্থ বাড়িতে সংগীতচর্চা ছিল না বল্লেই হয়। জমিদার বাড়িতে ধনীর বাগানবাড়িতে ছাড়া কালোয়াতি গানের মজলিশকে বিশেষ সুদৃষ্টিতে কেউ দেখত না। বৈষ্ণবরা কীর্তন করতেন, রামপ্রসাদী গানও কোনো কোনো ভক্তকণ্ঠে শোনা যেত। ব্রাহ্মসমাজেই প্রথম শিক্ষিত স্ত্রী-পুরুষ ব্রহ্মোপাসনার সঙ্গে ব্রহ্মসংগীতের চর্চা করতেন। হিন্দুসমাজের ছেলেরাও সে-সময় মেয়েদের মুখে গান শোনবার জন্য ব্রাহ্মসমাজে ভীড় করতেন। কারণ হিন্দুসমাজে সভ্য শিক্ষিত লোকের গান শোনার কোন আয়োজনই ছিল না। ব্রাহ্মসমাজে উপাসনার সঙ্গে গান ছিল পূজার সঙ্গে মন্ত্রের মত। সংগীতের এই উত্তোরণের শক্তি ব্রাহ্মসমাজের অনেক দুরূহ কর্মের প্রেরণা ছিল।

রবীন্দ্রনাথের প্রথম দিকের গানগুলি, অবশ্য নাটকের গানগুলো বাদ দিলে, অধিকাংশই ব্রহ্মসংগীত। অল্পবয়সে যে গানটি লিখে তিনি মহর্ষিদেবের কাছে পুরস্কৃত হন সেটি ব্রহ্মসংগীত—'নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে রয়েছ নয়নে নয়নে'—এটি উপাসনার গান। রবীন্দ্রনাথের গান তাঁর রচনাবলীতে বিভিন্ন ভাবে ভাগ করা আছে—প্রকৃতি, স্বদেশ, প্রেম ও পূজা। অবশ্য প্রেম ও পূজা মেশামেশি করেই আছে। কখন কখন প্রেম পূজায় উন্নীত হচ্ছে। যাঁরা আনুষ্ঠানিক পূজাঅর্চনায় বিশেষ বিশ্বাসী নন, আমাদের অল্পবয়সে রবীন্দ্রনাথের পূজার গানগুলিকে তাঁদের মধ্যেও নূতন এক আধ্যাত্মিক অনুভূতির জন্ম দিতে দেখেছি।

আমার মনে পড়ে আমরা রবীন্দ্রসংগীতের জন্য কি রকম কান পেতে থাকতাম—কিন্তু আমাদের কানেব তৃষ্ণা মিটিত না। তখন রেডিও ছিল কোথায়

ঘরে ঘরে? গ্রামফোন রেকর্ডে প্রথম যে রবীন্দ্রসংগীত শুনলাম সেটি কণক দাসের গলায়। শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ গানের যে উৎস খুলে দিয়েছিলেন সেখান থেকে ধারা গড়িয়ে এসে কলকাতার নগরজীবনের মরুভূমিতে পৌঁছতেই পারত না। মাঘোৎসব প্রভৃতি ব্রাহ্মসমাজের উৎসব বা কোনো নৃত্যোৎসব যা ক্রমে ক্রমে রবীন্দ্রনাথ প্রবর্তন করছিলেন, সেখানে আমরা রবীন্দ্রসংগীত শুনতে পেতাম। এখনকার মত এত সুলভ ছিল না বলেই আমাদের তৃষ্ণা চির অতৃপ্ত থাকত রবীন্দ্রনাথের গানের জন্য।

আমাদের ছোটবেলায় দুটি সমালোচনা খুব শুনতাম। একটি, রবীন্দ্রনাথ গানের মধ্যে কথার আধিক্য এনেছেন। দ্বিতীয়টি, রাগ-রাগিণীর শুদ্ধতা নষ্ট করেছেন।

ঠাকুরবাড়ির আবহাওয়ায় যে সংগীতচর্চা প্রাধান্য পেয়েছিল তাতেও সংগীত শাস্ত্রটাই মুখ্য ছিল—নাটকের মধ্যে সংগীতসংযোগে বিলাতি সুরের মিশ্রণ যতদূর মনে হয় জ্যোতিরিন্দ্রনাথই সুরু করেন। রবীন্দ্রনাথ শাস্ত্রের বন্ধন থেকে সংগীতের মুক্তি ঘটালেন। তিনি কবি, সুর তাঁর মধ্যে কথা কয়। সে কথা তিনি ত্যাগ করে শুধু স্বরের কসরত দেখাতে পারেন না। ওস্তাদের tradition ভাঙা তাঁর চিরদিনের অচলায়তনের বিরুদ্ধে অভিযানেরই অঙ্গ—এটা তার পক্ষে এতই স্বাভাবিক যে তিনি অনায়াসে দেশজ সুরের সঙ্গে শুদ্ধ রাগ-রাগিণীর মিশ্রণ করলেন অবলীলায়, যেমন করে পয়ারের স্পন্দন কাটিয়ে 'মুক্ত ছন্দ' বলাকায় সুরু করেছিলেন। নূতন পথের সন্ধানে চলে তাঁর সৃষ্টি। 'ছেলেবেলা'র স্মৃতিতে বলছেন: "শুধুমাত্র রসকে ভোগ করা নয় কিন্তু আপনাকে প্রকাশ করা যখন মানুষের অভিপ্রায় হয় তখন সে এই বিশেষত্বের বৈচিত্র্যকে ব্যক্ত করবার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে। তখন সে নিজের আশা-আকাঙ্ক্ষা হাসি-কান্না সমস্তকে বিচিত্ররূপ দিয়ে আর্টের অমৃতলোক আপনার হাতে সৃষ্টি করতে থাকে। আত্মপ্রকাশের এই সৃষ্টিই স্বাধীনতা। শাসনতন্ত্র যতই উৎকৃষ্ট হোক তার মধ্যে শাসিতের আত্মপ্রকাশের কোন ফাঁকই যদি কোথাও না থাকে তবে এ সোনার দড়িতে চির উদ্বন্ধন। মহাদেব নারদ ভরতমুনি মিলে পরামর্শ করে যদি আমাদের সংগীতকে এমন চির উৎকর্ষ দিয়ে থাকেন যে আমরা কেবল মানতে পারি, সৃষ্টি করতে না পারি তবে ঐ সুসম্পূর্ণতার দ্বারাই সংগীতের প্রধান উদ্দেশ্য নষ্ট হয়েছে বলতে হবে।"

বৈচিত্র্যময় বাস্তব জীবনের নানা অভিজ্ঞতার ভিতরে তরঙ্গিত তাঁর সুরের ধারা কথার সঙ্গে 'বাগর্থম ইব সম্পৃক্ত' হয়ে এক নূতন সৃষ্টি হল। সে বাঙালীকে যা দিল তা শুধু গান নয় তার অতীত কিছু। তার ধর্মচেতনা, তার প্রেম, তার ঈশ্বর ও

প্রকৃতি—বস্তুত তার সমগ্রজীবনবোধ ঐ গানের স্পর্শে তাকে যে আলোক-ভূমিতে নিয়ে যায় সেখানে 'গানের ভিতর দিয়ে' এ বিশ্বের এক আশ্চর্য রূপ আমরা দেখতে পাই।

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে সাত/আট বছর আগে যখন পূর্ববঙ্গে রবীন্দ্রসংগীত গাওয়া রাষ্ট্রবিরোধিতা বলে গণ্য হত তখন সে দেশ থেকে একটি তরুণ মুসলমান আমাকে লিখেছিলেন—"ধর্ম কি আমি জানি না, ঈশ্বর কি সে সম্বন্ধে আমার সংশয় আছে—কিন্তু আপনি কি বলতে পারেন কেন রবীন্দ্রসংগীত শুনলে আমার মনের অবস্থা এমন হয় যেন গভীর রাত্রে ঐ জানালাটা খুলে আমি মহাদিগন্তে কোথাও চলেছি! এর অর্থ কি বলতে পারেন?" আমি জানি এর কোন অর্থ নেই কারণ এ-উপলব্ধি বাক্যার্থের অতীত।

যাঁরা রবীন্দ্রনাথকে গান রচনা করতে দেখেছেন তাঁরা জানেন কথা ও সুর একসঙ্গে মেশামেশি করে কিভাবে উৎসারিত হত—গুন্‌গুন্ করে গান গাইতে গাইতে তিনি লিখতেন—সেই গানের বাণী ও সুরের বাণী তাই এক অভিন্ন সংযোগে মানুষকে নূতন সৃষ্টির সংবাদ দিয়েছে। ছোটবেলা থেকে এইটি দেখতে আমি এত অভ্যস্ত ছিলাম যে পরে যখন শুনেছি আধুনিক গানের রচয়িতা ও সুরকার ভিন্ন ব্যক্তি তখন আশ্চর্য হয়েছি।

সুর আসছে সুরকারের অন্তঃস্থল থেকে তাঁরই চিন্তার ও অনুভূতির বাণীতে দীপ্যমান হয়ে—সেই কারণেই রবীন্দ্রসংগীত আধুনিক শিক্ষিত মানুষের আন্তর-জীবনকে বিশেষভাবে স্পর্শ করতে পেরেছে। তাঁর নিজের জীবনের গতির সঙ্গেও সংগীতের গতি সমরেখায় প্রবাহিত—যে কবি অল্পবয়সে ব্রহ্মসংগীতের গান লিখেছিলেন তিনিই, বৃদ্ধবয়সে প্রকৃতির গান লিখলেন অজস্র—বসন্তের বনমর্মর শোনা গেল তাঁর পরিণত বয়সের গানেই বেশি। যে ধরনের ঈশ্বরোপাসনার আবহাওয়ায় তিনি অল্পবয়সে মানুষ হয়েছিলেন ক্রমেই তাঁর মত বিশ্বাস ও ধারণা তার থেকে সরে গেল—তাঁর বন্দনার প্রকৃতি গেল বদলে—তা আরও মানবমুখী ও বিশ্বসৌন্দর্যে আবিষ্ট হল—গীতাঞ্জলির কবির সঙ্গে পূরবীর বা জন্মদিনের কবির যে পার্থক্য, তাঁর সংগীতের বাণীতেও তা বোঝা যায়।

নিজের সংগীতসৃষ্টি সম্বন্ধে তিনি যত নিঃসন্দেহ ছিলেন এত তাঁর অন্যান্য কর্মগুলি সম্বন্ধে নয়। তিনি প্রায়ই বলতেন, আমায় ভুলতে পার কিন্তু আমার গান ভুলবে কি করে—। রবীন্দ্রসংগীত যে বাঙালীর জীবনের গভীরতম অনুভূতির সঙ্গে জড়িত রবীন্দ্রসংগীতের সেই তো প্রধান বৈশিষ্ট্য, এমন কোন মনের ভাব নেই, এমন কোন বেদনা নেই যা তাঁর গানের মধ্যে দোসর পায় না। সুর ও ভাবের মিলিত লীলায়

মনের এক গভীর পূর্ণতার স্বাদ পাওয়া যায়—জগতে আর কোন দেশে আর কোন কবি বা সুরকার এ কাজ করতে পেরেছেন কি না সন্দেহ। এই কাজটি সম্ভব হত না যদি তিনি সংগীতের অচলায়তনে বাস করতেন।

সুরের সাধনা ও সুর বোধ অনেকটাই বংশগত, খুব কম ক্ষেত্রেই এর আচমকা প্রকাশ দেখা যায়—অশিক্ষিতপটুত্ব সুরের রাজ্যে যেমন দেখা যায় এমন অন্যত্র নয়। জীবনের অতি গভীর থেকে উৎসারিত এই সুর তার সহজ স্বাভাবিক গতিতে একটি বিশেষ রূপ নিতে পারে—যাকে আমরা লোকশিল্প বলতে পারি। অন্যদিকে সাধনা সংস্কার ও জটিল কৌশলে সে গূঢ় ও শিক্ষাসাপেক্ষ বিদ্যা হয়ে ওঠে—একটা কাঠামোর মধ্যে পড়ে যায়, এরকমটা সব দেশেই হয়েছে—কিন্তু সমস্ত আর্টেরই গোড়াপত্তন মানুষের অনুভূতির স্বাভাবিক বেগে—গিরিনদীর মত সে অনেক বাঁকা পথ ধরে এগিয়ে চলে—সে কাঁটাঘাসের নিবর্তনায় বাঁধা থাকে না। পটুয়া যে পটের ছবি আঁকে তার মধ্যে বাঁকা লাইন থাকে, উঁচু নিচু, দূর ও নিকটের লাইনগুলোতে কত ভুলচুক, তবুও রেখা রঙের সমন্বয়ে মানুষের যে বাণী তার মধ্যে ব্যক্ত, তার একটি বিশেষ রূপ ছবির রাজ্যে চরম উৎকর্ষ ও ব্যাপক সাধনার পাশাপাশিই চলতে পেরেছে। তার গতি ক্ষুণ্ণ হয়নি। তাই কোনো দেশেই এবং কোন ক্ষেত্রেই শিল্প সাধনার উৎকর্ষের দ্বারা লোকশিল্প পরাজিত হয় নি।

যখন বৈঠকে ক্ল্যাসিক্যাল গানের নির্ভুল তাল মানে সুরের তরঙ্গ বইছে তখনও বাউল ধূলিধূসরিত পথে একতারা বাজিয়ে চলেছে, মাঝি গাইছে সারি গান— মাঠে মাঠে মেঠো সুর অশিক্ষিত মনের আনন্দ বেদনাকে ছড়িয়ে দিচ্ছে। যে আবহাওয়া থেকে বাল্যকালে রবীন্দ্রনাথ হৃদয়ে সুর সংগ্রহ করেছেন তা ক্ল্যাসিক্যাল সুরের বাঁধা পথ। সুরের শাস্ত্র তাঁর কাছে জলহাওয়ার মত সহজ হয়েছিল গোড়াপত্তন ছিল পাকা। কিন্তু সেই পাকা ইমারতের চতুর্দিকের দেওয়ালের মধ্যে আটকে পড়বার মত মন তাঁর নয়। তাঁকে যে বেরিয়ে পড়তে হবে, ছড়িয়ে পড়তে হবে, নূতন নূতন বিস্তারের দিকে। বাঁধা পথে ও বাঁধা গৎ-এ তাঁর কবিত্ব ও সুর বইবে না। সুরের এক নূতন জগৎ সৃষ্টি করতে পারলেন তিনি, কারণ, তাঁর শাস্ত্র জ্ঞান ছিল সম্পূর্ণ—কেমন করে মেলাতে হয় সে বিষয়ে তাঁর আবাল্যসংস্কার ভিতরে ভিতরে নিখুঁতভাবে কাজ করেছে। তাই তিনি বিলাতী সুরের সংগে দেশী, ক্ল্যাসিক্যালের সংগে দেশজ সুর এমনভাবে মিলিয়ে দিয়েছেন যে মিলনে এক অপূর্ব রসবৈচিত্র্য ঘটেছে। তা যদি না হত তাহলে আধুনিক সংগীতের সংগে রবীন্দ্র সংগীতের পার্থক্য এমন প্রকট হত না। সব মিলিয়ে তাই রবীন্দ্রসংগীত একটি সার্থক স্বতন্ত্র সৃষ্টি—নানা জোড়াতালের জগাখিঁচুড়ি নয়'। রবীন্দ্রনাথ ক্ল্যাসিক্যাল সংগীতের

শাস্ত্রবন্ধন ভেঙেছেন, এই জন্য অনেকে মনে করেন রবীন্দ্রসংগীতের সুরকেও ইচ্ছা মত ভাঙ্গাচোরা করতে পারেন। কিন্তু ক্ল্যাসিক্যাল সংগীত তো ব্যাকরণের মত, তার ভিত্তির উপর ভাষা গড়া হয়—কিন্তু তাই বলে একটি কবির কবিতার লাইনগুলো ওলট্ পালট্ করে নূতনত্ব করার চেষ্টা বিপজ্জনক। রবীন্দ্রনাথের গান তাঁরই গান। সুর ও কথা মেশামেশি করে আছে কাপড়ের বুনোটের মত টানা ও পোড়েনে—একটার থেকে আর একটাকে বিচ্ছিন্ন করলে সমস্ত সৃষ্টিটাই টুকরো টুকরো হয়ে যাবে।

রবীন্দ্রনাথের গানে যখন গায়ক ইচ্ছামত কাজ সুরু করেন তখন মনে পড়ে সুরের প্রত্যেকটি ভঙ্গী নিখুঁত করার দিকে কি ঝোঁক তাঁর ছিল এবং এজন্য কতটা পরিশ্রম তিনি করতেন। গান তো লেখা হল—অর্থাৎ গানের পদ্যভাগ নয়, সুরও সংযোজিত হল—গানের যে বাণী তারই সঙ্গে ঐ গানের অর্থকে সুরের বেদনায় তরঙ্গিত করে দিলেন—তারপর সেটিকে স্মরণ করে রাখবার জন্য ডাক পড়ত তখন যিনি সুরের ভাণ্ডারী থাকতেন তাঁকে। তাঁর দীর্ঘজীবনে নানা কর্মে সঙ্গীরা এসেছেন, গেছেন, অন্য কর্মে উপযুক্ত ধারক না পেলেও গানের জগৎ সৃষ্টি করবার জন্য স্থপতি তিনি পেয়েছিলেন।

এইখানে দিনেন্দ্রনাথকে স্মরণ করতে হয়, রবীন্দ্রনাথ যখন শান্তিনিকেতনের মরুভূমিতে বালখিল্যদের নিয়ে শিক্ষার এক নূতন পরীক্ষা সুরু করলেন—সহরের বিদ্যালয়ের কারাগার থেকে মুক্ত করে প্রকৃতির মাঝখানে তাদের সুরে রঙে রসে বিচিত্রভাবে ফুটিয়ে তুলতে চাইলেন, তাঁর মনের কথাটা সাধারণের ভাবনার থেকে এতদূর যে অনেকেই বুঝতে পারলেন না উনি করছেন কি। শিক্ষিতসমাজের বিজ্ঞ ব্যক্তিরাও এই প্রচেষ্টাকে পাগ্‌লামী মনে করছেন, কেউ বা বলছেন, ওখানে ছেলেরা নাচগান শিখে মেয়েলি হয়ে যাচ্ছে। যেন মেয়েরা তখন নাচে গানে পারদর্শিনী ছিল এদেশে! ঠাকুরবাড়ির লোকেরাও সম্ভবত কবির এই খেয়ালীপনায় সন্তুষ্ট ছিলেন না। জোড়াসাঁকোবাড়ির প্রাসাদ ও উক্ত সংস্কৃতির আবহাওয়া ছেড়ে কতগুলো বাউণ্ডুলে ছেলে নিয়ে খোড়োচালের মাটির ঘরে (কবি বেশির ভাগ মাটির ঘরেই থাকতেন) কিসের সন্ধানে আছেন তা সম্ভবত অনেকে বুঝতেই পারেন নি। অন্তত ঠাকুরবাড়ির বিশেষ কাউকে সেখানে দেখি নি। অবন ঠাকুর নিজেই লিখেছেন তিনি একবার মাত্র গিয়েছিলেন কবির জীবিত কালে। দ্বিজেন্দ্রনাথ ও দীপেন্দ্রনাথ অনেকদিন ছিলেন। সে যুগটা আমি দেখিনি। কিন্তু দিনেন্দ্রনাথ সস্ত্রীক বাস করতেন একটি ছোট দোতালা বাড়িতে। তিনিই রবীন্দ্রনাথের সুরের ভাণ্ডারী। গান লেখা হলে দিনেন্দ্রনাথের গলায় সুরটি তুলে দিয়ে তিনি নিশ্চিন্ত,

তারপর স্বরলিপি করে তাকে ধরে রাখার কাজ দিনেন্দ্রনাথের। স্বরলিপি তৈরি করতে দিনেন্দ্রনাথের কোনো বাদ্যযন্ত্র বা সুর ভেঁজে নেওয়ার দরকার হত না, ফস্ ফস্ করে প্রবন্ধ লেখার মত লিখে ফেলতেন।

দিনেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ দুজনকেই আমি গান গাইতে শুনেছি বহুবার বহু অবস্থায়, কখনো মনের আনন্দে গান শোনাচ্ছেন, কখনো বা শেখাচ্ছেন। দুজনের গলা ছিল দুরকম—দিনেন্দ্রনাথের গলা ভারি জলদগম্ভীর—গম্‌গম্ করত, তাঁর বিশাল শরীরের সঙ্গে তার সঙ্গতি ছিল। রবীন্দ্রনাথের গলা তীক্ষ্ণ মধুর উঁচুতারে বাঁধা, তাঁর শালপ্রাংশু ব্যূঢোবক্ষ শরীরেব সঙ্গে তা খুব সঙ্গত ছিল না, কিন্তু গলার অপূর্ব মাধুর্যে শ্রোতার মনকে দ্রব করত। অল্পবয়েসে যাঁরা তাঁর গলা শুনেছেন তাঁদের সাক্ষ্য থেকে সে কথা আবো জানতে পারি—কবির কাছে শুনেছি, একবার কোনো স্মৃতিসভায় গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিরা গান করবাব জন্য তাঁকে পীড়াপীড়ি করেন। তখন তাঁর গলা একেবারে ভালো ছিল না, কিন্তু অনুরোধে পড়ে গান করায় গলার নলীতে কোনো শিরা ছিঁড়ে যায়। সেই থেকে তাঁর আগের মত গান গাইবার শক্তি ছিল না। রবীন্দ্রনাথের গলায় কোনো কষ্টও হয়তো ছিল, কারণ তাঁর একটি অভ্যাস ছিল থেকে থেকে গলা খাঁকারি দেওয়া—এমনিতে খুব আস্তে কথা বলতেন, কিন্তু তাঁব গলাখাঁকাবি বহুদূব থেকে শোনা যেত। আশ্চয এই যে সেই শব্দটারও বৈশিষ্ট্য ছিল, কিংবা হয়ত আমি তাঁর এমনই ভক্ত ছিলাম যে আমার কানে তা একটি আভিজাত্যপূর্ণ সুন্দর ভঙ্গী বলে শোনাতো। এই প্রসঙ্গে একটা কথা মনে পড়েছে, তা লিখলে যদি অহমিকা বলে মনে হয় তাহলে আগেই মার্জনা চাইছি—আমাব 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ' বইটি যখন প্রবাসীতে প্রকাশিত হচ্ছে—পরশুরাম অর্থাৎ রাজশেখরবাবু মহাশয় আমাকে বলেছিলেন, 'তুমি জীবন্ত ডিক্টোফোন, তোমাব লেখা পড়তে পড়তে মনে হচ্ছিল এইবার কবি গলা খাঁকাবি দিয়ে উঠবেন।' অর্থাৎ যাঁরা তাঁর সঙ্গে কথা বলেছেন বা কাছাকাছি থেকেছেন তারা সকলেই জানেন এই অভ্যাসটি কবির প্রাত্যহিক ব্যবহারের একটি অনিবার্য অঙ্গ। তাই বলছি যৌবনকালে রবীন্দ্রনাথের গলা আমরা শুনিনি, কিন্তু তাঁর কাছেই শুনেছি কোনো সভায় বা জনসমাবেশে তাঁকে দেখলেই লোকে 'গান গান' করে আব্দার সুরু করে দিত, তা যে বিষয়েই সভা হোক। তাঁর অল্পবয়সে গানের গলা কি রকম ছিল সে সম্বন্ধে কবি নবীনচন্দ্র সেনের 'আমার জীবনে' বর্ণনা আছে।

রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে সেই রকম গান আমরা নিশ্চয়ই শুনিনি যা তাঁর সমবয়সীরা শুনে থাকবেন কিন্তু এই কণ্ঠস্বরের বর্ণনা আমরা চিনি। যেন শিশুর কোমল

অস্ফুট কণ্ঠের মত—এইরকম শেষ পর্যন্ত ছিল, বিশেষত 'ল' উচ্চারণে ইংরাজিতে যাকে বলে 'Lisping' সেই রকম মৃদু মধুর জিহ্বার উপর ভেসে যাওয়া শব্দ হত।

রবীন্দ্রনাথকে গান রচনা করতে যাঁরা দেখেছেন তাঁরা জানেন গানটি রচনা হলেই তিনি সেটি কারো গলায় তুলে দেবার জন্য ব্যস্ত হতেন। ডাক পড়ত তখন যিনি গায়কপ্রধান কিংবা প্রধানা। তার পরে বলতেন 'এখনই শিখিয়ে দিই নৈলে আজকাল ভুলে যাই, তারপরে ওরা বলে আপনার সুর ভুল হচ্ছে।'

দুটি দিনের কথা আমার খুব মনে পড়ে। একটি গানের 'কথা' অবশ্য একটি কবিতা থেকে নেওয়া—খৃষ্টের উপর পুনশ্চতে একটি কবিতা আছে 'মানবপুত্র'। বড় দিনের ঠিক আগের দিন, খুব সম্ভবত সেটা ১৯৪৮ শাল—আমাকে বিকেলবেলা বল্লেন 'খৃষ্টের উপর আমার একটা গদ্যকবিতা কোথায় আছে বার কর'। আমার মনে ছিল, আমি বের করে দিলুম। তখন বললেন 'এবার তুমি যাও আমি একটা গান তৈরী করব কালকের জন্য, খৃষ্ট জন্মদিনে এই গানটি হলে সাহেব খুশী হবেন।' সাহেব অর্থ সি এফ এন্‌ড্রুজ। তিনি তখন শান্তিনিকেতনে ছিলেন। সেই সময়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ঘনঘোর বিভীষিকা এঁদের দুজনের মনকেই ভারাক্রান্ত করে রাখত —বিশ্বাভিমুখী করুণাদ্রব এই দুই মনস্বী নিরুপায় ভাবে সেই পৈশাচিক লীলার দর্শক হয়ে যে দুঃখ পাচ্ছিলেন এই গানে সেই বাণীই রূপ নিয়েছে—"একদিন যারা মেরেছিল তাঁরে গিয়ে / রাজার দোহাই দিয়ে, / এ যুগে তারাই জন্ম নিয়েছে আজি/ মন্দিরে এসেছে তারা ভক্ত সাজি"—এ কথাটা খুব উপযুক্ত। কারণ সে সময়—নাৎসি জার্মানীতে ইংলণ্ডে জাপানে সর্বত্র গির্জায় ও মন্দিরে প্রার্থনার ঘণ্টা পড়ে যায়—প্রতি পক্ষই অপরের নিধন ও নিজের সাফল্যের জন্য ধর্ণা দিচ্ছে।

সেই কথাই রয়েছে বুদ্ধভক্তি কবিতায় ও প্রায়শ্চিত্তে—'ঐ দলে দলে ধার্মিক ভীরু কারা চলে গীর্জায়—চাটু বাণী দিয়ে ভুলাইতে দেবতায়?' কিংবা 'মুষ্টি উঁচিয়ে তাই চলে, বুদ্ধেরে নিতে নিজ দলে।' তারা একদিকে প্রার্থনা করছে অন্যদিকে 'মারো মারো' বলছে—'মারো মারো ওঠে হাঁকি গর্জনে মেশে পূজামন্ত্রের স্বর / মানব পুত্র তীব্র ব্যথায় কহেন হে ঈশ্বর / এ পানপাত্র নিদারুণ বিষে ভরা, / দাও ফেলে দাও, দাও ফেলে দাও ত্বরা / —সন্ধ্যেবেলা গান তৈরী হয়ে গেছে—গুন্‌গুন্ করছেন। ডেকে পাঠালেন ইন্দুলেখা দেবীকে তিনি তখন শান্তিনিকেতনে একজন প্রসিদ্ধা সুগায়িকা—বার বার করে গলায় তুলে নিলেন ইন্দুলেখা দেবী। কবি বললেন, 'কাল থেকে এ গান তোমার সম্পত্তি, আমি আবার গাইতে গেলে তুমি ভুল ধরবে।'

গান শেখাবার পদ্ধতিও ছিল অনলস—উদয়নের পশ্চিমের বারান্দায় আভনয়ের

মহড়া যাঁরা দেখেছেন তাঁরাই জানেন একটি লাইন বার বার করে গাওয়া হচ্ছে, উনি একবার গাইছেন ছাত্র বা ছাত্রী একবার গাইছে—আবার চলছে পুনরাবৃত্তি। নাচের বেলাও তাই। প্রত্যেকটি পদক্ষেপ পড়ছে, পছন্দ হচ্ছে না—আবার, আবার পুনরাবৃত্তি করে করে চলছে অক্লান্ত শিক্ষণ। একটি জাপানি ছেলে ছিল তার নাম কি ভুলে গেছি, তার নাচ খুব প্রাণবন্ত, তাকে শেখাচ্ছিলেন এই গানটির সঙ্গে নাচ—'বসন্তে ফুল গাঁথলো তোমার জয়ের মালা—'গাঁথলো'র উপর ঝোঁক দিয়ে তার পা ফেলা শতবার করে করছে, কবির পছন্দই হয় না। কিংবা 'বিঁধল হৃদয় নিদয় বাণে' সে একপাক ঘুরে গেল, কবি বসে বসেই তাকে গানের সঙ্গে নাচ শেখাচ্ছেন—বারবার গান গেয়ে গেয়ে। আর একদিনের কথা আমার খুব মনে আছে, অমিতা সেন ছিলেন সুগায়িকা। অতি অল্প বয়সে মারা গিয়েছেন। তাঁর গান কবি খুব পছন্দ করতেন। মায়ার খেলার মহড়া চলছে—অমিতা সেন গাইছেন 'অলি বারবার ফিরে যায় অলি বার বার ফিরে আসে—' সেই অলির মতই গানের কলি দুটি বারবার গাওয়া হচ্ছে। কিছুতেই কবির মনঃপুত হচ্ছে না। আমার স্থূল কানে কোন সূক্ষ্ম প্রভেদ লক্ষ্য হচ্ছে না কিন্তু তিনি ফিরে ফিরে অনলস প্রশান্তভাবে পুনরাবৃত্তি করে গান শেখাচ্ছেন। আমার মনে আছে রঙ্গমঞ্চে অভিনয় দেখার চেয়ে কবির পায়ের কাছে চুপচাপ বসে মহড়া দেখতেই বেশী আনন্দ পেতাম।

পর পর কত ছবি মনে আসে, সব তো লেখা যায় না। আর একটি শেষ দিনের কথা লিখছি, জানিনা ঐটাই তাঁর শেষ গান রচনা কিনা। যেবার ১লা বৈশাখ সন্ধ্যায় 'সভ্যতার সঙ্কট' পড়া হল সেবার কিছুদিন আমি তাঁর কাছে ছিলাম, সেই শ্রাবণেই তো চলে গেলেন—।

সেই দিনটা ছিল গ্রীষ্মের একটা দুপুর। উদয়নের বড় ঘ. কবি শুয়ে আছেন আচ্ছন্ন ভাবে, অধিকাংশ সময়ই তখন কোমার ঘোর থাকত। তারই মধ্যে 'সভ্যতার সঙ্কট' লেখা হয়েছে। ঘর অন্ধকার। রানু মুখার্জীর দেওয়া উপহার একটা এয়ার কণ্ডিসনার খট্‌খট্‌ করে চলছে—নিতান্ত নিরুপায় হয়েই ঐ যন্ত্রটা চালু করা হয়েছে। ডাক্তারেরা বলেন ঠাণ্ডা থাকলে বিষক্রিয়া কম হয়। কবি এসব যন্ত্রপাতি একেবারে পছন্দ করতেন না। এমন কি ফ্রিজিডিয়ারও তাঁর পছন্দ ছিল না। আসল কথা অত বাবুয়ানা তাঁর ভালো লাগতো না—রথী দা বলতেন, এটা জেদ বাবা বলেন ফ্রিজিডিয়ারে ফল থাকলে অখাদ্য হয়ে যায়—মোট কথা তিনি নিজের জন্য ওসব আরামদায়ক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করবেন না। ছেলে যদি করে তাঁর হাত নেই। তিনি তো গান্ধীজি নন কারুর উপর জোর জবরদস্তি করা তাঁর

চরিত্রবিরোধী। যাহোক সেদিন বন্ধ ঘরে যন্ত্র চলছিল—আমি মাটিতে মাদুর বিছিয়ে মীরাদেবীর রান্নার খাতা থেকে রান্না লিখছি। আমার বাঁহাত খাটের উপরে, দরকার হলে কবি ডাকবেন। সৌমেন ঠাকুর ঘরে ঢুকলেন—দীর্ঘদেহ, সুপুরুষ, দৃপ্তভঙ্গী, সেই প্রথম তাঁকে দেখলুম অন্তত আমার তাই মনে পড়ে, তিনি তো তখন একটি 'লিজেণ্ড' জার্মানীতে জেল খাটছেন শুনে অবধি আমরা তাকে বিশেষ রহস্যময় ব্যক্তি ভাবতুম। যদিও তখন সবাই জেলে যাচ্ছে—সেটা কিছুই নয়, কিন্তু জার্মানীতে জেলে থাকা বিশেষ একটা ব্যাপার—সৌমেনবাবু এসে খাটের পাশে দাঁড়ালেন—'রবিদা', 'কি সৌম্য এখন যাবার সময় হল?' সৌম্যবাবু বল্লেন 'রবিদা তুমি নমো যন্ত্র নমো যন্ত্র' গান লিখে যন্ত্রের বন্দনা করেছ এ কি ভালো। এবার মানুষের কথা কিছু লেখ।' আমি অবাক হয়ে ভাবছি জার্মানীর জেলফেরৎ ভদ্রলোক বলে কি? সারাজীবন তো ইনি মানুষের গানই লিখলেন, ইনি তো যন্ত্রবিমুখ—কিন্তু বললাম না। কারণ আমাদের সময় স্বল্প পরিচিত পুরুষমানুষের সঙ্গে কথা বলার রেওয়াজ ছিলনা। তাছাড়া বয়োজ্যেষ্ঠর সঙ্গে তর্ক করাও ধৃষ্টতা বলে গণ্য হত। যদিও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে অনেক ধৃষ্টভাবে তর্ক করেছি—কারণ তাঁকে 'তাই বুঝি সব ছোট যারা তারা যে কোন বিশ্বাসে এক বয়সী আমায় বলে চিনেছে এক নিঃশ্বাসে।' যাক আমি ভাবছিলাম কবি হয়ত সেকথাই বলবেন। কিন্তু তা বললেন না রাজি হয়ে গিয়ে বললেন 'আচ্ছা লিখব।' সেই দিনই বিকেলবেলা ওই আশ্চর্য গানটি লিখলেন—'ঐ মহামানব আসে'। যুদ্ধ জর্জরিত পৃথিবীর মত রবীন্দ্রনাথেরও প্রার্থনা মহামানবের আবির্ভাব হোক। গানটি আমি লিখে নিলাম। সন্ধ্যাবেলা শান্তিদেব ঘোষকে ডাকলেন।. তিনি এলে আমায় গানটি এনে দিতে বললেন। এই গানে সুর দিতে গলায় সুর আনতে তাঁর কষ্ট হচ্ছিল, এই নিদারুণ রোগশয্যায় সুরের ধারা প্রতিহত হত। অনেক সময় নিজের গানের রেকর্ড বাজিয়ে শুনতেন। একদিন মনমত সুর হল না ক্ষুণ্ণ মনে বললেন 'অর্জুন আর তার গাণ্ডীব তুলতে পারছে না। এই ছোট্ট একটি কথার মধ্যে সেদিন মহাপরিণামের যে বেদনা আমার মনে হঠাৎ উচ্ছসিত হয়েছিল আজও সেদিনের কথা মনে পড়লে দেখি তা তেমনি তাজা আছে।

'সভ্যতার সঙ্কট' পড়া হলে এই গানটি দিয়ে শেষ হবে। ১লা বৈশাখ রবীন্দ্র জন্মোৎসব পালন হত। শান্তিনিকেতনে গরম পড়ে যায় অথচ জন্মোৎসব না করে ছুটি হয়ে গেলে কারু ভালো লাগেনা তাই কবি ঐ নিয়ম করলেন, তারিখে কি এসে যায়? ১লা বৈশাখই ধরে নাও আমার জন্মদিন। উদয়নের সামনের চত্বরে

উড়িষ্যার বিচিত্রবর্ণের সামিয়ানার নিচে সভা হয়। রোগক্লান্ত রবীন্দ্রনাথ একটা বড় চেয়ারে বসে রইলেন। ক্ষিতিমোহন সেন প্রবন্ধটি পড়লেন। ঐ প্রবন্ধের শেষদিকে নতুন মানুষের অভ্যুদয়ের যে আশার বাণী আছে এই গানটিতে তাকেই বন্দনা করা হয়েছে। কিন্তু শান্তিদেবকে গানটি শেখাতে শেখাতে তাঁর আশঙ্কা হচ্ছে লোকে ভুল বুঝবে নাতো, এই বোকার দেশে কেউ ভাববে নাতো এ নিজের জন্মদিনে নিজেরই বন্দনা লিখেছে! যাক, গানের কথা লিখতে গিয়ে অন্য পাঁচালী হয়ে গেল। কি আর করা যাবে! আগেই বলেছি সুরেব গুরুর কাছ থেকে সুরের দীক্ষা আমার নেওয়া হয় নি। কারণ আমার গলায় গান নেই।

এনড্রুজ সাহেব

এনড্রুজ সাহেবের কথা মনে পড়লে আমার ছুটি দিনের কথা খুব মনে পড়ে—একদিন রথীন্দ্রনাথের সঙ্গে শ্রীনিকেতনে চলেছি—রথীন্দ্রনাথের মোটর গাড়িটি ছিল ভিতরে পাটি দিয়ে মোড়া খস্‌খস্‌ লাগানো। তখনকার যুগের শীত তাপ নিয়ন্ত্রণ ভাল মতই হত। সে সময়টা গ্রীষ্মকাল, লাল মেঠো পথ ধুলোয় ধুলোময়। গাড়ি চললে লাল ধুলো উঠে পথিককে রাঙ্গিয়ে দেয়।

গাড়ী কিছুদূর যেতেই দেখি খালি মাথায় খালি পায় ধুতি পরে বৃদ্ধ এনড্রুজ চলেছেন শ্রীনিকেতনে—রথীদা গাড়ি থামিয়ে নেমে পড়লেন, অনেক অনুরোধ করলেন উনি কিছুতেই গাড়িতে উঠলেন না। তিনি হেঁটেই যাবেন। অগত্যা সেই দারুণ গ্রীষ্মে রোদের মধ্যে ধুলি-ধূসরিত বৃদ্ধ হেঁটে চললেন—আমরা ধুলোর ঝড় তুলে এগিয়ে গেলাম—আমাদের ছুজনেরই অত্যন্ত অপ্রস্তুত লাগছিল। কিন্তু এইসব দুর্ধর্ষ বৃদ্ধদের সঙ্গে পারবার উপায় নেই। আমি বা রথীন্দ্রনাথ কেউই ঐ রৌদ্রে শ্রীনিকেতন হেঁটে যেতে পারতুম না। শান্তিনিকেতনে অনেকেই পারতেন। আমরা নয়। আমি তো শান্তিনিকেতনের ছাত্রী নই আর রথীদা খুব আয়েসী হয়ে পড়েছেন—কাজেই বিবেকের দংশন সহ্য করেও আমরা গাড়িতেই চলতে লাগলাম—কিন্তু সেদিনকার ভ্রমণসুখের মধ্যে একটু খাদ মিশে গেল—নিঃসন্দেহে নিজেদের ছোট মনে হচ্ছিল।

পরের দিন সকালে কবির কাছে এই গল্প করছি এমন সময় সাহেব এলেন সুপ্রভাত জানাতে, এসেই 'গুরুদেব' বলে গলা জড়িয়ে ধরলেন—গুরুদেব বল্লেন, কালকের গল্প শুনছিলাম—আমি এই কন্যাটিকে বলতে যাচ্ছিলাম তোমরা আমার শত্রুতা করছিলে কেন? সাহেবের এনার্জিটা শান্তিনিকেতন আর শ্রীনিকেতনে হাঁটাহাঁটি করে শেষ করে ফেলতে দাও—নৈলে এখুনি ফুজিদ্বীপে চলে যাবে।

আর মনে পড়ে সেদিনকার কথা যেদিন অমিয়বাবু কবির কাছে তাঁর এই পরম ভক্ত সাধুটির মৃত্যুশয্যার বর্ণনা করছিলেন। কবি বসেছিলেন পশ্চিমের বারান্দায় একেবারে "চারুবাবুর ঘরের" পিছনে, বড় বারান্দার দিকে একটা ফ্রেমে বাঁধান পাটির পার্টিশনের আড়ালে—অমিয়বাবুকেও আমি দেখতে পাচ্ছিলাম না—অমিয়বাবু বলল্লেন বড় অপারেশন (প্রষ্টেট গ্ল্যাণ্ড) হবে, না ছোট অপারেশন হবে (সুপ্রাপিউবিক) এই নিয়ে দ্বিধা ছিল। বড় অপারেশন খুব যন্ত্রণাদায়ক, গ্ল্যাণ্ড ছিঁড়ে আনতে হয়। গান্ধীজি বললেন সুপ্রাপিউবিক করে সারাজীবন থলি

নিয়ে অক্ষম জীবন রেখে লাভ কি? তিনি এন্‌ড্রুজ সাহেবের গালে হাত বুলিয়ে বলেছিলেন—'Be courageous Charlie।' এন্‌ড্রুজ সাহেবের চোখে আলো জ্বলে উঠল—মৃত্যুসাগর পার হবার অভয় মন্ত্র নিয়ে বন্ধুকে বললেন 'তাই হবে।' অমিয়বাবু শেষ সময়কার যন্ত্রণা ও তাঁর অসীম ধৈর্যর কথা বলছিলেন আমি কবির কোনো কথা শুনতে পাইনি দু একবার গলা খাঁকারি শুনেছিলাম—পরে অমিয়বাবু আমাকে বলেছিলেন কবির উচিৎ ছিল এ সময়ে তাঁর কাছে থাকা। সাধারণভাবে এ সমালোচনা ঠিকই—কিন্তু পরে আমার মন বলেছিল সেটা তাঁর পক্ষে অসম্ভব। তাঁর চরিত্র বিরোধী। কখনই তিনি প্রিয়জনকে বেশী আঁকড়ে ধরেন না। শমীর মৃত্যুর শেষ সময়টা তিনি পাশের ঘরে বসে তাকে ত্যাগ করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। আমাকে হেমলতা ঠাকুর বলেছিলেন—মা মারা যাবার পর শমী তো বাপকে আঁকড়ে ধরল—বড় হয়েও তার ইচ্ছা বাবার সঙ্গে বাবাকে জড়িয়ে শোয়। উনি তা কিছুতে করবেন না। ছেলে আদুরে হয়ে যাবে। ঐ যে সে যতটা চেয়েছিল ততটা দিতে পারেননি শমীর মৃত্যুর পরে এটাই তাঁকে শেল বিঁধেছিল। রবীন্দ্রনাথের চরিত্রের এই দিকটা নিয়ে আরো কিছু আমার বলবার আছে—।

[illegible] এন্‌ড্রুজ সাহেবের মৃত্যু সময়ের আর একটা স্মৃতি মনে পড়েছে। এন্‌ড্রুজ সাহেব মারা গেলেন ১৯৪০ শালে। ১৯৪১ শালে কবি চলে গেলেন—১৯৪০ শালে সেপ্টেম্বরে অসুস্থ কবিকে কালিংপং থেকে নামিয়ে জোড়াসাঁকোয় আনা হয়েছে—দিন সাতেক পরে একদিন খুব বাড়াবাড়ি অবস্থা। তখন রাত্রি দুটো হবে। রুগী restless—নন্দিতা এসে আমার পাশে দাঁড়াল—'মৈত্রেয়ীদি প্রস্তুত হও। মোটেই ভালো নয় অবস্থা—'

'কেন বুড়ি, কি হয়েছে, আমি তো একই রকম দেখছি'—

"বিধানবাবুকে পাওয়া যাচ্ছে না, তিনি শিলং চলে গেছেন।"

"তাইতো, কি হবে?"

"সেজন্য নয়, যখন আশা থাকে না তখন ডাক্তার আসে না, এন্‌ড্রুজ সাহেবের সময়ও তাই হল ললিতবাবু আর এলেন না!"

আমি ভাবতে লাগলুম—তবে অপারেশন করলেন কেন—কবির বেলাও ঠিক তাই হল—অপারেশন তিনিও চাননি বলেছিলেন, যে নিয়মে ঝরে যায় গাছের পাতা আমি তেমনি স্বাভাবিক ভাবেই মৃত্যুকে চাই। কিন্তু আজকের বৈজ্ঞানিক যুগে কি আর তা হয়! আজ এনড্রুজ সাহেবের শতবার্ষিকী উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর প্রগাঢ় অনুরাগের কথা মনে পড়ছে। সে সম্বন্ধে আরো অনেক কথা আমাদের সংগ্রহ করা উচিত ছিল তা হয়নি আজ তাই তাঁর নিজের রচনা থেকে

রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলির কতক অংশ অনুবাদ করে দিচ্ছি। যে বইতে এই অংশটি আছে তার নাম "What I owe to Christ.—"

সি এফ এনড্রুজের রচনা হইতে—

"ডারবানে ভারতীয় প্রশ্নের খানিকটা মীমাংসা হলে আমি ইংলণ্ডে ফিরে গেলাম। মিঃ গোখলে লণ্ডনে অসুস্থ ছিলেন—তাঁকে দেখতে ও আমার বাবার কাছে কিছুদিন থাকতে গেলাম। তারপরে যখন ভারতবর্ষে ফিরে এলাম তখন সেখানে নূতন জীবন উদ্বেলিত হয়ে উঠছে, পুরোণো সমাজের আলগা বাঁধনগুলো ছিঁড়ে ছিঁড়ে পড়ছে। এইখানে খৃষ্টধর্মের নূতন পরীক্ষার প্রয়োজন আছে। কিন্তু আমার মধ্যে যে পরিবর্তন এসেছিল সেটা বলতে হলে কিছু আগের কথা বলতে হবে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম ভারতবর্ষে আসা পর্যন্তই আমাকে পথ নির্দেশ করছিল। ভারতীয় সাহিত্যে ও দার্শনিক চিন্তায় যা কিছু মহৎ তাঁর মধ্যে প্রকাশিত হচ্ছিল। তাঁর চরিত্র তাঁর রচনার মতনই মহিমাময়ী। তাঁর সঙ্গে আর দেখা হয়নি কেন না দিল্লি কলিকাতা থেকে এক হাজার মাইল দূর। কিন্তু Willie Pearson বাংলাদেশে ছিলেন—তাঁর কাছে আমি কবির কথা শুনতাম। গভীর ভক্তি ও ভালবাসার সঙ্গে Pearson তাঁর কথা বলত। অবশেষে কবির সঙ্গে দেখা করবার জন্য যে গভীর আগ্রহ ছিল তা মিটল—ভারতে নয় লণ্ডনে। ১৯১২ শালের গ্রীষ্মের মনোরম সন্ধ্যায় রথেনষ্টাইন হ্যামষ্টেড-হীথের ধারে তাঁর বাড়িতে আমাদের নিমন্ত্রণ করেছিলেন—কারণ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও W. B. Yeats গীতাঞ্জলি থেকে আমাদের পড়ে শোনাবেন।

কবির গান শুনতে শুনতে ও কবিকে দেখে সেই রাত্রে ভারতের বিরাট বিশ্ব-সভ্যতার সুকুমার সৌন্দর্য্য আমাকে প্রবলভাবে অভিভূত করে দিল। কবি তখনো লণ্ডনে অপরিচিত এবং তাঁর শরীর ভাল ছিল না। আত্মসঙ্কোচ ও প্রবল নির্জনতাবোধ তাঁকে যেন একেবারে সঙ্কুচিত করে ফেলেছিল। তাঁর কবিতা পড়া হচ্ছিল তিনি যেন নিজেকে একেবারে অদৃশ্য করে মিশিয়ে রেখেছিলেন। আমি যখন তাঁর সঙ্গে কথা বলতে গেলাম তখন আমার মন এমনই পূর্ণ হয়েছিল যে কথা বলার শক্তি ছিল না। মনে হল তিনি যেন আপনা হতেই বুঝে নিলেন আমার অনুভূতির তীব্রতা—কোন নিয়ম মাফিক ধন্যবাদ দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। আমি বেরিয়ে এসে হ্যামষ্টেড হিথের উপর ঘণ্টার পর ঘণ্টা বেড়াতে লাগলাম। যা দেখেছিলাম আর যা শুনেছিলাম আমার জীবনে তার তাৎপর্য কি হবে তাই আমি ভাবছিলাম। সে রাত্রে আমার আত্মদৃষ্টি উজ্জ্বল হয়েছিল। শুতে যাবার আগে আমি একেবারেই ঠিক করে ফেল্লাম কবি যদি আমাকে অনুমতি করেন তবে

আমি শান্তিনিকেতনের আশ্রমে যাব—সেখানে গিয়ে আমি ভারতবর্ষকে খুঁজব আমি তাকে জানব। দিল্লিতে বিদেশী মিশনে থেকে তেমন করে কখনই জানা যাবে না। আমি আনন্দের সঙ্গে আবিষ্কার করলাম যে Pearson ও ঠিক তাই ঠিক করেছে এবং কবির অনুমতি পেয়েছে। তখুনি আমার এই পরিকল্পনা নিয়ে অগ্রসর হওয়া সম্ভব ছিল না—কিন্তু যতদিন দক্ষিণ আফ্রিকায় ছিলাম এই ভবিষ্যতের আশার আনন্দ আমাকে অনেক দুঃখ কষ্টের মধ্যে পোষণ ও ধারণ করে এসেছে।......

কবি তাঁর মুক্ত হৃদয়ের উদারতা দিয়ে আমি যেমন তেমন ভাবেই আমাকে গ্রহণ করলেন। খৃষ্টান পাদরীর কর্মে কোন বাধা দিলেন না। আমি শান্তিনিকেতনে থাকতাম। প্রতি রবিবার বর্দ্ধমানের চার্চে প্রচার করতাম। তার পরে Trinity Sunday এলো এবং athanasian creed আমাকে পাঠ করতে হল চার্চের একমাত্র যাজক বলে। আমি তখন সবে শান্তিনিকেতনে এসেছি এবং সেখানকার শান্তিপূর্ণ আবহাওয়ায় যারা খৃষ্টান নয় এমন লোকেদের সঙ্গে বাস করছি এবং তাদের প্রতি মন প্রেমে পূর্ণ হয়ে আছে। আমার হঠাৎ খেয়াল হল যে ঐ প্রার্থনার নিন্দাকারী অংশটি আমি উচ্চারণ করব অথচ এদের সঙ্গে মিলিত থাকব তা হতে পারে না। তখন থেকে আমি প্রার্থনা থেকে ঐ অংশটা বাদ দিলাম কিন্তু বুঝলাম এটা কেবল আমার বিবেককে চোখ ঠারা হল এবং ভীরুর মত ব্যবহার হল। শান্তিনিকেতনে ফিরে আসার পর যখন কবির পবিত্র মুখচ্ছবি দেখলাম—তিনি আমার দিকে তাকিয়ে ছিলেন—তখনই আমি বুঝলাম যে আমি অসত্য পথে চলেছি এবং এখনই আমাকে এর চূড়ান্ত নিস্পত্তি করতে হবে। তার স্বচ্ছ চোখ দুটি আমার চোখের দিকে তাকিয়ে ছিল আমার মনে হল আমি যেন Day of Judgement-এর দিনে খৃষ্টের সামনে দাঁড়িয়ে আছি। আমি তাঁর পবিত্র আত্মার সামনে দাঁড়াতে পারছিলাম না। তাই যা যা ঘটেছিল সমস্তই তাঁর কাছে স্বীকার করলাম এবং সেইদিন থেকেই আমি কি করব কেমন করে সত্যকে পাব তা স্থির করলাম। কবি বিচলিত হলেন। তিনি আমাকে বল্লেন তাড়াতাড়ি কিছু না করতে কিন্তু যে মিথ্যার খাদের ধারে আমি দাঁড়িয়ে আছি তখন তা আমি বুঝতে পেরেছি। হঠকারিতা নয়। আমি যা করলাম তা দীর্ঘদিনের নৈতিক যুদ্ধের পরিণাম। দুইটি চিঠি সেই দিনই আমাকে লিখতে হল—লেখা কঠিন ছিল, একটি বিশপকে, তাঁকে জানাতে যে কি কারণে আমি বর্দ্ধমানের চার্চে আর রবিবারে প্রার্থনা করতে পারব না। দ্বিতীয় চিঠিটি লিখতে হল আমার বাবাকে। সেদিন থেকে আমি আর কখনো যাজকের কর্ম করিনি।

শান্তিনিকেতন আশ্রম রবীন্দ্রনাথের বাসভূমি, কাহিনী, সৌন্দর্য ও রোমান্সে পূর্ণ। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাঁর কর্মজীবনের শেষে একটি বানপ্রস্থের উপযুক্ত স্থান খুঁজছিলেন—যেখানে শেষ জীবন শান্তিতে কাটাতে পারবেন। একটি অনুর্বর জায়গা—এখানে খুব ডাকাতের অত্যাচার চলত—সেখানে পৌঁছে পাল্কি বেহারারা আর অগ্রসর হতে ভয় পেল। কিন্তু বৃদ্ধের বিশ্বাস তাদের ভীরুতা জয় করে নিল। তিনি কিছুদূরে একটু উঁচু জমির উপর দুটি বৃদ্ধ গাছের নীচে তাঁকে নিয়ে যেতে বল্লেন। তখন সৌন্দর্যের পূর্ণ পসরা উন্মোচন করে সূর্য পশ্চিমে অস্ত যাচ্ছে। ঐ গাছের নীচে বসে, পশ্চিম দিগন্তের দিকে তাকিয়ে ঈশ্বরের অস্তিত্বের অনুভব তাঁর মনে এমন একটি আনন্দ উপলব্ধি জাগিয়ে তুলল যে সারারাত্রি তিনি জেগে রইলেন —সকালবেলা তিনি স্থানটির নাম করলেন—শান্তিনিকেতন। সেখানে একটি আশ্রম বানিয়ে দীর্ঘদিন তিনি বাস করলেন—বেশীর ভাগ সময়ই নীরব ধ্যানে কাটাতেন। তিনি তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র—রবীন্দ্রনাথ, আজ যিনি জগৎ বিখ্যাত কবি, তাঁকে পাশে বসিয়ে রাজা রামমোহন রায়ের ও তাঁর নিজের রচিত ভক্তি সঙ্গীত শুনতে ভাল বাসতেন।

রাজা রামমোহন তাঁর যৌবনের গুরু ছিলেন এবং গোঁড়া হিন্দুধর্ম থেকে তিনিই তাঁকে পথ দেখিয়ে ব্রাহ্ম সমাজের বিশ্বধর্মে উত্তীর্ণ করেছিলেন। মহর্ষির পুত্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পিতার কাছে থেকে এই ধর্মেরই শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন।

একটি মর্মস্পর্শী সত্য গল্প প্রচলিত আছে—মহর্ষি যখন একদিন সন্ধ্যায় ধ্যানে বসেছেন তখন একটি ডাকাতের দলের সর্দার চুপিচুপি সেখানে এসে উপস্থিত হয়েছিল। সে শুনেছিল যে ঐ গাছ দুটির নীচে অনেক সোনা লুকান আছে এবং সেইজন্য মহর্ষি ঐ বিশেষ স্থানটিতে বসে থাকেন। তাই সে একটি ছোরা নিয়ে মারবার জন্য এগিয়ে এসেছে। ঠিক সেই মুহূর্তেই মহর্ষি তাঁর ধ্যানমুদ্রিত চোখ খুলে দস্যুর দিকে তাকালেন। সেই দৃষ্টিতে ও তাঁর মুখে যে শান্ত ভাব বিচ্ছুরিত হচ্ছিল তারই ফলে ডাকাতের হাত থেকে ছোরা পড়ে গেল। সাধুর পদতলে পড়ে সে নিজের অপরাধ স্বীকার করল। মহর্ষি ধীরে ধীরে উঠে তাকে আলিঙ্গন করলেন—সেইদিন থেকেই সে তাঁর শিষ্য—তার আমূল পরিবর্তন হয়ে গেল এবং সে শেষ দিন পর্যন্ত ঈশ্বরের কাজে নিযুক্ত হয়ে গেল।

আমি আশ্রমে আসার অল্পদিন পূর্বে মহর্ষি অতি পরিণত বয়সে মারা গিয়েছিলেন। আশ্রম তখন তাঁর স্মৃতিতে পূর্ণ ছিল। তাঁর ধ্যানের আসনের কাছে সেই বৃক্ষের নীচে তাঁরই স্মৃতিতে উৎকীর্ণ আছে একটি লেখা—

তিনিই আমার আত্মার শান্তি
তিনিই আমার প্রাণের আরাম

এখানে ঈশ্বরকে আনন্দ, শান্তি ও বিশ্রামের উৎসরূপে উল্লেখ করা হয়েছে এবং যারা মহর্ষির সঙ্গে বাস করেছে তারা আমাকে বলেছে—তাঁর সুন্দর মুখে যে শান্ত জীবনের ছবি প্রতিবিম্বিত হয়েছিল তার কথা। অনেকে আমাকে এ কথাও বলেছে যে তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বয়সের সঙ্গে সঙ্গে অনেকটাই তাঁর মত দেখতে হয়েছেন।

তিনটি নিয়ম আশ্রমের প্রবেশের সীমায় লেখা আছে—প্রথম, পূজার জন্য কোন মূর্তি প্রতিষ্ঠিত করা চলবে না। দ্বিতীয়, আশ্রমের সীমার মধ্যে কোন প্রাণ নষ্ট করা হবে না। তৃতীয়ত, ধর্ম সম্বন্ধে কোন বিতর্ক চলবে না। এই তিনটি বাধা ছাড়া সমস্ত নর-নারী জাতি বা ধর্ম নির্বিশেষে ঐ আশ্রমে স্বাগত।

সপ্তাহে একদিন অতি প্রত্যুষে কবি নিজে আশ্রম বালক-বালিকাদের অতি সরলভাবে ঈশ্বর বিষয়ে বলেন। তারা প্রতিদিন প্রভাতে ও সন্ধ্যায় স্থির হয়ে ধ্যানে বসে—এইটুকুই তাদের নবীন বয়সের ধর্মজীবন।

শান্তিনিকেতনের এই শান্তিপূর্ণ আশ্রয়ের মাঝখানে হঠাৎ য়ুরোপের যুদ্ধের খবর যেন একটা ভূমিকম্পের ধাক্কার মত আমার উপর এসে ভেঙ্গে পড়ল। ভেঙ্গে দিল আমার অনেক স্বপ্ন—মনে হল যেন খৃষ্টকথিত সেই বিচারের দিন উপস্থিত হয়েছে—যেদিন মানবপুত্র আবির্ভূত হবেন।

……যখন যুদ্ধ পুরোপুরি আরম্ভ হয়ে গেল এবং আমার স্বদেশ তাতে জড়িয়ে পড়ল তখন নানা সন্দেহে, প্রশ্নে ও দ্বিধায় বিচলিত ও বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিলাম—অবশ্য যদি কেবলমাত্র স্রোতে ভেসে যাওয়াই ইচ্ছে না হয় তা হলে তখনই একটা কিছু নিশ্চিতভাবে স্থির করতে হয় অর্থাৎ নির্দিষ্ট পথ পাওয়া চাই। প্রথম দৃষ্টিতে যুদ্ধের মধ্যে অনেক কিছুই মহৎ উচ্চ ভাব দেখা গিয়েছিল। প্রত্যেক দেশেরই নবীনজীবন বিনা আপত্তিতে বিনা দ্বিধায় মৃত্যুর দিকে পা বাড়িয়েছিল। যা সত্য এবং ন্যায় বলে আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করেছে তার জন্য প্রাণ এবং প্রাণের চেয়ে প্রিয়তর যা কিছু সবই বিসর্জন দিতে প্রস্তুত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর সূক্ষ্ম সংবেদনশীল উচ্চ তারে বাধা মনে যে বিপুল নৈতিক সংকটের ভিতর দিয়ে মানবজাতি চলেছে তা গভীরভাবে অনুভব করেছেন। এ বৎসরেরই প্রথম দিকে আমি তাঁর সঙ্গে ছিলাম—তখন তিনি এক দারুণ কষ্টকর অন্ধকারময় মনের অবস্থায় ছিলেন—সেই বেদনার গভীরতার কোন কারণই ছিল না যেন পৃথিবীতে এক মহা দুর্যোগ আসন্ন হয়েছে এমনই তাঁর মনে হচ্ছিল অবশেষে যখন যুদ্ধ সুরু হল তখন তিনি একটি পরম আশা অবলম্বন করেছিলেন যে পুরাণ পৃথিবীর ধ্বংসাবশেষের ভিতর থেকে নূতনতর আর সুন্দরতর পৃথিবী জাগ্রত

হবে। এই ভাবটি তিনি তাঁর একটি মহত্তম কবিতায় প্রকাশ করেছিলেন—The trumphet বা শঙ্খ। তার পরে ১৯১৪ সালের খৃস্টমাস দিনে তিনি আর একটি কবিতার অনুবাদ আমাকে উপহার দিলেন—কবিতাটির নাম "বিচার"। তাঁর বহু স্নেহোপহারের মধ্যে এইটি অমূল্যতম। পৃথিবীর গভীরতম দুঃখের দিনে তাঁর মনের প্রথম প্রতিক্রিয়াই আমি এখানে বর্ণনা করেছি। কিন্তু আধুনিক যুদ্ধে যে পশুত্ব ও নিষ্ঠুরতা লোভ এবং মিথ্যা ওতঃপ্রোতঃ হয়ে আছে তা তাঁকে গভীরভাবে আতঙ্কিত করল, তাঁর অন্তরাত্মায় নাড়া দিল এবং তিনি ক্রমেই যেমন কষ্টকর বছর-গুলি এগিয়ে যেতে লাগল তেমনই যুদ্ধকে উত্তরোত্তর ঘৃণা করতে লাগলেন—সেই ঘৃণার তীব্রতা ক্রমেই বাড়তে লাগল। । আমার অন্তরের মধ্যে যে দ্বিধা ছিল সেই দ্বিধাই আমার নৈতিক অধঃপতনের প্রধান প্রমাণ—কারণ বিশ্বব্যাপী উত্তেজনার ছোঁয়াচের মধ্যে আমার যথেষ্ট শক্তি ছিল না যে আমি স্রোতের বিরুদ্ধে দাঁড়াই। যোদ্ধভাব আমার মনের মধ্যে বেশ একটা খুঁটি গেড়ে ছিল এবং অনেকদিন পর্যন্ত আমি তাকে দমন করতে পারছিলাম না। যে অধীর আগ্রহে আমি যুদ্ধের প্রত্যেকটি খবর প্রতিদিন সংগ্রহ করতাম তাতেই আমি যুদ্ধ স্পৃহার গুপ্ত শক্তি আমার মনের ভিতরে উদ্বেলিত হয়ে উঠছে বুঝতে পারতাম—কিন্তু যখনই তা প্রকাশ পেত আমি নিজেকে এজন্য ঘৃণা করতাম এবং আমার মধ্যে যে অংশ শ্রেষ্ঠ সে ওর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করল—কারণ সর্বদাই স্থির মনে ভাবলে আমি বুঝতাম যে যোদ্ধভাব খৃষ্ট ভাবের নিশ্চয় বিপরীত। শীঘ্রই আমি আরো আবিষ্কার করলাম যে শত্রুর প্রতি ঘৃণা কি রকমভাবে মিথ্যার ও মিথ্যাচারণের স্রোত বইয়ে, বাতাস করে জ্বালিয়ে তোলা হচ্ছে—এতেই আমি সাবধান হয়ে গেলাম। অবশেষে আমার চোখ থেকে আবরণ পড়ে গেল—আমি শান্ত মনে অথচ ভীত হয়ে নিউ টেস্টামেন্টের আশ্রয় নিলাম, আরও সাবধানে এবং পূর্ণভাবে খৃষ্টের কথাগুলি অনুধাবন করবার জন্য। তাঁকেই আমার পথপ্রদর্শকরূপে নিয়ে দু' মতের মধ্যে আন্দোলিত হওয়া চলে না। ঈশ্বর ও ম্যামনের সেবা একসঙ্গে হবে না। তাঁর পরিষ্কার বাক্যের মধ্যে কোন অসচ্ছতা নেই,--"শত্রুকে ভালবাস; তাদের ভাল কর যারা তোমায় ঘৃণা করে, তাদের জন্য প্রার্থনা কর যারা তোমায় ক্ষতি করে; তোমাদের পিতা যিনি স্বর্গে আছেন তবেই তোমরা তাঁর পুত্র হবে।"

রবীন্দ্রনাথ মৃত্যু সম্বন্ধে অনেক ভেবেছেন, কিন্তু জীবন থেকে মৃত্যুকে পৃথক করে দেখেন নি। করবার উপায়ও ছিল না। বালক বয়সে মাতৃহীন হবার পর থেকে ক্রমাগতই প্রিয়জনের মৃত্যুশোক তাঁর বিচিত্র বহুধাবিকীর্ণ জীবনের উপর ছায়া ফেলেছে। কিন্তু সে ছায়া কখনো দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। রবীন্দ্রনাথ জীবনের কবি, মৃত্যুর কবি নন, কিন্তু মৃত্যুর ভিতর দিয়ে বারবার তাঁর জীবনস্রোত যেন পাথরের বাধার মুখে নদীর মত নূতন বেগে উচ্ছ্রিত হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্র-নাথের মৃত্যু সম্বন্ধে রচনা অজস্র কিন্তু তার মধ্যেও জীবনের বাণীই স্পন্দিত—তারা বসন্তকালের ফুলের মত আসন্ন বিপদের মুখেও স্মিতমুখ। যারা রবীন্দ্রনাথের কাব্য কিছুটাও পড়েছেন তাঁরা জানেন মৃত্যু সম্বন্ধে কিছু বিস্ময়, কিছু প্রশ্ন এবং অসীম ব্যাকুলতা সত্ত্বেও শেষপর্যন্ত জীবনেব মধ্যেই তিনি সেই শেষহীন পূর্ণতার আস্বাদ পেয়েছিলেন, যাতে মৃত্যু বিষয়ে যে চিরপ্রশ্ন চির নিরুত্তর থেকে মানুষকে কখনো কৌতুহলী কখনো বিস্ময়াভিভূত, কখনো শোকাহত করে তার কিছু উত্তর পেয়েছিলেন। তাই যদি না পেতেন তাহলে তো তার জীবনের সাধনাই ব্যর্থ হয়ে যেত। যে শোকাহত কবি অল্প বয়সে দিশাহাবা ভাষায় এ জীবন থেকে অকালে অপহৃত প্রিয়জনের কথা ভেবে লিখেছেন—

> "হায় কোথা যাবে! অনন্ত অজানা দেশ, নিতান্ত যে একা তুমি
> পথ কোথা পাবে!…মোরা বসে কাঁদিব হেথায়, শূন্যে চেয়ে
> ডাকিব তোমায়! মহা সে বিজন মাঝে হয়ত বিলাপ ধ্বনি
> শুধু বারে পাবে।"

কিংবা,

> "পার্শ্বে বসি ধরি মুঠি, শব্দমাত্রে কেঁপে উঠি, চাহি চারিভিতে
> অনন্তের ধনটিরে আপনার বুক চিরে চাহি লুকাইতে।
> হায়রে নির্বোধ নর, কোথা তোর আছে ঘর, কোথা তোর স্থান—
> শুধু তোর ঐটুকু, অতিশয় ক্ষুদ্র বুক, ভয়ে কম্পমান
> ঊর্ধ্বে ঐ দেখ চেয়ে সমস্ত আকাশ ছেয়ে অনন্তের দেশ,
> সে যখন একধারে, লুকায়ে রাখিবে তারে' পাবি কি উদ্দেশ?
> ওই হের সীমাহারা, গগনেতে গ্রহ তারা, অসংখ্য জগৎ
> ওরি মাঝে পরিভ্রান্ত সে হয়ত একা পান্থ, খুঁজিতেছে পথ।"—

অল্প বয়সে মৃত্যুবিরহ কাতর হৃদয়ের এটা আর্তনাদ, এই দুঃখস্বর প্রশ্নরূপে উত্থিত হয়েছে রবীন্দ্রকাব্যে বারবার কিন্তু পরিণত বয়সে বিশেষ করে বিদায়ের কয়েক বছর পূর্ব থেকে মৃত্যু সম্বন্ধে বহু কবিতা লিখেছেন রবীন্দ্রনাথ—সেগুলি কেবল প্রশ্ন নয়। মানুষের এই চির নিরুত্তর প্রশ্নের উত্তর তার মধ্যে আছে। জীবনের মধ্যেই অমর্ত্যর যে স্বাদ পেয়েছেন, ক্ষণিকের মধ্যে অসীমের, তাতেই সন্তুষ্ট তিনি। "জীবনের যাহা জেনেছি অনেক তাই সীমা থাকে থাক তবু তার সীমা নাই।" এই জীবনের সুখ-দুঃখ-ভালবাসার ভিতর দিয়েই বারবার তিনি জীবনোত্তর কোনো অনুভূতির সন্ধান পেয়েছেন, তাই তাঁর কাব্যের একটি মূলধ্বনি—"সেই ছন্দেই মুক্তি আমার পাব মৃত্যুর পথে মৃত্যু এড়ায়ে যাব।" রবীন্দ্রনাথের সমগ্র রচনার মধ্যে গদ্যে ও পদ্যে এক বিরাট অংশ জুড়ে মৃত্যুর আসা-যাওয়ার এক আলোছায়ার রেখাঙ্কন চলেছে—এবং এটাও ঠিক যে রবীন্দ্রনাথের সমগ্র জীবন তাঁর সৃষ্টির মধ্যেই সম্পূর্ণরূপে বিধৃত আছে—তিনি যা লিখেছেন তিনি তাই—তাঁর জীবনে ও চিন্তায় অন্যান্য লেখকদের অনেকেরই মত আকাশ-পাতাল পার্থক্য নেই। একটা ত্রুটি হয়েছে শুধু এই যে তিনি তাঁর নিজের কোনো পূর্ণাঙ্গ জীবনী লিখে যান নি কারণ তিনি মনে করতেন তাঁর সৃষ্টির মধ্যেই তাঁর যা কিছু বলার সব বলা হয়ে রইল, তদতিরিক্ত যা তা রক্ষণীয় নয়—কারণ জীবনটা মরণেরই যজ্ঞ—অধিকাংশই ছাই হয়ে যাবে—যেটুকু বাকি থাকবে ওই সৃষ্টির মধ্যেই পাওয়া যাবে তার সত্যরূপ। দুঃখের কথা হচ্ছে এই যে রচনার ব্যাখ্যা পাঠকের রুচি মত হয়ে থাকে, তা ছাড়া আজকালকার রবীন্দ্রচর্চায় অভিনিবেশের লক্ষণের চেয়ে চটকদার তথ্য পরিবেশনের দিকেই লক্ষ্য বেশী। এসব তাঁরাই করেছেন যাঁরা রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে একটি পূর্ণ ধারণা করবার সুযোগই পান নি। তাঁকে জানবার প্রকৃষ্ট পন্থা তাঁর সাহিত্য হলেও ব্যক্তিগত পরিচয়ের মূল্য অনেক।

তাঁর জীবনের পরিণত সময়ে দীর্ঘ পনের বছর খুব কাছ থেকে তাঁকে দেখবার সুযোগ আমার হয়েছে আরো অনেকের মতই। সেজন্য মনে হয় আমার মত আরো অনেকেই হয়ত আজকের রবীন্দ্রচর্চার ফলাফল দেখে চমকে ওঠেন। সম্প্রতি একটা আলোচনা শোনা যাচ্ছে—রবীন্দ্রনাথের পরলোকচর্চা বিষয়ে। মনে হয় যেন পরলোকে প্রেতযোনি হয়ে তাঁর আত্মীয়স্বজন তাঁর আত্মীয়স্বজন রূপেই ঘুরে বেড়াচ্ছেন রবীন্দ্রনাথের এই রকম অকাট্য বিশ্বাস ছিল এবং তিনি রীতিমত এই প্রেতলোক সম্বন্ধে চর্চা করে থাকতেন। এর ভূরি ভূরি প্রমাণও সংগ্রহ হচ্ছে। কোন একটি দুটি ঘটনা দিয়ে এই ধরনের ধারণায় উপস্থিত হওয়া আমার মতে অন্ধের হস্তিদর্শনের মতই। এই সম্পর্কে যে ঘটনার উপর নির্ভর করে এই

আলোচনার সূত্রপাত, সে সম্বন্ধে দু-একটি কথা বলছি। দীর্ঘদিন আগেকার কথা, ব্যক্তিগত কথা, তবু রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে কোন কথাই আজ আর ব্যক্তিগত সীমার মধ্যে আবদ্ধ নয়, তার জন্যই বলা। বুলা বা উমাদেবী রবীন্দ্রভক্ত মোহিত সেনের কন্যা আমারো অভিন্নহৃদয়া ছিলেন। তাঁকে ভালবাসতাম খুব। তাঁর মিষ্টি স্বভাব কবিত্বে ঢলঢল—তাঁকে কবির কাছে প্রায়ই দেখতাম। আমার প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'উদিতা' ও তাঁর 'বাতায়ন' এক বছরেই (১৯৩০) প্রকাশিত হয়। কিন্তু বুলার মধ্যে অতিপ্রাকৃতের দিকে একটা ঝোঁক ছিল, তাছাড়াও ঝোঁক ছিল তাঁর সত্তার প্রভাব বিস্তার করার। তাঁর ভক্তজনেরও তাই অন্ত ছিল না, আমিও তার অন্তর্গত ছিলাম। রবীন্দ্রনাথও তাঁকে কৃপামিশ্রিত স্নেহ করতেন। বুলার মধ্যে একটা ব্যাকুলতা একটা অসম্পূর্ণতার দুঃখ লেগেই থাকত। সেই-জন্যই কৃপা। তারপরে তাঁব মিডিয়াম হবার ঘটনার ছ'মাস পরেই অসম্পূর্ণ জীবন নিয়েই উমা চলে গেলেন।

রবীন্দ্রনাথকে যাঁরা জীবনে লাভ করেছেন তাঁরা জানেন স্নেহদানের তাঁর অফুরান শক্তির কথা এবং মানুষের প্রতি তাঁর অগাধ বিশ্বাসের কথা। আরো জানেন যে তাঁর মধ্যে একটি কৌতূহলী চিরশিশু ছিল, যেমন সব স্রষ্টার মধ্যে, বৈজ্ঞানিকের মধ্যে থাকে। যে মানুষ জীবনকে জানতে চায় এ বিশ্বের পরিমণ্ডলে এমন কিছু নেই যা তার জানবার যোগ্য নয়। এইখানে দুটি ইংরাজি কথা ব্যবহার করছি—তিনি curious ছিলেন কিন্তু credulous ছিলেন না। তাঁর মন যুক্তিবাদী, বিশ্লেষণধর্মী, বৈজ্ঞানিক মন, তাঁর কানে কোন কথা এলে তা যত অসম্ভবই হোক তাকে খতিয়ে দেখতে তাঁর আগ্রহের অন্ত ছিল না। দু-একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে—যেমন সে সময়ে আমার পিতার উৎসাহে আমি কিছুটা জ্যোতিষচর্চা সুরু করেছিলাম। রবীন্দ্রনাথ এ সম্বন্ধে 'লাচনায় ও পরি-হাসে অনেক সময় নষ্ট করেছেন। তিনি কৌতূহলী হয়েছিলেন, প্রমাণস্বরূপ তাঁর ডান হাতের একটি ফটোগ্রাফ এখনও আমার কাছে আছে। স্বর্গীয় বিপিন জ্যোতিষী তখন আমাদের সঙ্গে বারবার তাঁর কাছে গিয়েছেন। কিন্তু যদি আমি বলি তিনি জ্যোতিষশাস্ত্র বা ভাগ্যগণনায় বিশ্বাসী ছিলেন তাও একেবারেই সেই অন্ধের হস্তিদর্শন হবে। ভাগ্যের মুখে তুড়ি মেরে তিনি তাঁর আপন মহিমায় সকল বিঘ্ন লঙ্ঘন কবার পথেই গিয়েছেন।

এই প্রসঙ্গে একটা গল্প মনে আসছে। ১৯২৯ সালের শেষের দিকে এক রুষ দম্পতি কলকাতায় এসেছিলেন। তাঁরা গ্লোব থিয়েটারে একটি খেলা দেখাচ্ছিলেন। খেলাটি এই, ভদ্রমহিলা দীর্ঘ কৃষ্ণ পরিচ্ছদে আবৃত হয়ে রঙ্গমঞ্চে এসে দাঁড়াতেন,

তাঁর দুই চোখ বাঁধা—আর তাঁর স্বামী দর্শকদের মধ্যে নেমে আসতেন, দর্শকদের মধ্যে কেউ উঠে দাঁড়ালে ভদ্রলোক তাঁর নাড়ি ধরে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতেন। প্রশ্নকর্তার প্রশ্নটি উচ্চারণ করবার দরকার নেই, মনে মনে করলেই ভদ্রমহিলা প্রশ্নটি বলতেন তার উত্তরও। যেমন কেউ উঠে দাঁড়ালে, যাদুকরী বললেন—"ওঃ তোমার প্রশ্ন তো এই যে তোমার স্ত্রী অবিশ্বাসিনী কিনা, হায় তিনি তো ঠিকই আছেন, তুমিই অবিশ্বাসী"—তখন ঘর সুদ্ধ লোক সেই অপ্রস্তুত ভদ্রলোককে চূড়ান্ত অপ্রতিভ করে হাসিতে ফেটে পড়ত। আমার পিতা বললেন দর্শকের মধ্যে ওদের লোক ছিল। বাড়িতে এক বিদ্বৎজনসমাজে তাঁদের নিমন্ত্রণ করে বিস্ময়কর এই নিখুঁত খেলা দেখা গেল। রবীন্দ্রনাথ এসব শুনে কৌতূহলী, বললেন, 'ওদের নিয়ে এস'। নিয়ে গেলাম আমরা। তাঁরাও আগ্রহী হয়ে গিয়েছেন। কিন্তু ভদ্রমহিলা কিছুতেই বলতে পারছেন না, চেষ্টা করছেন, কিন্তু যেন কোন অদৃশ্য শক্তির কাছে পরাজিত হয়ে যাচ্ছেন। তিনি বলতে লাগলেন—আমার চোখের সামনে একটা দেয়াল, আমি কিছু দেখতে পাচ্ছি না। কবির যেন কৌতূহলী শিশুর হতাশ ভাব ছেলের হাতের খেলনা কেড়ে নেওয়া হয়েছে—কি করলে ওঁকে সাহায্য করা যায় ভাবছেন। তিনি তো ওকে অপ্রস্তুত করতে চান না, খেলাটা দেখতে চান। কিন্তু ভদ্রমহিলা পারলেন না—চোখের বাঁধন খুলে ফেলে তিনি চন্দ্রাহতের মত চীৎপুরের রাস্তা দিয়ে দৌড়ে পালালেন। কবি আমাদের পিতাপুত্রীকে পরিহাস বাণে বিদ্ধ করতে লাগলেন, বললেন—অধ্যাপকদের বোকা বানান কিছুই নয়।

এই ভুবনের অজ্ঞাত কত রহস্যময় দিক আছে—মানুষের মনের কত গভীর অজানা গহ্বর আছে, সবদিকে তাঁর জিজ্ঞাসু মন প্রশ্ন করে ফিরেছে চিরকাল। সেটা প্রশ্নই এবং সেই প্রশ্নেই তার সার্থকতা—কোনো একটা অপ্রামাণ্য উত্তর দিয়ে তার সীমা বেঁধে দিতে চেষ্টা করা ভ্রম মাত্র, সে ভ্রম তিনি করেন নি অর্থাৎ একটা সময়ে ২।৩ মাস তাঁর স্নেহের পাত্রী উমা এই যে একটা অস্বাভাবিক অতিপ্রাকৃত খেলার ঘোরে মেতে উঠেছিল তার প্রতি অকৃপণ স্নেহ এবং সর্ব-বিষয়ে অসীম কৌতূহলের জন্যই তিনি তাঁর সঙ্গী হয়েছিলেন এ ঘটনা তাঁর চেয়ে একটুও বেশী নয়। তা বুলার লেখায় সাক্ষ্যপ্রমাণ যাই বলুক। প্রত্যেক জিনিসই ব্যাখ্যার উপর নির্ভর করে। সে ব্যাখ্যা রবীন্দ্রনাথের সমগ্র জীবনের সঙ্গে মিলিয়েই করতে হবে। রবীন্দ্রনাথের সময় অল্পসল্প ফ্রয়েডিয় সাইকোলজির চর্চা হয়েছিল কিন্তু আমার যতদূর মনে পড়ে তার উপর তাঁর আস্থা কমই ছিল। তিনি মনোবিকলন ব্যাপারটা পরিহাস করতেন। তাঁর কাছে মানুষের অজ্ঞেয়

অপ্রমেয় চিত্তভূমি ডাক্তারের জেরার মুখে অনাবৃত অনায়াসলব্ধ হয়ে যাবে এটা অবিশ্বাস্য ঠেকত। তারপরে এই বিজ্ঞান অনেক দূর এগিয়েছে—হয়ত এখনও এর কীর্তিকলাপ তেমন নির্ভরযোগ্য হয়ে ওঠেনি। তবু মানুষ এটুকু জেনেছে যে বাইরে থেকে মানুষকে যা বিচার করা যায় তার অন্তর্লোকের কারখানায় আরো অনেক ঘটনা ঘটে। একটা বিষয় রবীন্দ্রনাথের বিস্ময়কর ঠেকত যে তিনি তাঁর অন্তরঙ্গদের সঙ্গে বিশেষ করে নতুন-বৌঠানের সঙ্গে কিভাবে কথা বলতে পারেন তা বুলা জানবে কি করে—যাঁরা রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দীর্ঘদিনের পরিচিত তাঁরা তাঁর কাছ থেকে অবিরতই সে কথা শুনতে পেতেন, তাঁর মুখের কথারও অনুলিখন একেবারেই অসম্ভব ঘটনা নয় তারও' তো প্রমাণ আছে। কিন্তু একথা মানতে তাঁর খারাপ লাগত যে উমা ইচ্ছাপূর্বক অসামান্যতা লাভের আকাঙ্খায় ঐ রকম ছলনা করছে—বস্তুত তা হয়ত সে করেও নি, এইখানেই অবচেতনের কথা ওঠে। উমাদেবী অনেক দিক থেকে অসামান্যা ছিলেন ও তাঁর মনোলোক আলোছায়াময় ছিল। এটা হচ্ছিল খেলা। খেলা অচিরেই ফুরিয়ে গেল। তারপরও রবীন্দ্রনাথ বহুদিন বেঁচে ছিলেন এবং মৃত্যু সম্বন্ধে অনেক কবিতা লিখেছেন। কোথাও কি এই 'পরলোক চর্চার' কোনো ছায়াপাত হয়েছে? মৃত্যুর পরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে তাঁর কৌতূহল যাই হোক, তাঁর কোনো বিশ্বাস কি কোথাও ধ্বনিত হয়েছে? যদি হয়ে থাকে তবে তা কি কোথাও কি গদ্যে কি পদ্যে এমন কথার আভাস দিয়েছে যে এ জীবনে তাঁর যাঁরা প্রিয়জন ছিলেন মৃত্যুর পরে তারা তাঁদের পূর্ব রূপে, পূর্ব পরিচয়ে অর্থাৎ সেই নতুন বৌঠান, সেই শমী হয়ে এক পরম দুঃসহ প্রেতযোনি প্রাপ্ত হয়েছেন? যিনি লিখেছেন, 'জীবনেরে কে রাখিতে পারে, আকাশের প্রতি তারা ডাকিছে তাহারে।' তিনি কি ভাবছেন এই পৃথিবীর দুদিনের সম্পর্কের গণ্ডী দিয়েই মানবাত্মা চিরদিনের জন্য চিহ্নিত, বন্দী হয়ে আছে? মৃত্যুর পরে কোনো অস্তিত্বের কথা যদি কল্প- করা যায়ও তাহলে কি ভাবা যায় যে সেই পরলোকে আমাদের খুড়ো জ্যাঠা সারি সারি খুড়ো জ্যাঠা হয়েই অবিচল দাঁড়িয়ে আছে—প্ল্যানচেটের সুতো ধরে টান দিলেই এসে পড়বে? একথা অনেকে ভাবতে হয়ত পারে। রবীন্দ্রনাথ কি পারেন? তাঁর রচনায় কি তার প্রমাণ আছে? তা নেই।

তিনটি অতি প্রিয়জনের মৃত্যুশোক পাবার পর তাঁকে আমি দেখেছি—প্রথম একমাত্র নাতি নিতুর মৃত্যুর পর—দ্বিতীয় পরমপ্রিয় [illegible] সুরেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর—সে সংবাদ তাঁর জন্মদিনের পরে আমার বাড়িতে থাকাকালেই পেয়েছিলেন—তৃতীয় সি, এফ, এনড্রুজের মৃত্যুসংবাদ যখন শান্তিনিকেতনে শোনেন। কিন্তু

কখনো আমার মনে হয়নি শোকের, বিচ্ছেদের বেদনাকে তিনি কোনো সহজ সান্ত্বনার প্রলেপে ঢাকতে চেয়েছেন। বরং 'ক্ষণিকা' কবিতাটি যখন তাঁকে তাঁর মৃত্যু শয্যায় শোনাই—তখন তিনি বারবার বলেছিলেন—'এ কবিতা আমায় আগে শোনাও নি কেন—অনন্তকে তো এই অন্তের মধ্যে পেয়েছি—জীবনকে এই সীমাতেই বন্দী করার ইচ্ছা লোলুপতা মাত্র—অপারেশন করে কি হবে—যে নিয়মে ঝরে যায় শুকনো পাতা, খসে পড়ে ফল, সেই নিয়মে স্বাভাবিকভাবে আমি ঝরে যেতে চাই।' একথা যেদিন শুনেছিলাম তার মাসখানেক পরে তাঁর অপারেশন হয়েছিল। একজন মানুষের জীবনে অনেক ঘটনা ঘটে—তার কোনটা প্রামাণ্য, কোনটা নয়, কোনটা সত্য কোনটা মায়া তা বোঝবার জন্য প্রতিটি ঘটনা তাঁর সমগ্র জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে দেখতে হয়, রবীন্দ্রনাথের মত বিরাট পুরুষ সম্বন্ধে সে কথা আরো কত সত্য।

উমা দেবী

যাঁরা ত্রিশের দশকে কবিতা লিখতেন তাঁরা এখন জীবিত থাকলেও কলম ধরতে সাহসী নন। বর্তমান সাহিত্যক্ষেত্রে বর্জনের ছাপে তাঁরা লাঞ্ছিত। প্রধানত দুই কারণে: এক, তাঁরা রবীন্দ্র প্রভাবিত—যেটা একেবারেই অচল, দ্বিতীয়, তাঁদেব রচনা অনেক সময়ই নিজ নিজ অনুভূতির দ্যোতক। রবীন্দ্র প্রভাবেই হোক বা যে কারণেই হোক তাঁরা আপন উপলব্ধিব প্রবর্তনাকেই রচনার উৎসরূপে মেনে নিয়ে রচনাকৌশলের উপব তত জোর দেন নি যতটা জোর পেয়েছেন প্রেরণার সত্যতায়।

প্রেরণার সত্য বা সততা ঠিক এখনকার যুগধর্ম নয়। এমন কি বেশ কয়েকজন লেখক খুব স্পষ্টভাবে লিখেছেন যে কাব্য রচনায় প্রেরণার প্রয়োজনই নেই।

প্রেরণার প্রয়োজন নেই বটে কিন্তু সাহিত্যিকের অন্যান্য অনেক প্রয়োজন আছে এবং তা মেটানও হয়—সেগুলি বর্জনের দিকে তত ঝোঁক দেখি না। এই রকমই কোনো একটি প্রয়োজনের শিকার হয়েছেন একটি বিস্মৃতপ্রায় কবি উমা দেবী। তাঁব নামও আজ কেউ জানত না যদি না রহস্যময় ভৌতিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত হয়ে চাঞ্চল্যকর সাংবাদিকতার উপজীব্য হতেন। কবি হিসাবে তাঁর জীবনটি কত সত্য ছিল তা আজ কারু মনে নেই। দার্শনিক রবীন্দ্রভক্ত মোহিতচন্দ্র সেনের কন্যা উমা দেবী, যার ডাক নাম বুলা একজন তেমনি কবি ছিলেন, যাঁর কবিত্ব শুধু কয়েকটি রচনায় প্রকাশ পেত তা নয়—তা সারা জীবন জুড়ে জ্যোৎস্নাধারার মত তা প্রকাশিত হত। শামলা রং দীর্ঘদেহ, প্রায় [illegible]ত সুন্দর মুখে বড় বড় স্বপ্নময় চোখে সে চেয়ে থাকত।

তার সঙ্গে প্রথম দেখা হয় আমার উনিশ-শ আ[illegible]শ সালে। আমার বয়স তখন চৌদ্দ। জোঁড়াসাকোর বারান্দা পার হয়ে এগিয়ে আসছি হঠাৎ তাকে দেখলাম বিচিত্রা ও বড় বাড়ির মাঝখানের কাঠের সেতুটার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। আমাকে দেখেই সে এগিয়ে এল, কাছে এসে সস্নেহে আমার গলা জড়িয়ে বল্লে, 'তুমি কি মৈত্রেয়ী?' বুলা আমার চেয়ে দশ বছরের বড কিন্তু সে কথা সে আমায় বুঝতে দেয়নি—সে বল্লে, তোমার কথা ক'দিন থেকে খুব শুনছি তাই ভাবছিলাম কি করে তোমার সঙ্গে আলাপ হয়—হঠা একদিন তোমাদের বাড়ি উপস্থিত হব কি না। সেদিনকার রবীন্দ্রপরিমণ্ডলে আমি তখন সর্বকনিষ্ঠ এবং ভীরু। আত্মপ্রতিষ্ঠ নই মোটেই। সেখানে যে সমস্ত আলাপ আলোচনা হত—তার বেশির

ভাগই আমার মাথার উপর দিয়ে ভেসে যেত। সবিস্ময়ে যাঁদের উল্লেখিত হতে শুনতাম, যেমন—কুমারস্বামী, ওকাকুরা, কাবাগুচি ইত্যাদি, তাঁরা কে এবং কোথাকার মানুষ তা বুঝতেও সময় যেত—দেশবিদেশ জুড়ে এক বিবাট বৃত্ত রবীন্দ্রনাথকে ঘিরে। আমার চেয়ে বয়সে যাঁরা বড় তাঁরা ওয়াকিবহাল। আমি অর্বাচীন, সদা সঙ্কুচিত, এবং কারু কারু চোখে দেখেছি বিরাগ ও বিদ্রূপ এই অবাঞ্ছিত উপস্থিতির জন্য। সেই প্রথম উমা আমাকে বন্ধুত্বের স্বীকৃতি দিয়ে কাছে টেনে নিয়েছিল।

এই প্রসঙ্গে আর একজনের কথা মনে পড়ে, তিনি অমল হোম—উমা বা বুলার সঙ্গে তাঁর গভীর প্রীতির সম্পর্ক ছিল—তিনিও রবীন্দ্রভক্তদের সকলের সঙ্গেই সহৃদয় ব্যবহার করতেন।

বেলেঘাটার খাল পেরিয়ে বার্ড কোম্পানীর কোয়াটার্সে শিশির গুপ্ত ও উমা তাঁদের শিশু কন্যা মিঠুকে নিয়ে থাকতেন। দোতলার উপরে সারি সারি ঘরের সামনে চওড়া দক্ষিণের বারান্দায় বিদ্বৎজন সমাগম হত। সাহিত্য আলোচনা ও গল্প গুজবের অমন একটি জমাট ব্যবস্থা আজকাল আর চোখে পড়ে না—। উমাকে কেন্দ্র করে একটি সুবাতাস বইত। তার স্বভাবে এমন একটি প্রীতি ও প্রশ্রয় ছিল যে সকলেই মনে করত বিশেষ করে তার প্রতিই সে পক্ষপাতী। এবং এ বিষয়ে তার বন্ধুজনের বৃত্তে তার সমগ্র শ্বশুরবাড়িও অন্তর্গত ছিল। এটা কম কথা নয়। সাহিত্যের সঙ্গীদের মতই তার আত্মীয়স্বজনও তার ভক্ত ছিল। যেমন বসে থাকতেন ওমর খৈয়ামের কবি কান্তি চন্দ্র ঘোষ তেমন মুগ্ধের মত বসে থাকত তার দেওর ননদ প্রভৃতি।

১৯৩০ সালে আমার প্রথম কবিতার বই 'উদিতা' ও তার একমাত্র বই 'বাতায়ন' প্রকাশিত হয়। দুটি বই-ই রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা সম্বলিত ছিল।

বুলার চোখে সর্বদা স্বপ্নাতুর দৃষ্টি, ভাষা ছন্দিত, সুন্দর সুনির্বাচিত শব্দে সুকাব্যের সুখ নিয়ে আসে। কিন্তু তার কবিতা কোনো স্বপ্নলোকের বার্তা বয়ে আনে না। তা চোখ মেলে দুপাশের লোকজনকে দেখছে, দেখছে ঘরের পাশের সামান্য মানুষদের প্রতিদিনের জীবন ও সমস্যা। এত বাস্তব এই ছবি, এত সহজ-ভাবে দেখা, মনের অনুভূতির এই সরল প্রকাশ আজকালকার কবিদের ভালো লাগবে না। আজকাল মনের গতি বঙ্কিম, ভাষাও জটিল। সরল ভাষা তাই তার সরলতার জন্যই সাহিত্যের অঙ্গন থেকে বহিষ্কৃত। তারও উপর আর এক কথা উমার কবিতা আমার কবিতার চেয়েও বেশী রবীন্দ্র প্রভাবগ্রস্ত। রবীন্দ্রনাথের একটি বিশেষ বইয়ের ছাপ এতে পড়েছে, সে হচ্ছে 'চৈতালী'। চৈতালীর কবিতাগুলোও ছোট

ছোট ছবি, পদ্মায় ভাসমান বোট থেকে দেখা তীরের দৃশ্য। 'বাতায়নে'র কবিতা-গুলিও তাই—তেমনি পয়ারে গাঁথা। আমাদের তখন ভালো লেগেছিল। রবীন্দ্রনাথ এই বই সম্বন্ধে কি বলেছিলেন শোনা যাক—"তোমার 'ছায়াছবি' গুলি আমার বিশেষ ভালো লেগেছে, তার কারণ ওর মধ্যে একটা বিশেষত্ব আছে। ভাবুকতার কবিতা অনেক সময় রঙ্গীন মেঘের মতো, তার মধ্যে যদি বা স্বাতন্ত্র্য দেখা দেয়, সে সুনির্দ্দিষ্ট নয়, বাষ্প রেখায় রূপ যদি বা আঁকা পড়ে, মনে হতে থাকে এর ধ্রুবত্ব নেই। কিন্তু যে জিনিষকে তুমি হৃদয় দিয়ে দেখেছ, এই ছোট ছোট কবিতায় তাকে সহজ করেই দেখিয়েছো, এই মনে করে তৃপ্তি হয় যে এগুলি প্রত্যক্ষ বিষয়। হৃদয়ের উড়ো হাওয়ায় যে সকল বেদনার খেয়াল ভেসে বেড়ায়, তা'কে পাঠকের মনে অনুভাবিত করা সে এক জিনিস, সেখানে প্রায় দেখা যায় ঠিক সুরটি লাগেনা, অত্যুক্তি এসে পড়ে। সর্ব্বদা কাব্যে ব্যবহৃত বাক্য ও বাক্য-রীতি জমাট বেঁধে ভাবের আন্তরিক লঘুতা ঢাকা দেয়, এক রকম প্রথাসম্মত চলনসই জিনিষ দাঁড়িয়ে যায়, তার চেয়ে বেশী কিছু নয়। কিন্তু এই "ছায়াছবি"র বিষয়গুলি তোমার বানানো পদার্থ নয়, এগুলি তোমার আপন দেখা বিষয়, তোমার দৃষ্টির ঔৎসুক্য ও প্রকাশের সরল নৈপুণ্য দিয়ে এর প্রত্যেকটিকে বিশিষ্টতা দিয়েছে। তোমার ঘরের কাছে মজুরেরা বাস করে। তাদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার উপর কারো চোখ পড়ে না, তোমার দৃষ্টিতে তারা উপেক্ষিত হয়নি, তোমার রচনায় তারা সমাদর পেয়েছে—এইটি আমার ভালো লাগল। "ছায়াছবি" নামটি সঙ্গত হয়েছে বলে মনে হয় না। এই লেখাগুলিতে ছায়ার অস্পষ্টতা নেই। মনে এই আশা রইল তোমার বাতায়নের সম্মুখবর্ত্তী দৃশ্যের বাইরেও তোমার দৃষ্টি প্রসারিত হবে এবং তোমার অভিজ্ঞতাক্ষেত্রের সকল দিক থেকেই প্রত্যক্ষ-দেখা বিচিত্র ছবিগুলিকে সংগ্রহ করে এমনি সহজ ও সুস্পষ্ট ভাষায় তোমার কবিতায় তাদের সজ্জিত করে তুলবে।"

১৯৩০ সালে এই ভূমিকা লেখা, তখনো শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সই করতেন ও বাংলা বানানের বাহুল্য বর্জিত রূপ তৈরী হয়নি দ্বিত্ব বজায় রেখে, 'বর্ত্তী' বা 'সর্ব্বদা' অনাবশ্যক বোঝা নিয়ে চলত। আর তখনও বাংলা দেশের সাহিত্য ক্ষেত্রে মজদুরের দুঃখে বিগলিত কাব্যরসের প্রবাহ এত দুর্দান্ত হয়নি। পরবর্তী কালে এক প্রকার দল বেঁধে এই শ্রমিকপ্রেম দেখে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—'সেটা সত্য হোক শুধু ভঙ্গী দিয়ে যেন না ভোলায় চোখ': কিন্তু উমার রচনাকে তাঁর ভঙ্গীসর্বস্ব মনে হয়নি, কারণ কবিতাগুলির মধ্যে একটা বড় সত্যর সন্ধান আছে যে সব অবস্থাতেই মানুষের জীবনে আনন্দের পসরা পূর্ণ করবার আয়োজন রয়েছে।

নিতান্ত দরিদ্র ঘরের মানুষদের ছোট ছোট সুখের মাধুর্যই উমার কবিতার বিশেষত্ব, দুঃখের উগ্রতা বা দ্বন্দ্ব মুখরতা নয়।

দুটি কবিতা এখানে উদ্ধৃত করছি :

১

ওই যে ছেলেটি খেলে ল'য়ে ধুলো মাটি
মা তাহারে ফেলে কোথা কাজে গেছে বুঝি ?
আধো আধো কথা বলে নাড়িয়া মাথাটি,
'মা'—'মা' বলে চারিধারে চায় মায়ে খুঁজি
কভু বা বিস্ময় চোখে চাহে চারিধার,
মুঠি মুঠি তুলি ধূলা মাখে সারাদেহ,
বাতায়নে বসে আমি দেখি খেলা তা'র
কেন জানি উথলিয়া ওঠে মোর স্নেহ।
ভাবি মনে সবাকার মতো এ জগতে
এও তো এসেছে হেথা পূর্ণ অধিকারে,
তবে কেন ধূলি মাঝে প'ড়ে থাকে পথে,
দুঃখীর ঘরেতে এল বিধির বিচারে ?
কে জানিবে হায় তাঁর অন্তর বাসনা,
কার ভাগ্যে ধূলি আছে, কার ভাগ্যে সোনা !

২

মজুর মজুর-বউ করিছে বচসা
সেদিন নয়নে মোর পড়িল সহসা,
নিত্যকার এ ব্যাপার, তবু কুতুহলী
জানালার কাছে আমি ছুটে গেনু চলি
দেখি এক নির্বিকার একটুকু ছেলে
আপনার মনে সেথা ধূলো নিয়ে খেলে,
তাকে নিয়ে এ বিবাদ বেঁধেছে এমন
জুটেছে পাড়ার লোকে জানিতে কারণ।
বউটা বলিছে কেঁদে—"করগো বিচার,
কত যে মানৎ করা এ ছেলে আমার
এঁরে কেন দেয় গালি ? কেন মারে ধ'রে ?
দেখি আজ কেমন ও ঢোকে মোর ঘরে !"

"আয় খোকা আয়" ব'লে হাত ধরে টানে,
'বাবা' বলে ছেলে চায় মজুরের পানে।

রবীন্দ্রনাথ আশা করেছিলেন এইসব সম্মুখবর্তী দৃশ্যের বাইরেও তার দৃষ্টি প্রসারিত হবে এবং তার কাব্যে গভীরতর উপলব্ধি প্রকাশ পাবে। কিন্তু তার আর সময় হল না। পরের বছরই নিতান্ত অকস্মাৎ অসময়ে তার মৃত্যু হল। এমন একটি সতেজ সুন্দর প্রাণোজ্জ্বল জীবন কয়েক ঘণ্টার মধ্যে শেষ হয়ে গেল। শিশিরবাবু যখন অশ্রুজড়িত গলায় টেলিফোনে জানালেন 'তোমার বুলাদি মারা গেছেন' তখন অদ্ভুত একটা যন্ত্রণা অনুভব করেছিলাম। বলতে গেলে সেই আমার প্রথম মৃত্যুশোক। তার আগে ঠাকুমা মারা গিয়েছিলেন কিন্তু সে অন্যরকম। মৃত্যুর কয়েক মাস আগে প্ল্যাঞ্চেটে হাত দিয়ে মিডিয়াম হয়ে বসে বুলা যে অদ্ভুত অতিপ্রাকৃত খেলায় মেতে উঠেছিল আমাকে তা কোনো দিনও আকৃষ্ট করে নি। ঐ সময়ে কোনো একদিন কৌতুক করে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন "আমরা যে এতদিন ভূত দেখছিলাম তুমি তো এলে না," আমি কিন্তু ভূত দেখতে উৎসাহী হই নি। কোনোদিনই আমার বিশ্বাস হয় নি যে আমাদের আত্মীয় স্বজন, তাদের সেই পূর্ব আকৃতি প্রকৃতি নিয়ে পরলোকে বসবাস করছে, মিডিয়াম সুতো ধরে টানলেই এ-লোকে চলে আসবে। ইহ ও পরলোকে সেতু বন্ধন এত সোজা ব্যাপার নয়। আমার যে বাল্যকাল আজ হারিয়ে গেছে, দশ বছরের যে আমির মৃত্যু হয়েছে, বিশ বছরে তাকেই আর ফিরিয়ে আনা যায় না। আর মৃত্যুর মত এত বড় পরিবর্তনের পরও সে অপরিবর্তনীয় থাকবে এই কি আশা করা চলে। যাক বুলার খেলার রহস্য কি তা সেই জানে এবং কৌতূহলী রবীন্দ্রনাথকে কিছুদিনের জন্য সে খেলায় সঙ্গী পেয়েছিল তাও সত্য এবং সেটা তার স্বভাবের মাধুর্যের জন্যই।

আমার অবশ্য সবচেয়ে আশ্চয লেগেছিল যে এই ঘটনার অল্প পরেই সে মারা গেল—মৃত্যু যেন তার জীবনে প্রবেশ করবার পথ খুঁজছিল। আমার সদ্যোদ্ভিন্ন উৎসুক নবীন মনের উপর বুলার মৃত্যু এক অদ্ভুত অনুভূতি নিয়ে এসেছিল। সে যে কোথাও নেই একথা মানতে কষ্ট হচ্ছিল কিন্তু সে যে আর আমাদের কেউ নয় একথা আমি বুঝছিলাম। সেই সময় আমার একটি চিঠির উত্তরে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—

শান্তিনিকেতন

কল্যানীয়াসু,

বুলা একেবারেই নেই এই কথাটা তোমার মন কোনোমতেই স্বীকার করতে

চাচ্ছে না, তখন তাকে স্বীকার করবার দরকার কী? থাক্ ব্যাপারটার কত বৈচিত্র্যই আছে। কখনো ঘুমিয়ে থাকি কখনো জেগে থাকি কখনো কাছে থাকি—কখনো দূরে থাকি—কখনো দৃশ্যে কখনো অদৃশ্যে তার সঙ্গে আরো একটা কথা যোগ করে দিতে দোষ কি—অর্থাৎ কখনো এ লোকে কখনো অন্যলোকে—কখনো মর্ত শরীরের অবস্থায় কখনো এ শরীরের অতীত অবস্থায়। তুমি বলবে নিশ্চিত জানিনে যে। সেই জন্যেই ইন্দ্রিয়ের প্রমাণকে না মেনে আকাঙ্ক্ষার প্রমাণকেই তো মানা ভালো। পৃথিবীতে সব আকাঙ্ক্ষার সার্থকতা ঘটে না এ কথা সত্য, তেমনি একথাও সত্য যে সব সত্যের যুক্তি আমাদের হাতে নেই, তাই যাকে নিশ্চিত বলে জানি সেও ভ্রান্ত হতে পারে। মৃত্যুকে বিলয় বলে মনে করচি খুবই সম্ভব তার কারণ এই যে, সে যে বিলোপ নয় তার প্রমাণগুলো আমাদের হাতের কাছে নেই—হয়তো কেবল বৃথা বিলাপ করেই মরচি। মা পাশের ঘরে গেলে শি[illegible] যেমন মায়ের অবলুপ্তি কল্পনা করে এও হয়তো তেমনি। আমি এই কথা বলি যখন দ্বন্দ্বের মধ্যেই আছি তখন না-য়ের চেয়ে হাঁ-কে মানাই ভালো। মৃত্যু যদি চরম সত্যই হয় তাহলে আক্ষেপ করা বৃথা। যদি সত্য না হয় তাহলে ততোধিক বৃথা—অতএব মৃত্যু পর্যন্ত অপেক্ষা করে দেখা যাক তারপরে হয় এপক্ষে নয় ওপক্ষে তর্কের সমাধান হবে—আমি নিজে শান্ত মনে তারি অপেক্ষা করছি এবং ততক্ষণ এই বিশ্বাস ধরে রাখচি যে মৃত্যুর পরেই অস্তিত্বের সম্পূর্ণ প্রতিবাদ হাঁ করে নেই।

ইতি—২৫ ডিসেম্বর, ১৯৩১

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কয়েক ঘণ্টার মধ্যে অত্যন্ত অকালে বুলার প্রাণোচ্ছল উজ্জ্বল জীবনটি নিবে গেল, থেমে গেল তার বাড়ির মজলিশ-আনন্দ সমারোহ যার মধ্যে ঋজু বৃন্তের উপর রজনীগন্ধার মত সে ফুটে থাকত।

বুলা অর্গান বাজিয়ে গান গাইত। তখনকার দিনে ঐটা রেওয়াজ ছিল। তার মুখে একটা গান শুনেছিলাম কয়েকবার—সুনীল সায়রের শ্যামল কিনারে, দেখেছি পথে যেতে তুলনাহীনারে।

অনেকের কছেই সে তুলনাহীনা ছিল, আমার কাছেও। এই দীর্ঘ জীবনে যে সমস্ত অসামান্য নরনারী দেখেছি বুলা তার মধ্যে নিঃসন্দেহে অন্যতমা। তবুও বুলা মিডিয়াম হয়ে যথার্থই ভূতদের নিয়ে আসত কিনা সে বিষয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। মৃত্যুর পরে যদি অস্তিত্ব থাকে তবে তা এই জগতের অস্তিত্বর সঙ্গে

অভিন্ন হতে পারে না। মৃত্যুর পরেও আমার খুড়ো জ্যাঠা আমার খুড়ো জ্যাঠাই থাকবে একথা ভাবা যায় না। তবে তার অগাধ রহস্যময় অন্তর্লোক যা তার ভাব-বিহ্বল চোখে আমরা দেখতে পেতুম সেখান থেকে কোন শক্তি উদ্বুদ্ধ করে সে এই খেলার মায়াজাল পেতেছিল তা বলতে পারি না।

এই প্রসঙ্গে একটি কাহিনী না বলে আমার এই প্রবন্ধ শেষ করতে পারছিনা। এ কাহিনীর কোন ব্যাখ্যা আমার কাছে নেই, যুক্তি প্রয়োগ করেও কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারব না। মাঝে মাঝে জীবনের নানা বাঁকে হঠাৎ হঠাৎ আমরা এমন অভিজ্ঞতার সামনে আসি যার কোন পূর্বাপর নেই, যুক্তির সূত্র ধরেও যাকে পূর্বাপরে যুক্ত করা যায় না, যা একটি জিজ্ঞাসার চিহ্নের মত চিরজীবন মনের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকে।

১৯৩১ সালে বুলার মৃত্যুর অল্প কয়েকদিন পরই তার মেয়েটিও মারা যায় তারপর আর ওদের কোনো খবর রাখি নি। দীর্ঘদিন পর্যন্ত শিশিরবাবু আর বিবাহ করেন নি, পরে শুনলাম বিবাহ করেছেন ও খুব হার্টের অসুখে ভুগছেন।

১৯৫৫ সালে দিল্লীতে একজনদেব বাড়িতে নিমন্ত্রণে একটি মহিলার সঙ্গে আলাপ হল। মহিলা অবাঙালী, নাম শুনলাম মিসেস গুপ্ত। প্রথম আলাপেই তাঁকে আমার ভারি ভালো লাগল, মনে হল এঁকে যেন কোথায় দেখেছি। যেন খুব চিনি। তাঁকে জিজ্ঞাসা বললাম, আপনি আমাকে কোথাও দেখেছেন, আমায় চেনেন? তিনি খুব অবাক হয়ে বললেন, না তো। সারারাত ধরেই ঐ ভদ্র মহিলার কথা ঘুরে ঘুরে আমার মনে এল—যেন একে চিনি, কিন্তু ধরি ধরি করেও ধরতে পারলাম না পরিচয়ের সূত্রটা কি।

পরের দিন কলকাতায় ফিরব—চেয়ার কারে—সারারাত সময় কাটান উপযুক্ত সঙ্গী না পেলে ভালো লাগেনা। সামনে তাকিয়ে দেখি একটু আগেই মিসেস গুপ্ত বসে আছেন—পাশে একটি খালি চেয়ার দেখে এগিয়ে গেলাম, ভাবলাম ভালো হল ঐখানে বসা যাক—কাছে গিয়ে পিছন থেকে ডাকতেই ভদ্রমহিলা মরালীর মতো গ্রীবাভঙ্গী করে ফিরে তাকালেন। ইনি সুন্দরী নন কিন্তু সেই মুহূর্তে তাঁকে ভারী সুন্দর লাগল এবং ঠিক তখনই আমি বুঝতে পারলাম তাঁকে আমার এত পরিচিত কেন মনে হয়েছে। পাশে বসে পড়ে বল্লাম, জানেন এতক্ষণে বুঝলাম আপনাকে আমার এত চেনা কেন মনে হয়েছে—আপনি যদিও একেবারেই তার মত দেখতে নন কিন্তু আপনার ভাব ভঙ্গীটি আমার একজন বন্ধুর মত। ভদ্রমহিলা সহাস্যে জিজ্ঞাসা করলেন, কে তিনি? আমরা ইংরেজী বাংলা মিলিয়ে কথা বলছিলাম কারণ ইনি বাঙালী নন—আমি বল্লাম তুমি তাঁকে চিনবে না She is

long dead now—তাঁর নাম বুলা। ভদ্রমহিলা চমকে উঠলেন তারপর স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। তাঁর বিস্ফারিত আহত দৃষ্টি দেখে আমি অবাক হয়ে ভাবছি কি হ'ল। তিনি বিরস কঠিন কণ্ঠে বললেন, এ কথা কেন বললে আমি কি তাকে কখনো দেখেছি? আমি তো হতচকিতভাবে বলতে লাগলাম আপ্‌নি আ…পনি তাকে চিনতেন? তিনি বললেন, do you know who I am?—আমি বল্লাম, না না আমি তো…আমি তো আপনাকে চিনি না। তিনি আমার চেয়ারের উপরে রাখা হাতখানি শক্ত করে ধরে বললেন, I am second Mrs. Sisir Gupta আমি বুলার মত নই—তার মত কেউ হতে পারে না- -সে অদ্বিতীয়া। তারপর সেই রাত্রিটি আমাদের জাগরণে কাটল—সেই অভিজ্ঞতা বা গল্প এই রচনাব বিষয়বস্তু নয়।